কৃষি-বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

কৃষির মূলনীতি

রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর

ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্‌চারাল সার্ভিস,

ডেপুটি ডিরেক্‌টর অব্ এগ্রিকাল্‌চার, বেঙ্গল ;

মেম্বার অব্ দি রয়াল এগ্রিকাল্‌চারাল সোসাইটি অব্ ইংলণ্ড

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৮

বিষয়সূচী

'বষয় পৃষ্ঠা

৮ম অধ্যায়

৯ম অধ্যায়

১০ম অধ্যায়

১১শ অধ্যায়

১২শ অধ্যায়

১৩শ অধ্যায়

১৪শ অধ্যায়

১৫শ অধ্যায়

চিত্রসূচী

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে এ দেশের দারিদ্র্য-মোচন অসম্ভব, একথা আজকাল সকলেরই মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত কি করা যাইতে পারে? যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন কৃষিকার্য্যের উন্নতির একটি প্রধান উপায় কৃষি-শিক্ষার বিস্তার। পরলোকগত ডেপুটি ডিরেক্টর রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর দীর্ঘকাল কৃষিবিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্গে কৃষির উন্নতি ও জনসাধারণের মধ্যে কৃষি-শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বর্গীয় রাজেশ্বরবাবু বুঝিয়াছিলেন যে কৃষিকার্য্যের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানগুলির মূল তত্ত্বসকল সহজ বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ না করিলে কৃষি-শিক্ষা-বিস্তারের খাটি পত্তন করা হইবে না। বস্তুতঃ এই ধরণের কোন পুস্তকই বাঙ্গলা ভাষায় নাই। আজ যখন কৃষি-শিক্ষা-বিস্তারের প্রস্তাবটা লইয়া সরকারী ও বে-সরকারী মহলে একটু আধটু কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে রাজেশ্বরবাবুর বইখানি প্রকাশিত হইল, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি।

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কৃষি-সংক্রান্ত বহু বচন ও সূত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে "বৈদিক যুগে অনতি-পূর্ব্বকাল হইতেই প্রাগুক্ত প্রকারে কৃষিকার্য্যের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল এবং কৃষি-সম্বন্ধীয় নানা কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।" মহামুনি পরাশর-প্রণীত "কৃষি-সংগ্রহ" গ্রন্থ হইতে মূল কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার প্রাচীন কৃষিকার্য্যের যে আভাস দিয়াছেন তাহা বিশেষজ্ঞমাত্রেরই প্রণিধান-যোগ্য।

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে কৃষিকার্য্যের নানা দিক্ অতি প্রাঞ্জল

ভাষায় বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। "হাতে কলমে" কৃষিকর্ম্ম করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি জানা না থাকিলে আধুনিক কালে কৃষির উন্নতির ভিত্তি-স্থাপন হইতে পারে না। এই জন্যই গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় "মৃত্তিকার উৎপত্তি", "উদ্ভিদ-জীবন", "উদ্ভিদ্-প্রজনন-প্রণালী", "জীবাণু" প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম্মপদ্ধতির প্রচার-কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলা দেশের সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানে "হাতে খড়ি" দিতে হইলে স্বর্গীয় রাজেশ্বরবাবুর বইখানি আবশ্যক হইবেই।

"ভূমি-কর্ষণ" ও "জল-সেচন" শীর্ষক দুইটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার কৃষিকর্ম্মের যে সকল তথ্য আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠ করা কর্ত্তব্য। কেননা তাঁহাদের চেষ্টা ব্যতীত কৃষিকর্ম্মের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্ভব হইবে না। লোক-শিক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, আশা করি বাঙ্গলা দেশের সেই জননায়কগণ এই গ্রন্থখানির প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিবেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর সকল জাতিই এক এক করিয়া বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতেছে; আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্প বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই আধুনিক কালের প্রতিযোগিতার কঠিন সংগ্রামে জয়ী হইবে। দেশের জননায়কগণ কৃষি উন্নতির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হইয়া পল্লীতে পল্লীতে কৃষিশিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করুন; তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং তাঁহারা যথার্থ নেতা বলিয়া পরিচিত হইবেন।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

৭ই বৈশাখ, ১৩৩৬
কলিকাতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
সি. আই. ই., পি-এচ. ডি.
রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভ্য, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের "খয়রা" অধ্যাপক (এগ্রিকালচার)

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১ম সংস্করণ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর ইংরাজী ১৮৭৮ সালে ঢাকা বিক্রমপুরের এক অতি সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি বরিশাল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে এফ. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়া পরে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উচ্চ কৃষি-শ্রেণীতে বিশেষ ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন। ১৯০১ সালে কৃষি-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তাহার কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। প্রথমে ঠাকুর রাজ ওয়াড এষ্টেটে প্রায় তিন বৎসর কাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের কৃষি-বিভাগে কৃষি-পরিদর্শক (Agricultural Inspector) নিযুক্ত হন। বঙ্গ-বিভাগের পর ১৯০৬ সালে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেণ্টের অধীনে প্রথমে শিলং কৃষিক্ষেত্রের ও পরে জোড়হাট কৃষিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালে তিনি ঢাকার সরকারী বীজভাণ্ডারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে বদলি হইয়া আসেন। ১৯১২ সালে তিনি প্রাদেশিক কৃষি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন এবং গো-সংখ্যা-গণনা (Cattle Census), পাটের হিসাব (Jute Census), বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী (Bengal Year Book) এবং বহু প্রদর্শনী ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্‌চারাল সার্ভিসে অস্থায়িভাবে ডেপুটি ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকাল্-চারের পদ লাভ করেন এবং ১৯১৯ সালে ঐ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। প্রথমে তিনি উত্তর সার্কেলের এবং পরে পশ্চিম সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উপরি উক্ত কার্য্য করেন, এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শেষোক্ত সার্কেলের ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ ১৯২০ সালে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৬ সালে রাজকীয় কৃষি-কমিশনের

(Royal Agricultural Commission) বাঙলা পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি Liaison Officer নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যের সূত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ঐ বৎসর ২২শে নভেম্বর রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে তাঁহার কর্ম্ম-চঞ্চল জীবনের অবসান ঘটে।

বাঙলায় কৃষির উন্নতির কার্য্যে তিনি প্রভূত চেষ্টা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাঙলার সনাতন কৃষি-পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া কৃষির উন্নতি-সাধন করা তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। সরকারী কৃষি-বিভাগ যে ধীরে ধীরে, বলিতে গেলে জন-সাধারণের অজ্ঞাতসারে, অভিনব বীজ, সার ইত্যাদি নূতন কৃষি-পদ্ধতির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশের কল্যাণ-সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, পরলোকগত রায় বাহাদুরের চেষ্টা ও উদ্যম তাহার একটি মূল কারণ।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ গুণ ছিল তাঁহার অন্তরের মাধুর্য্য। যে কেহ রায় বাহাদুরের সহিত পরিচিত ছিলেন, তিনিই তাঁহার উচ্চ অন্তঃ-করণ এবং সরল অমায়িকতায় মুগ্ধ হইতেন। উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। যে কেহ তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকেই তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি আজীবন সাধ্যমত দুঃস্থ ও আশ্রিতের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

এই "কৃষি-বিজ্ঞান" তাঁহার রচিত এক বিরাট্ কৃষি-গ্রন্থের সামান্য অংশমাত্র। নানা কর্ম্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ঐরূপ বিরাট্ গ্রন্থ-প্রণয়নের সময় করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দিনের গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই গ্রন্থ বাঙলা দেশের কৃষির উন্নতি-কল্পে বিশেষ সাহায্য করিবে আমার আশা রহিল।

রাঁচি,
২৬শে মে, ১৯২৯

শ্রীভূপালচন্দ্র বসু,
কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব এসিস্‌টাণ্ট ডিরেক্টর

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব তাঁহার কৃষিগ্রন্থাবলীর রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় ঐ গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির জন্য আমারও উহা এতদিন প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। ভগবানের কৃপায় আজ আমি স্বর্গীয় পিতৃদেবের কৃষিগ্রন্থাবলীর মধ্যে "কৃষি-বিজ্ঞান" নামক প্রথম অংশটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম এবং পাঠক-সাধারণের সহানুভূতি পাইলে ইহার পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি, যথা—"ফসল," "সব্জী," "ফল" ও "গো-পালন" অদূর-ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার আশা রাখি।

এই "কৃষি-বিজ্ঞান" প্রকাশ করিতে ৺পিতৃদেবের বন্ধু, বান্ধব ও সহকর্ম্মী সকলেই আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, ডাক্তার সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক কিরণকুমার সেনগুপ্ত ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহোদয়গণের সাহায্য না পাইলে আমার মত অক্ষমের পক্ষে এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। এতদ্ব্যতীত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সরকারী কৃষি-বিভাগের শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব সমগ্র বইখানির প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণী।

ভবানীপুর, কলিকাতা,
১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৬

শ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের

নিবেদন

প্রথম সংস্করণ বহুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়া গেলেও নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া গেল, তজ্জন্য আমি লজ্জিত। স্বর্গীয় পিতৃদেবের লিখিত ফসল, সব্জী ও ফল এই তিনখানি পুস্তক "কৃষি-বিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ড" নামে যন্ত্রস্থ হওয়ায় আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাকে "কৃষি-বিজ্ঞান—প্রথম খণ্ড, কৃষির মূলনীতি," নামে বিশেষিত করা হইল। বর্ত্তমানে "কৃষিকার্য্যে অর্থনীতি" নামক অধ্যায় যাহা ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৪ সালে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও মিহিরকুমার সেন মহাশয় উভয়ে আমাকে এই অধ্যায়টির সম্পাদনকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও কৃষিবিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকাল্‌চারাল অফিসার হেমচন্দ্র রায় এবং পিতৃদেবের অন্যান্য যে সকল বন্ধুবান্ধব প্রুফ-সংশোধন-কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানীপুর, কলিকাতা,
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

শ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর

জন্ম—১৮৭৮ মৃত্যু—১৯২৬

কৃষি-বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

'কৃষ্' ধাতুর অর্থ ভূমি প্রভৃতি কর্ষণ করা। 'কৃষ্ বিলেখনে'। কৃষ্+ইক্=কৃষি। "ইক্ কৃষ্যাদিভ্যঃ" এই বার্ত্তিক অনুসারে কৃষ ধাতুর উত্তর ইক্ প্রত্যয় হইয়া "কৃষি" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। হলাদি-সহযোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে শস্য উৎপাদন করাকে কৃষিকার্য্য বলে। অবস্থাভেদে অকর্ষিত ভূমিতে অথবা নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে ভূমি খনন করিয়াও কোনো কোনো শস্য উৎপাদিত হইতে পারে, ঐ সকল প্রণালীতে শস্য উৎপাদনও কৃষিকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

মানব জাতির আদিম অবস্থাতে এই কৃষিকার্য্যের কোনো প্রকার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল না। কালক্রমে মানবের খাদ্যাভাব মোচনের প্রচেষ্টার ফলে কৃষিকার্য্যের উদ্ভব হইয়া উহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আদিম যুগের মানব-মণ্ডলীর সহিত অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর ইতর প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে বড় অধিক পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঠিক কোন্ সময়ে মানবগণ তাহাদের আদিম অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে অবগত হইবার উপায় না থাকিলেও, প্রাগৈতিহাসিক যুগেই যে তাহাদের মধ্যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ নাই। আদিম যুগের মানবগণ অন্যান্য

ইতর প্রাণীর ন্যায় ফল, মূল এবং আম-মাংস ভোজন করিয়াই জীবন-ধারণ করিত। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসবাসের প্রবৃত্তি পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীতেও পরিলক্ষিত হয়। তদানীন্তন মানবগণের মধ্যে ঈদৃশ আসঙ্গ-লিপ্সা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্যহেতু তাহারা আপন-আপন পরিবারবর্গ-সহ পরস্পর বহু দূরবর্ত্তী স্থানে যাযাবর অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হইত। ক্রমে অগ্নির আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অরণ্য দগ্ধ করিয়া ভূমি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল এবং বিনা কর্ষণেই ঐ ভূমিতে বীজ বপন ও শস্যোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল। ইহাই মানবগণের খাদ্যাভাব-মোচনের প্রথম প্রচেষ্টা বা কৃষিকার্য্যের প্রথম সূচনা।

এই প্রাথমিক শস্যোৎপাদন-শিক্ষা তাহারা প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। খাদ্যোপযোগী নানাবিধ আরণ্য উদ্ভিদের বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম ও পরিপক্কতা-লাভের সময় পর্য্যন্ত উহাদের উপর জলবায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারা শস্যসমূহের বপন ও কর্ত্তন-কাল নির্দ্দেশ করিত। কৃষিকার্য্যের এই শৈশব অবস্থায় খাদ্যাভাব দূরীভূত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত। কারণ, এক ভূমির উৎপাদিত ফসল কর্ত্তিত হইলেই সেই ভূমিতে আর দ্বিতীয়বার ফসল উৎপাদিত হইত না। ভবিষ্যৎ শস্যের জন্য অন্যত্র ভূমি নির্ব্বাচন এবং সেই ভূমি প্রয়োজন মত পরিষ্কার করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইত। ঈদৃশ যাযাবরবৃত্তি অবলম্বনদ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত বলিয়া কদাচ তাহাদের ভূমির অভাব অনুভূত হইত না। এই অনুন্নত কৃষিকার্য্যের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবের আহার্য্যের সমস্যা দূরীভূত হইয়া পরস্পর দলবদ্ধভাবে বসবাসের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে এক একটি দলের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাতেও ক্ষেত্রে শস্য বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত তাহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিত না, কিন্তু শস্য কর্ত্তিত হইলেই ভবিষ্যৎ শস্যের জন্য জমি নির্ব্বাচন ও পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ :পরিভ্রমণ

করিত। সম্ভবতঃ এই যুগেই পশুগণকে পোষ মানাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ঐ সময়ে সঙ্ঘের আয়তন উৎপন্ন আহার্য্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। মেঘবৃষ্টি বিষয়ে ঋতুর খাম্‌খেয়ালী চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি-প্রভাবে শস্যহানি হইলে, অনশন-জনিত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সঙ্ঘের জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইত। ঐ সময়ে কেহ অতিরিক্ত শস্যোৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত না। সুতরাং খাদ্যাভাব উপস্থিত হইলে পরবর্ত্তী শস্য কর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা মোচনের অন্য কোনো উপায় ছিল না। বিশেষতঃ ঐ সময়ে একস্থানে শস্যহানি হইলে স্থানান্তর হইতে শস্য আনয়ন করিয়া তাহা পূরণ করিবার কোন প্রকার পথই উন্মুক্ত ছিল না।

ঐ যুগে কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমির অভাব ঘটিত না। দেশব্যাপী স্বত্বহীন বনভূমির যে কোনো স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহাতে শস্য উৎপাদন করা চলিত। অধিক শস্যের প্রয়োজন হইলে অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ ভূমি আবাদের আবশ্যক হইত মাত্র। সুতরাং একই ভূমিতে অধিকতর শস্যোৎপাদনের আবশ্যকতা তখনো মানবের মনে উদিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঐ শ্রেণীর অসভ্য যাযাবর জাতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহাদের অনুষ্ঠিত অনুন্নত কৃষি-প্রণালীকে "জুম" বা "ঝুম" কৃষি বলে। ঐ শ্রেণীর যাযাবর জাতির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। স্বত্বহীন অরণ্যের অভাবই উহার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। সঙ্ঘের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের যাযাবর-ভাব ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিয়া উহারা বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে উহারা প্রথমতঃ বাসস্থানের সংলগ্ন ও নিকটবর্ত্তী ভূমি আবাদ করিয়া তাহাতে শস্যোৎপাদন করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও ভূমিকর্ষণের প্রথা প্রবর্ত্তিত না হওয়াতে, প্রতি বৎসরই উহাদের নূতন নূতন ভূমি আবাদের প্রয়োজন হইতে লাগিল। সুতরাং আবাদী স্থানের গণ্ডী ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া উহা

সুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে বাসস্থান হইতে শস্যক্ষেত্র ক্রমেই দূরবর্ত্তী হওয়াতে প্রতিদিন যথোচিত তত্ত্বাবধান ও শস্য-সংরক্ষণ ইত্যাদি সবিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিল। তখন এই অসুবিধা নিরাকরণের জন্য তাহারা সঙ্ঘচ্যুত হইয়া পড়িল ও গণ্ডীর বিভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্টভাবে বসতিস্থাপন ও শস্যোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে স্বভাবতঃই ভূমির স্বত্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে উদিত হইতে লাগিল। কাজেই এক সঙ্ঘের অধিকৃত ভূমি অন্য সঙ্ঘ আসিয়া দখল করিতে চেষ্টা করিত। এই অবস্থায় ঐ সকল বিচ্ছিন্ন পরিবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আধি, ব্যাধি এবং অন্যান্য বিপদাপদে পরস্পরের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল অসুবিধা নিরাকরণের জন্য তাহারা আর গণ্ডীর পরিসর বৃদ্ধি না করিয়া পরস্পরের সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গোচারণ ইত্যাদির উপযোগী ভূমি পতিত রাখিয়া গণ্ডীস্থিত অবশিষ্ট অরণ্যভাগ আবাদ করিয়া তাহাতে শস্যোৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে গণ্ডীর সমস্ত ভূমি আবাদ হইয়া গেলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এক ভূমিতে বারংবার শস্যোৎপাদনের উপায় চিন্তা করিতে হয়; এবং ঐ সময়েই ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথমে মানবের মনে উদিত হইয়াছিল। ইহার পর ক্রমেই সঙ্ঘের বংশ-বিস্তারহেতু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া খাদ্যসমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট জমিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শস্য উৎপাদন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং কৃষকগণকে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন দ্বারাই খাদ্যসমস্যা পূরণ করিতে হইয়াছিল। খাদ্য-সমস্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘস্থিত প্রত্যেক পরিবারের চাষের ভূমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া সকলের মনেই একটা নিজস্ব-ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সকলেই আপন-আপন অধিকারে উৎকৃষ্টতর ভূমি বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল। এইরূপে ভূমির সীমানা লইয়া এবং অন্যান্য কারণে তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হইতে লাগিল।

ক্রমে ঐ সকল দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসার জন্য প্রত্যেক সঙ্ঘের এক একজন দলপতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐ সকল দলপতির ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলস্থ লোকসমূহ সর্ব্বতোভাবে দলপতির বশীভূত হইয়া পড়িল। এইরূপে দলের সমবেত শক্তি দলপতি-দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগে, একদল অপর দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অধিকৃত ভূমি দখল এবং দলস্থ লোকসমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিল। এই ভাবেই দেশে রাজশক্তির প্রথম বিকাশ হয়।

দেশে রাজশক্তি বিকাশের সঙ্গে রাজধানী স্থাপিত হইলে, কতকগুলি লোক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় কার্য্য এবং ব্যবসায় ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে। ইহা ছাড়া কতকগুলি লোক কৃষি-যন্ত্র ও তৈজস-পত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণে নিয়োজিত থাকাতে রাষ্ট্র-মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর অকৃষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। ইতঃপূর্ব্বে ঐ সকল অকৃষক সম্প্রদায় কৃষিকার্য্যদ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিত, সুতরাং তাহারা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগের সময় আপন-আপন জমি কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে পত্তন করিয়া দিত। কিন্তু ঐ অকৃষক-সম্প্রদায়ের বংশবিস্তার হেতু লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, খাদ্য-সমস্যা উপস্থিত হইলে—তাহারা জমির উপস্বত্বস্বরূপ কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট পূর্ব্বে যে শস্য পাইত তদপেক্ষা অধিক শস্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সুতরাং তদবস্থায় তাহারা আপন-আপন জমির বাবদে প্রাপ্য শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হইল। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যে কৃষক যত অধিক শস্য দিতে স্বীকৃত হইত, অকৃষকগণ তাহাদের নিকটই জমি পত্তন করিত। কাজেই অকৃষক-সম্প্রদায়ের পোষণের জন্যও কৃষক-সম্প্রদায়কে নির্দ্দিষ্ট জমিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিতে হইত। এইরূপে রাষ্ট্রের খাদ্য-সমস্যাই দৈনন্দিন কৃষিকার্য্যকে উন্নতির পথে আনয়ন করিয়াছে। কারণ উন্নততর কৃষিপ্রণালী অবলম্বন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট জমিতে অধিকতর ফসল উৎপাদনের অন্য কোন পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না।

ঐ সময়ে প্রধানতঃ বিনিময়-প্রথাদ্বারা জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় হইত, অর্থাৎ জিনিষের পরিবর্ত্তে জিনিষ পাওয়া যাইত; ইহা ছাড়া রাষ্ট্রমধ্যে মুদ্রার পরিবর্ত্তে একপ্রকার রাজকীয় নিদর্শন বা অভিজ্ঞান (token) ব্যবহৃত হইত; উহা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াও জিনিষের ক্রয়বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। অকৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের বিনিময়ের উপযোগী কোন পদার্থ ছিল না, তাহারাই উল্লিখিত অভিজ্ঞান ব্যবহার করিয়া জিনিষ ক্রয় করিত। ইহার পরে একস্থান হইতে অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতের সাধারণ রাস্তা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একস্থানের কৃষিজাত সামগ্রী অন্যস্থানে সরবরাহ করিবার প্রবৃত্তি লোকের মনে উদিত হইয়াছিল। ঐ সময় পালিত গো, অশ্ব, গর্দ্দভ এবং উষ্ট্র ইত্যাদির পৃষ্ঠে পণ্য বোঝাই করিয়া, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। এই রূপেই দেশে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচলন হইলে কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং কৃষকবর্গও আপন-আপন কৃষিক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনে অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়িল। ক্রমে নৌকা এবং শকট ইত্যাদি জল এবং স্থলগামী যানসমূহের আবিষ্কার হইয়া, জল ও স্থলপথে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্য আমদানী-রপ্তানীর পথ উন্মুক্ত হইলে কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যকতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুভূত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান যুগে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধা-সৌকর্য্যে বাষ্পীয় শকট এবং বাষ্পীয় পোতাদির সৃষ্টি হওয়াতে, কৃষিজাত পণ্যের আবশ্যকতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইভাবে দেশের অভাব-মোচনার্থ বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে এবং এই উন্নতি আবহমান কাল চলিতে থাকিবে।

বৈদিক যুগের অনতিপূর্ব্বকাল হইতেই প্রাগুক্ত প্রকারে কৃষিকার্য্যের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল এবং বৈদিক যুগে যথারীতি হল-দ্বারা ভূমি

কর্ষণ করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইত। ঋগ্‌বেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের ৪র্থ মণ্ডল হইতে কর্ষণবিষয়ক ৩টি ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভযন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্॥

(ঋগ্‌বেদ, ৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত, ৮ ঋক্।)

তাৎপর্য্য—লাঙ্গলের ফালগুলি সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষক- (চালক) গণ বাহক (বলীবর্দ্দ) গুলির সহিত সুখে গমন করুক। মেঘসমূহ মধুর বারি বর্ষণ করুক। হে শুন! হে সীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রা মুদিঙ্গয়॥

(ঋগ্‌বেদ, ৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত, ৪ ঋক্।)

তাৎপর্য্য—বাহক (বলীবর্দ্দ) সুখে (বহন করুক), নরগণ (কর্ষণকারী) সুখে (কার্য্য করুক), লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, রজ্জু সুখে বদ্ধ হউক। পশুতাড়ন যষ্টি (পাঁচন বাড়ি) সুখে প্রেরণ কর।

অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥

(ঋগ্‌বেদ, ৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত, ৬ ঋক্।)

তাৎপর্য্য—হে সৌভাগ্যবতী সীতা (হলকর্ষণদ্বারা চিহ্নিত ভূমিরেখা) তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন দান কর এবং সুফল প্রদান কর।

বৈদিক যুগে ক্ষেত্রে সারপ্রয়োগের প্রথাও প্রচলিত ছিল। অথর্ব্ববেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১] শস্যসম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে

---

১ "সংজগ্মানা অবিভ্যুষীরস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ।
বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনমীবা উপেতন॥"—অথর্ব্ববেদ, ৩,১৪।৩
"করীষিণীং ফলবতীং স্বধামিরাং চ নো গৃহে।
ঔদুম্বরস্য তেজসা ধাতা পুষ্টিং দধাতু মে।"—অথর্ব্ববেদ, ১৯।৩১।৩

কেবল যব[২] ও ধান্যের[৩] উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে ইহার অতিরিক্ত আর একটি ফসল "মাষ"এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] বাজসনেয়ী সংহিতাতে ধান্য, যব, মাষ, তিল, মুগ, খল্ব (পশুখাদ্য তৃণবিশেষ), প্রিয়ঙ্গু (কাউন), চিনা, শ্যামাক, নীবার, গোধূম এবং মসূর এই সকল শস্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৫] তৈত্তিরীয় সংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময়ে এক ক্ষেত্রে সংবৎসরে দুইবার শস্য উৎপাদিত হইত।[৬] ঐ সংহিতাতে বিবিধ প্রকার শস্যের পরিপক্কাবস্থায় কর্ত্তনের কাল লিখিত হইয়াছে।[৭] উহা হইতে জানা যায়, যবের কর্ত্তনসময় গ্রীষ্মকাল (সুতরাং বীজবপনের সময় হেমন্ত), ওষধিজাতীয় শস্য বর্ষাতে কর্ত্তন করিতে হয়। ধান্যকর্ত্তনের সময় শরৎকাল (সুতরাং বপনসময় গ্রীষ্ম অথবা বর্ষার প্রারম্ভ)। মাষ এবং তিল হেমন্ত ঋতুতে কর্ত্তিত হয় (সুতরাং বপনসময় গ্রীষ্মকাল অথবা বর্ষার প্রারম্ভ)। উল্লিখিত বপন ও কর্ত্তনের কালনির্দ্দেশ হইতে অনুমান হয়, ঐ সময়ে শস্যাবর্ত্তন বা শস্য-পর্য্যায়প্রথা (rotation) অবলম্বিত হইত। যব কর্ত্তন করিয়া ঐ ক্ষেত্রে ধান্য, মুগ, মাষ অথবা তিলের বীজ বপন করা হইত। কৌটিল্যের সময়ে যে শস্যাবর্ত্তনপ্রথা অনুসারে শস্য উৎপাদিত হইত তাহা তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রনামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। ঐ সময়ে শালি, ব্রীহি, কোদ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্গু, দারক, বরক—

---

২ ঋগ্বেদ—১, ২৩, ১৫ ; ২, ৫, ৬ ; ৫, ৮৫, ৩ ; ইত্যাদি। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাও দ্রষ্টব্য।

৩ ঋগ্বেদ—১, ১৬, ২ ; ৩, ৩৫, ৩ ; ইত্যাদি।

৪ অথর্ব্ববেদ—৬, ১৪০, ২ ; ১২, ২, ৫৩। অথর্ব্ববেদের অনুক্রমণিকাও দ্রষ্টব্য।

৫ "ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মেঽণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসূরাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।" বাজসনেয়ী সংহিতা—১৮।১২

৬ "দ্বিঃ সংবৎসরস্য শস্যম্ পচ্যতে।" তৈত্তিরীয় সংহিতা—৫, ১, ৭, ৩।

৭ "যবং গ্রীষ্মায়ৌষধীর্বর্ষাভ্যো ব্রীহীঞ্ছরদে মাষতিলৌ হেমন্তশিশিরাভ্যাং তেনেন্দ্রং প্রজাপতিরযাজয়ত্ততো বা ইন্দ্র।" তৈত্তিরীয় সংহিতা—৭, ২, ১০, ২।

এই সকল শস্যের বীজ বর্ষার প্রাক্কালে বপন করা হইত। মুগ, মাষ এবং শিম্বীজাতীয় শস্যের বীজ বর্ষার মধ্যভাগে বপন করা হইত এবং কুসুম্ভ, মসুর, কুলত্থ, যব, গোধূম, কলায়, অতসী (তিসি), সর্ষপ এই সকল শস্যের বীজ বর্ষাকাল অতীত হইয়া গেলে বপনের নিয়ম প্রচলিত ছিল।[৮]

বৈদিক যুগে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় জমি "খিল" বা পতিত রাখিয়াও শস্যাবর্ত্তন- (rotation) প্রথা প্রচলিত ছিল। দুই ক্ষেত্র অথবা তিন ক্ষেত্র লইয়া এই শ্রেণীর শস্যাবর্ত্তন প্রথা অনুষ্ঠিত হইত।[৯] দুই ক্ষেত্র লইয়া শস্যাবর্ত্তন করিবার সময় এক ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিয়া অপর ক্ষেত্র পতিত রাখা হইত। পরবর্ত্তী বৎসর বা পরবর্ত্তী ফসলের সময় ঐ পতিত ভূমি কর্ষণ করা হইত এবং পূর্ব্বের ভূমি পতিত রাখা হইত। তিন ক্ষেত্র লইয়া শস্যাবর্ত্তন করিবার সময় প্রতিবৎসর পর্য্যায়ক্রমে এক ক্ষেত্র পতিত রাখিয়া দুই ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত হইত। পরবর্ত্তী যুক্তিকল্পতরু-নামক গ্রন্থেও ঐরূপ ভূমি পতিত রাখিয়া শস্যাবর্ত্তনের নিয়ম সমর্থিত হইয়াছে।[১০]

বৈদিক যুগে গোচারণের জন্য ভূমি পতিত রাখা এবং গোখাদ্যের জন্য ঘাস ফসল (fodder crops) উৎপাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। গোচারণ-ভূমি—ব্রজ[১১] গোষ্ঠ[১২] সুযবস্[১৩] এবং খিল বা খিল্য[১৪] নামে অভিহিত হইত। শস্যপর্য্যায়ের জন্য যে ভূমি নির্দ্দিষ্টকাল পতিত

---

[৮] অর্থশাস্ত্র—২ অধি ২৪ অধ্যায়।

[৯] ঋগ্বেদ—৮, ৯১, ৫-৬।

[১০] যথা বর্ষেষু বর্ষেষু কর্ষণাৎ ভূগুণক্ষয়ঃ।
একস্যাং গুণহীনায়াং কৃষিমন্যত্র কারয়েৎ॥
যুক্তিকল্পতরু— ঈশ্বরচন্দ্রশাস্ত্রি-সম্পাদিত, ৬ পৃষ্ঠা।

[১১] ঋগ্বেদ—১, ১০, ৭ ; ১, ৯২, ৪ ; ৯, ৯৪, ১ ইত্যাদি।

[১২] ঋগ্বেদ—১, ১৯১, ৪ ; ৮, ৪৩, ১৭ ; ১০, ১৬৯, ৪ ইত্যাদি।

[১৩] ঋগ্বেদ—৬, ২৮, ৭ ; ৭, ১৮, ৪ ; ৭, ৯৯, ৩ ইত্যাদি।

[১৪] ঋগ্বেদ—৬, ২৮, ২ ; ১০, ১৪২, ৩।

অবস্থায় থাকিত তাহাই খিল বা খিলা নামে পরিচিত ছিল। অদ্যাপি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিবর্গ ঐ শ্রেণীর পতিত ভূমিকে খিল বলিয়া থাকে। সুযবস্ (সু + যবস্) শব্দটি-দ্বারা ঘাস ফসলেরই আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ সময় ক্ষেত্রে ঘাস-ফসলরূপে যব উৎপাদন করিয়া অপরিণত অবস্থায় গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হইত।

সমগ্র বেদমন্ত্র এক সময়ে রচিত হয় নাই. বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন মন্ত্রের রচয়িতা। কোন্ ঋষি কোন্ মন্ত্র কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছেন তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য বেদে রক্ষিত হয় নাই. তবে বেদোক্ত ঋষিগণের পৌর্ব্বাপর্য্য পরবর্ত্তী পুরাণ-গ্রন্থগুলিতে কথঞ্চিৎ নির্ণীত হইয়াছে; বেদের পরে সংহিতা, তৎপরে পুরাণ, সুতরাং বেদের প্রকাশিত ঋষিমন্ত্রগুলি যে অতি প্রাচীন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধহয় সংহিতা-যুগেই ভারতীয় কৃষি-যন্ত্রাদির চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সংহিতা-যুগের পরবর্ত্তী কালে কৃষি-যন্ত্রাদির বিশেষ কোনও উন্নতির বিষয় অবগত হওয়া যায় না; অদ্যাপি ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় তদনুরূপ যন্ত্রাদির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

প্রসিদ্ধ সংহিতাকার পরাশর মুনি কৃষি-ঋষি বলিয়া ভারতে প্রসিদ্ধ। তিনি কৃষি-সংগ্রহ বা কৃষিপরাশর-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে লাঙ্গলাদি কৃষিযন্ত্রের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ঈশো যুগো হলস্থাণুর্নির্যোলস্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাষ্টকম্॥
পঞ্চহস্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চবিতস্তিকঃ।
সার্দ্ধহস্তস্তু নির্যোলো যুগঃ কর্ণসমানকঃ॥
নির্যোলঃ পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈব চ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানো হি শৌলোঽরত্নিপ্রমাণকঃ॥
সার্দ্ধদ্বাদশমুষ্টির্ব্বা কার্য্যা বা নবমুষ্টিকা।
দৃঢ়া পচ্চনিকা জ্ঞেয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা॥

আবন্ধো মণ্ডলাকারঃ স্মৃতঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ
যোক্তুং হস্তচতুষ্কঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চকরাত্মিকা ॥
পঞ্চাঙ্গুলাধিকো হস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ।
অর্কস্য পত্রসদৃশী পাশিকা চ নবাঙ্গুলা ॥
একবিংশতিশল্যস্তু বিদ্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নবহস্তা তু মদিকা প্রশস্তা কৃষিকর্ম্মসু ॥
ইয়ং হি হল-সামগ্রী পরাশরমুনের্ম্মতা।
সুদৃঢ়া কর্ষকৈঃ কার্য্যা শুভদা কৃষিকর্ম্মণি ॥
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্য চ ;
বিঘ্নং পদে পদে কুর্য্যাৎ কর্ষকালে ন সংশয়ঃ ॥

—কৃষিসংগ্রহ—মহামুনি-পরাশর-প্রণীত।

(বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত)—১১০-১১৮ শ্লোক।

তাৎপর্য্য—ঈশ, যুগ (যোয়াল), হলস্থাণু (মুড়া), নির্যোল (নির্যিন), নির্যোলপাশিকা (নির্যোলের দড়ি), অড্ডচল্ল (আড়চাল), শৌল (শোলকাঠি), ও পচ্চনী (পাচনবাড়ি) এই আটটি হলের অর্থাৎ লাঙ্গলের উপাদান-দ্রব্য। ঈশ পাঁচ হাত, স্থাণু পাঁচ বিতাস্ত (বিঘৎ), নির্যোল দেড় হাত, যুগবাহনের (বলদের) কর্ণসমান, পাশিকা ও অড্ডচল্ল দ্বাদশাঙ্গুলি, শৌল অরত্নি পর্য্যন্ত (অর্থাৎ কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত—মুঠো-করা এক হাত) এবং পচ্চনী বা পাচনবাড়ি সাড়ে বার মুষ্টি অথবা নয় মুষ্টিপরিমিত প্রস্তুত করিবে। পাচনবাড়ি বংশনির্ম্মিত, দৃঢ় এবং অগ্রভাগ লৌহ-মণ্ডিত হওয়া কর্ত্তব্য। আবন্ধ মণ্ডলাকার ও পনর অঙ্গুলি পরিমিত হইবে, যোক্ত (যোতদড়ি—যদ্দ্বারা ঈশের সহিত যোয়াল বন্ধন করা হয়) চারি হস্ত পরিমাণ, রজ্জু পাঁচ হস্ত, ফাল এক হস্ত পাঁচ অঙ্গুলি বা এক হস্ত পরিমাণ হইবে; পাশিকা নয় অঙ্গুলি পরিমিত এবং আকন্দ পাতার ন্যায় হইবে; বিদ্ধক (বিঁদা) একুশ-শলাকা-যুক্ত এবং মদিকা নয় হাত পরিমিত হওয়া আবশ্যক, এইগুলি পরাশর-মুনি-কথিত হলসামগ্রী। কৃষক এইগুলি সুদৃঢ়রূপে

প্রস্তুত করিবে। যেহেতু অদৃঢ় দ্রব্যসকল চাষের সময় কৃষকের ও বাহকের পদে পদে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে।

বিলফোর্ড সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দে পরাশর-মুনি বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বুকানন সাহেব ঐ কাল খৃঃ পূঃ ১৩০০ অব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক বর্ত্তমান সময় হইতে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যে পরাশর তাঁহার সংহিতাদি রচনা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে, পরাশরের সময়ে অর্থাৎ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কৃষিযন্ত্রাদি ভারতে ব্যবহার হইত, অদ্যাপি উহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া কৃষিযন্ত্রাদি কেন যে উৎকর্ষ লাভ করিল না—ভাবিতে গেলে তাহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে ভারতের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ বিষয়ে বিশেষ কোন বিস্ময়ের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, ভারতের ভূমি ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশের তুলনায় তাদৃশ কঠিন নহে। এই অকঠিন মৃত্তিকাকর্ষণের জন্য দেশে যে সকল কর্ষণযন্ত্র প্রচলিত আছে, তদপেক্ষা উন্নততর যন্ত্রের প্রয়োজন কোন কালে অনুভূত হয় নাই। বিশেষতঃ ভারতীয় কৃষকগণের কৃষিপদ্ধতি পূর্ব্বাপর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে বিস্তীর্ণ-ভূমি-কর্ষণোপযোগী উন্নততর কৃষিযন্ত্রাদির আবশ্যকতা তাহারা কদাচ অনুভব করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের কৃষিকার্য্য কোন কালেও সম্পূর্ণরূপে বহির্বাণিজ্যের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, চিরকালই দেশের উৎপাদিত শস্য দেশের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে আয়াস স্বীকার করিয়া আবশ্যকের অতিরিক্ত শস্যোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা তাহারা কোনকালেই অনুভব করে নাই। তৃতীয়তঃ, সভ্যতাবিস্তারের পর হইতে অদ্যাপি এ দেশের কৃষিকার্য্য যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে,

তাহারা দেশের জীবনরক্ষক হইলেও সামাজিক হিসাবে "চাষা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া দেশের শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজের নিকট অবনত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকার দরুন তাহারা চিরকাল অজ্ঞানতার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করাতে তাহাদের দ্বারা কৃষিযন্ত্রাদির সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে নাই। অথচ দেশের জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও ঐ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন; কাজেই কৃষিযন্ত্রাদির উৎকর্ষ-সাধনপক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছিল। যতদিন শিক্ষিতসম্প্রদায় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেন, ততদিন বিবিধ বিষয়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথ মুক্ত ছিল, এবং তাহার ফলে বীজবপন, হলপ্রবাহ, শস্যচ্ছেদন, জলসেচন, বৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি প্রতিবৎসরের পঞ্জিকাতে জ্যোতিষশাস্ত্রানুমোদিত কৃষিবিষয়ক দিন, ক্ষণ ইত্যাদি মুদ্রিত হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞানে বৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক অভিজ্ঞতা-মূলক বচনগুলি প্রণিধানযোগ্য। অবশ্য দেশে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল বচনের ফলাফলবিষয়ে অনেকটা অনৈক্য ঘটিবারই সম্ভাবনা; এতদ্ব্যতীত কৃষিবিষয়ক প্রাদেশিক বচনগুলি দেশের কৃষিচর্চ্চাবিষয়ে উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে কৃষিকার্য্য চিরকালই সেচন-সাপেক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষ পূর্ব্বে দেবমাতৃক দেশ ছিল, অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃষ্টিবারির উপর নির্ভর করিয়াই ভারতীয় কৃষকগণ শস্য উৎপাদন করিত। এই জন্যই বৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞতামূলক আলোচনা ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত।

পরাশরকৃত কৃষিসংগ্রহ-নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

(১) কৃষিকার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

(২) কৃষিকার্য্যের শুভাশুভসম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুযায়ী বর্ষ-বিচার।

(৩) জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক লক্ষণ ইত্যাদি অনুযায়ী বৃষ্টিতত্ত্ব।

(৪) কৃষি-পর্য্যবেক্ষণ।

(৫) বাহনবিধি—অর্থাৎ হলবাহী বলীবর্দ্দের (বলদের) লক্ষণা-লক্ষণ।

(৬) গোশালা-বিধান—গোশালাসম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ।

(৭) গোপর্ব্ব—গোসম্বন্ধীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান।

(৮) গোময়-কূটোদ্ধার—গোময়স্তূপ ভাঙ্গিয়া উহার দ্বারা সার-প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রয়োগ-বিধি।

(৯) হলসামগ্রী—কর্ষণযন্ত্রাদির বিবরণ।

(১০) হলপ্রসারণ—হলচালনাবিষয়ে উপদেশ।

(১১) বীজস্থাপন-বিধি—বীজসংগ্রহ ও বীজরক্ষাবিষয়ক উপদেশ।

(১২) বীজবপন-বিধি।

(১৩) মদিকা-দান—জমিতে মই দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ।

(১৪) ধান্যরোপণ-বিধি।

(১৫) ধান্যকর্ট্টন—জমিতে বিদা দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ।

(১৬) ধান্য-নিস্তৃণীকরণ—ধানের ক্ষেতে নিড়ানি দেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ।

(১৭) জলমোচন—নানাপ্রকার রোগ হইতে ধান্য মুক্ত রাখিবার জন্য ভাদ্র মাসে কেবলমাত্র মূলে জল রাখিয়া অবশিষ্ট জল ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার বিধি।

(১৮) ধান্য-ব্যাধিখণ্ডন—ধান্যের রোগ এবং কীটাদির উপদ্রব-নিবারণের উপায়।

(১৯) জলরক্ষণ—ধান্যক্ষেত্রে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার বিধি।

(২০) মুষ্টিগ্রহণ—ধান্যচ্ছেদন-বিধি।

(২১) ধান্যস্থাপন-বিধি—মরাই অথবা গোলাতে ধান্যরক্ষা-বিষয়ে বিধি।

এতদ্ব্যতীত কৃষিসম্বন্ধীয় কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সংহিতা এবং পৌরাণিক যুগে বহু মনীষী কৃষিবিষয়ে বহুবিধ আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। পরাশরকৃত কৃষিসংগ্রহ* ব্যতীত বরাহ-মিহিরকৃত বৃহৎসংহিতাতে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-নামক একটি প্রকরণ সন্নিবেশিত আছে। ঐ গ্রন্থের টীকাকার ভট্টোৎপল মূল রচনাগুলি বিশদ করিবার জন্য বৃক্ষায়ুর্ব্বেদবিষয়ক কশ্যপের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং কশ্যপকৃত একখানি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী চতুঃষষ্টি কলার প্রসঙ্গে শৈবাগমোক্ত বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-যোগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বলিতে কেবল উদ্ভিদের চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে উদ্ভিদের বপন, রোপণ, কলম, সার, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু তদানীন্তন রীতি এবং বর্ত্তমান রীতিতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। ইহা ছাড়া কেদারকল্প ও ক্ষেত্রতত্ত্ব-নামক আর দুইখানি কৃষিবিষয়ক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এখন গ্রন্থ দুইখানি দুষ্প্রাপ্য।

আচার্য্য শার্ঙ্গধরপ্রণীত "সুভাষিত-শার্ঙ্গধর"-নামক গ্রন্থে "উপবন-বিনোদ"† নামে উদ্যানকৃষিবিষয়ক একটি বৃহৎ অধ্যায় সন্নিবেশিত আছে। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে :—

(১) তরুমহিমা—বৃক্ষরোপণ এবং উদ্যানরচনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিবিধজাতীয় বৃক্ষের গুণাগুণ।

(২) গৃহাশ্রম—তরুর শুভাশুভ লক্ষণ। বাস্তুভিটায় অর্থাৎ বসত বাড়ীতে কি কি বৃক্ষ রোপণ করা বিধেয় এবং অবিধেয়।

* কৃষিসংগ্রহ—মহামুনি পরাশরপ্রণীত, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

† উপবন-বিনোদ—শ্রীমদাচার্য্য শার্ঙ্গধরপ্রণীত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনকর্ত্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত।

(৩) ভূমিনিরূপণ—ভূমির প্রকারভেদ এবং কোন্ প্রকার ভূমি কোন্ কোন্ বৃক্ষের পক্ষে উপযোগী।

(৪) পাদপ-বিবক্ষা—বৃক্ষের শ্রেণীবিভাগ (Classification)।

(৫) বীজোপ্তি-বিধি—বীজবপনসম্বন্ধীয় উপদেশ।

(৬) রোপণবিধান—বৃক্ষের চারার রোপণ-প্রণালী এবং বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষরোপণের দূরত্ব ইত্যাদি।

(৭) নিষেচন-বিধি—জলসেচনবিষয়ক উপদেশ।

(৮) দ্রুমরক্ষা-বিধি—বিবিধ শত্রু অর্থাৎ পশু এবং কীটাদির কবল হইতে বৃক্ষদিগকে রক্ষা করিবার বিষয়ে উপদেশ।

(৯) উপবন-ক্রিয়া—উদ্যানরচনাবিষয়ক উপদেশ।

(১০) কূপার্থ ভূমিপরীক্ষা—পারিপার্শ্বিক অবস্থাদর্শনে মৃত্তিকার কত নিম্নে জল আছে তাহা নির্ণয় করিয়া কূপখননবিষয়ক উপদেশ।

(১১) পোষণ-বিধি—বৃক্ষাদির পরিচর্য্যাবিষয়ক উপদেশ এবং পরিচর্য্যার ফলে বিবিধবিষয়ে উৎকর্ষসাধন।

(১২) কুণপ জল—বৃক্ষাদির মূলে সেচনোপযোগী উক্তনামধেয় তরল মিশ্রণ (mixture) প্রস্তুতপ্রণালী।

(১৩) তরু-চিকিৎসা—বৃক্ষের বিবিধ রোগ এবং তাহার প্রতীকারের উপায়।

(১৪) চিত্রীকরণ—বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা বৃক্ষাদির ফল, পুষ্প, পত্র, বর্ণ, স্বাদ, আকার এবং ফলদানসময়ের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনসাধন-বিষয়ক উপদেশ।

(১৫) অন্নাদি-নিষ্পত্তিজ্ঞান—বিভিন্নজাতীয় ফল অথবা শস্যের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য জাতীয় ফল, শস্য এবং জীব-জন্তুর বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাবিষয়ক আলোচনা।

এতদ্ব্যতীত গোরক্ষ-সংহিতাতেও কৃষিবিষয়ক বিবিধ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, বিশেষতঃ উদ্ভিদের প্রাণবত্তা-সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষিগণ সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থাদি-পাঠে তাহা

অবগত হওয়া যায়। উদ্ভিদের প্রাণবত্তা-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ।" *

অর্থাৎ বৃক্ষাদির অন্তঃসংজ্ঞা আছে এবং ইহারাও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র বৎসর পরে আজ ভারতের অন্যতম একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক সার জগদীশচন্দ্র বসু জগতের সমক্ষে যন্ত্রাদির সাহায্যে ঐ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদের প্রাণবত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্বাদি স্মৃতিকারগণ বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে বৃক্ষাদি-ছেদনজনিত বিভিন্নরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুগণ তুলসীপত্রচয়ন এবং বিল্ববৃক্ষের শাখার আহরণকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন তাহাতে সম্পূর্ণভাবে উহাদিগকে প্রাণী জ্ঞান করিয়া উহাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়। মন্ত্র দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

তুলসীচয়ন-মন্ত্র

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মলবিনাশিনি॥

বিল্ববৃক্ষের শাখাছেদন-মন্ত্র

বিল্ববৃক্ষ! মহাভাগ! সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ।
গৃহীত্বা তব শাখাস্তু দেবীপূজাঙ্করোম্যহম্॥
শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো।
ক্ষম্যতাং বিল্ববৃক্ষেশ! নমস্তুভ্যং শিবাপ্রিয়॥

সংহিতা-যুগের পরবর্ত্তী মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত মহাভারতে বৃক্ষাদির প্রাণবত্তাসম্বন্ধে যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের

* মনুসংহিতা—১, ৪৯।

উন্নত উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত না হইলেও প্রণিধানযোগ্য বটে।

মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে জীব বা প্রাণীর বিষয়ে সঞ্জয় বলিতেছেন,—

দ্বিবিধানীহ ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
ত্রসানাং দ্বিবিধা যোনিরণ্ডস্বেদজরায়ুজাঃ॥
ত্রসানাং খলু সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠা রাজন্ জরায়ুজাঃ।
জরায়ুজানাং প্রবরা মানবাঃ পশবশ্চ যে॥

* * * * *

উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ প্রোক্তাস্তেষাং পঞ্চৈব জাতয়ঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাবল্ল্যস্ত্বক্‌সারাস্তৃণজাতয়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ—এই ভূমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম দ্বিবিধ জীব, তন্মধ্যে জঙ্গম যোনি তিন প্রকার:—স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। যাবতীয় জঙ্গম জীবের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ। জরায়ুজগণের মধ্যে মনুষ্য এবং নানারূপ পশুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। * * * * * স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিদ্ বলে। তাহাদিগের পঞ্চ প্রকার জাতি, যথা—বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী ও ত্বক্‌সার তৃণ।

এ স্থলে উদ্ভিদের প্রাণবত্তা স্পষ্ট স্বীকৃত হইল। এই স্থাবর জীব উদ্ভিদ্-জাতির যে কেবল প্রাণ আছে তাহাই নহে, জরায়ুজ-প্রাণি-সুলভ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা এবং জীবোচিত অন্যান্য সত্তাও যে ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বোক্ত ভৃগু-ভরদ্বাজ-কথোপকথনে জানা যায়,—

ভরদ্বাজ উবাচ—

পঞ্চভির্যদি ভূতৈস্তু যুক্তাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
স্থাবরাণাং ন দৃশ্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ॥
অনূষ্মণামচেষ্টানাং ঘনানাং চৈব তত্ত্বতঃ।
বৃক্ষাণাং নোপলভ্যন্তে শরীরে পঞ্চ ধাতবঃ॥

ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি ন গন্ধরসবেদিনঃ।
ন চ স্পর্শং বিজানন্তি, তে কথং পাঞ্চভৌতিকাঃ॥
অদ্রবত্বাদনগ্নিত্বাদভূমিত্বাদবায়ুতঃ।
আকাশস্যাপ্রমেয়ত্বাদ্ বৃক্ষাণাং নাস্তি ভৌতিকম্॥

ভৃগুরুবাচ—

ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশোঽস্তি ন সংশয়ঃ।
তেষাং পুষ্পফলব্যক্তির্নিত্যং সমুপপদ্যতে॥
উষ্মতো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেব চ।
ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥
বায়্বগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
ন হ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাং চাপি দর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥
বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥
সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে॥
তেন তজ্জলমাদত্তং জরয়ত্যগ্নিমারুতৌ।
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥

বঙ্গানুবাদ—ভরদ্বাজ বলিলেন, ব্রাহ্মণ! কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদয় পদার্থ ই যদি পঞ্চভূত-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবর-দেহে কি কারণে পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না? দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ,

দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের শরীরেও রুধিরাদি দ্রবপদার্থ, অগ্নিরূপ তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই। তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? ভৃগু বলিলেন, ব্রাহ্মণ! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদিগের ফলপুষ্প উদ্গত হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ-দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদয় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদের স্পর্শজ্ঞানবিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনও স্বয়ং পথ চিনিয়া চলিয়া যাইতে পারে না—অতএব লতা সমুদয় যখন বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে তখন উহাদের দর্শনশক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ-দ্বারা রোগ-বিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহে আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল-দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখ-দ্বারা উৎপল-নাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবন-সহযোগে মূল-দ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখ-দুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন আছে স্বীকার করিতে হইবে; উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষগণ মূল-দ্বারা যে জল গ্রহণ করে অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে, ঐ জলের পরিপাক হওয়াতে ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

—কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ১৮৪ অধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ উদ্ভিদ্-জাতির বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া উহাদের যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া গিয়াছেন তাহাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

বনস্পতি-দ্রুম-লতা-গুল্মাঃ পাদপজাতয়ঃ।
বীজাৎ কাণ্ডাৎ তথা কন্দাৎ তজ্জন্ম ত্রিবিধং বিদুঃ॥
তে বনস্পতয়ঃ প্রোক্তা বিনা পুষ্পৈঃ ফলন্তি যে।
দ্রুমাশ্চান্যে নিগদিতাঃ পুষ্পৈঃ সহ ফলন্তি যে॥
প্রসরন্তি প্রতানৈর্যাস্তা লতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বহুস্তম্বা বিটপিনো যে তে গুল্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

—শার্ঙ্গধর-কৃত উপবন-বিনোদ।

তাৎপর্য্য—পাদপসকল বনস্পতি, দ্রুম, লতা ও গুল্ম এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; বীজ, কাণ্ড ও কন্দ হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাদের উৎপত্তি তিন প্রকার। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প না হইয়া ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দ্রুম বলে। যাহারা ভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহাদিগকে লতা কহে, এবং যাহারা ভূমি হইতে বহু শাখায় প্রসারিত হয় তাহাদিকে গুল্ম বলা যায়।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ অভিধানকার হেমচন্দ্রসূরিকৃত অভিধান-গ্রন্থে * উদ্ভিদ্-জাতির উৎপত্তিভেদে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—

কুরণ্টাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্ধজাঃ সল্লকীমুখাঃ॥
শাল্যাদয়ো বীজরুহাঃ, সম্মূর্চ্ছজাস্তৃণাদয়ঃ।
স্যুর্বনস্পতিকায়স্য ষড়েতে মূলজাতয়ঃ॥

* অভিধানচিন্তামণি—১২০০, ১২০১।

অর্থাৎ—

(১) অগ্রবীজ—কুরণ্টাদিবৃক্ষ (শাকজাতীয় শালিঞ্চ বা শেচী শাক)।

(২) মূলজ—উৎপল বা জলপদ্ম ইত্যাদি।

(৩) পর্ব্বযোনী—ইক্ষু প্রভৃতি।

(৪) স্কন্ধজ—সল্লকীবৃক্ষ (সলই গাছ)।

(৫) বীজরুহ—শালিধান্য ইত্যাদি।

(৬) সম্মূর্চ্ছজ—তৃণ ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অভিধান ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উদ্ভিদের নিম্নলিখিত শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—

১। বানস্পত্য—যে বৃক্ষের ফুল হইতে ফল হয়।

২। বনস্পতি বা দ্রুম—যে গাছের বিনা ফুলে ফল হয়।

৩। ফলেগ্রহী—ফলবান্ বৃক্ষ, যাহা বন্ধ্যা নয়।

৪। আরকেশিন—বন্ধ্য বৃক্ষ. যাহাদের ফল হয় না।

৫। ক্ষুপ—যে সকল বৃক্ষের শাখা ও মূল হ্রস্ব।

৬। গুল্ম—যাহা মৃত্তিকা হইতে শাখা বিস্তার করে।

৭। ওষধি—যাহা ফল পাকিলে মরিয়া যায়।

৮। বল্লী—যাহা ভূমিতে প্রসারিত হইয়া একবর্ষ মাত্র জীবিত থাকে, যথা—লাউ ও কুমড়ার লতা।

৯। লতা—যাহা অন্য তরুকে বেষ্টন করে।

১০। প্রতানিনী—প্রচুর শাখাপত্রাদিবিশিষ্ট লতা।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও কৃষিবিজ্ঞানসম্বন্ধে ভারতীয় মনীষিগণের তৎকালোচিত ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৃষিকার্য্য-পরিচালনার অভাবে উহা সম্যক্ উৎকর্ষলাভের অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশে কৃষিকার্য্য-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হওয়ায়, উহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং ঐ উন্নতির স্রোত দিকে দিকে প্রবাহিত হওয়ায়

জগতের অন্যান্য স্থানসমূহেও ঐ সকল উন্নত পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে।

ভূমি হইতে মানবের প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ উৎপাদন করাই কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্য। ভূমি হইতে উৎপন্ন পদার্থগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) ভূমিকর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত বিবিধ উদ্ভিদ্ এবং ফল ও শস্য। (২) পালিত জীবজন্তু ও ঐ সকল হইতে উৎপন্ন পদার্থ। প্রথমোক্ত পদার্থগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং শেষোক্ত পালিত জীবজন্তু ইত্যাদি ভূমিজ পদার্থ আহার করিয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে ভূমি হইতে উৎপন্ন।

ভূমি হইতে উৎপন্ন পদার্থের ক্রয়বিক্রয়কেও কৃষিকার্য্য বলা যায়। এইরূপ কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে কতকগুলি ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া অবিকৃত অবস্থাতেই বিক্রয় করা চলে, আর কতকগুলি জিনিষ বিকৃত অবস্থায় অর্থাৎ মূল পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিণত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। ধান, গম, যব, আলু, কলা, ডিম, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রথমোক্ত শ্রেণীর এবং গুড়, চিনি, মিশ্রি, দধি, ছানা, ঘৃত, ক্ষীর এবং রক্ষিত (preserved) ফল ইত্যাদি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রধানতঃ (১) মানবের আহার্য্য উৎপাদন করিয়া পৃথিবীর সম্পদ্ বৃদ্ধি করা হয়, (২) বস্ত্রাদি-নির্ম্মাণের উপকরণসমূহ উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকার পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া থাকে, (৩) কৃষিজাতবৃক্ষ-সমূহের কাষ্ঠ-দ্বারা মানবজাতির বাসগৃহ এবং গৃহ-সজ্জার বিবিধ আস্‌বাব প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া নানাবিধ ভেষজ এবং শিল্পের উপাদান কৃষিকার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আদর্শ কৃষিকার্য্য চিরকালই স্বয়ংসমর্থ, অর্থাৎ উহা চিরদিন নিজের সঙ্গতির উপর নির্ভর করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে। বাহির হইতে সার ক্রয় করিয়া আনিয়া কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ব্যতীতও শস্যের উন্নতি সাধন করা যায়। এই প্রকার উন্নতি শস্যাবর্ত্তন (rotation) এবং পশুপালন-সাপেক্ষ।

কৃষিকার্য্যকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) শস্যোৎপাদন, (২) পশ্বাদি জীবজন্তুপালন, (৩) অরণ্য-সংরক্ষণ এবং (৪) উদ্যানরচনা।

(১) **শস্যোৎপাদন**—ভূমি-কর্ষণ, সার-প্রয়োগ, জল-সেচন এবং অন্যান্য পরিচর্য্যা-দ্বারা ধান, গম, যব, পাট ইত্যাদি উৎপাদন করা শস্যোৎপাদন-বিষয়ক কৃষিকার্য্যের বিষয়ীভূত।

(২) **পশ্বাদি জীবজন্তু-পালন**—সাধারণতঃ আপন আপন ব্যবহারের জন্য এবং শাবকাদি উৎপাদন করিয়া বিক্রয়ের জন্য মানবগণ পশ্বাদি জীবজন্তু পালন করিয়া থাকে। এই জীবজন্তু-পালন আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন—গো, মেষ, মহিষ এবং ছাগাদি পশু-পালন; হংস, কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি পক্ষি-পালন, মধুমক্ষিকা, এবং মৎস্য-পালন ইত্যাদি।

(৩) **অরণ্য-সংরক্ষণ**—গৃহ প্রস্তুত করিবার উপাদান, গৃহসজ্জার উপাদান, পোতাদি প্রস্তুত করণ এবং ইন্ধনের জন্য অরণ্য সংরক্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি উৎপাদন করা হয়। অরণ্যহীন স্থানে স্বভাবতঃই বৃষ্টির অভাব হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় মৃত্তিকার রসাভাব এবং নদীহ্রদাদির জলাভাব-জনিত শস্য উৎপাদিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় ঐ সকল প্রদেশে অরণ্যের সৃষ্টি করিলে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল স্থানের ভূমি শস্যোৎপাদনের উপযোগী হইতে পারে।

(৪) **উদ্যান-রচনা**—ফল, শাক, সব্জী এবং নয়নাভিরাম বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ্ উৎপাদন করাকে উদ্যান-কৃষি বলে। উদ্যান-কৃষিকে আবার চারিটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) ফলকর উদ্যান, (খ) সব্জীবাগ, (গ) পুষ্পোদ্যান এবং (ঘ) প্রাকৃতিক দৃশ্যানুকরণ।

কৃষকগণের তাহাদের চিরাচরিত কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়েও ব্যুৎপন্ন এবং দক্ষ হওয়া আবশ্যক,

কারণ কৃষি এবং বাণিজ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ। দুঃখের বিষয় এতদ্দেশের অধিকাংশ কৃষক সবিশেষ কার্য্যকুশল নহে বলিয়া ইহারা কৃষিকার্য্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং কৃষকগণের কার্য্যপ্রণালীও বিবর্ত্তনশীল হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষকগণের অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পূর্ণরূপে সাময়িক বাণিজ্যের অবস্থার উপযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল বিষয় কৃষকগণকে পুস্তক-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা সাধারণতঃ কৃষকগণের প্রকৃতি, গৃহশিক্ষা এবং সুযোগ-সাপেক্ষ। কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে সফলতা অর্জ্জন করা কৃষকগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপরই অনেকটা নির্ভর করে।

কার্য্যকুশলতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে চলিতি-কথায় "হাতে হেতেড়ে" শিক্ষা বা অভ্যাস বলা যাইতে পারে। অথবা ইহাকে কৃষকগণের উপস্থিত বিষয়ে বিচারবুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষক যতই শিক্ষালাভ করুক না কেন, তাহার কৃষিক্ষেত্রলব্ধ অভিজ্ঞতা-লাভ-দ্বারাই তাহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে কি কি শস্য উৎপাদন করিতে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ প্রণালীতে কি প্রকার সার প্রয়োগ করিতে হইবে, কোন্ সময়ে বীজ বপন এবং শস্য কর্ত্তন করিতে হইবে এবং কোন শ্রেণীর পশুপালন করা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক ও লাভকর হইবে, এই সকল বিষয়ে আপন অভিজ্ঞতা ভিন্ন কিছুতেই কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কৃষকগণের মধ্যে পরস্পরের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার আদান-প্রদান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও প্রত্যেক কৃষকেরই তাহার আপন ক্ষেত্রের অবস্থানুযায়ী কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থানির্ণয় এবং তদনুরূপ কার্য্যসম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

শুধু শস্যোৎপাদন করাই কৃষকের একমাত্র কার্য্য নহে, পরন্তু তাহার উৎপাদিত শস্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষমতা থাকাও তাহার পক্ষে

নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাজারে যে সমস্ত কৃষিজাত সামগ্রীর চাহিদা অধিক এবং যে সকল কৃষিজাত পদার্থ দুষ্প্রাপ্য, কৃষকগণের পক্ষে সে সকল জিনিষই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা কর্ত্তব্য। বাণিজ্য-হিসাবে কৃষিজাত পদার্থের মূল্য দুই প্রকারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কৃষকগণের উৎপাদিত প্রধান আহার্য্য পদার্থ অর্থাৎ ধান, গম, যব, ভুট্টা, আলু, মাংস, ডিম, প্রভৃতির মূল্য বাজারের চাহিদা অনুসারে নির্ণীত হয়; চল্‌তি-কথায় তাহাকে বাজার-দর বলে। ঐ বাজার-দরের উপরে কৃষকের কোনও প্রকার হাত থাকে না, কিন্তু মানুষের ভোগ-বিলাসের জন্য কোনও বিশেষ পদার্থ, যেমন 'জল্‌দি' শাকসব্জী, অসময়ের ফুল, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করিতে পারিলে উহার মূল্য নির্দ্ধারণের উপর কৃষকের অনেকটা হাত আছে।

কৃষকগণকে ব্যবসায়ী অপেক্ষাও নানা বিষয়ে চিন্তাশীল হইতে হয়, কারণ শস্যাদি উৎপাদন করা নানাপ্রকার কার্য্যকুশলতা-সাপেক্ষ। কৃষিকার্য্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতার নানাপ্রকার প্রতিযোগিতা ও জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে তদানুষঙ্গিক যে সকল বিজ্ঞানে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য তাহাদের নাম ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics)

কৃষকগণের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে জড় দেহের মৌলিক গুণ (properties) এবং কার্য্যকারিতা প্রত্যেক কৃষিজাত পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ভূমির আর্দ্রতা (moisture), ভূমিকর্ষণ এবং রাসায়নিক পদার্থের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।

উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা (Botany)

উদ্ভিদ্‌ কৃষিক্ষেত্রের প্রধান উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং উদ্ভিদের প্রকৃতি-নির্দ্দেশক গুণসকল (characteristics) এবং শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি কৃষকগণের অবগত থাকা একান্ত আবশ্যক। কৃষিকার্য্যের দিক্‌ দিয়া উদ্ভিদ্‌-জীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব (Plant Physiology) অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌ কি প্রণালীতে জীবনধারণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং বংশবিস্তার করে; (২) উদ্ভিদের রোগ বিজ্ঞান (Plant Pathology) অর্থাৎ যে বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিদের অপরিপুষ্টতা ও রোগের নিদান জানিতে পারা যায়; (৩) উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ (Systematic Botany) অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রকৃতিগত পার্থক্য-অনুসারে উহাদিগকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা বিষয়ে জ্ঞান; (৪) একোলজি (Ecology) অর্থাৎ উদ্ভিদের পুষ্টি, স্থিতি ও অন্যান্য আবেষ্টনের সহিত সম্বন্ধ-বিষয়ক জ্ঞান।

রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry)

কৃষিক্ষেত্রজাত নানাপ্রকার উদ্ভিদের এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানাপ্রকার সার প্রভৃতির গুণাগুণ জানিতে হইলে রসায়ন-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কৃষিকার্য্যে সাধারণতঃ উদ্ভিদ্‌ ও পশুর আহার্য্যবিষয়ে গুণাগুণ-নির্ণয়ের জন্য রসায়ন-শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

জলবায়ু-বিজ্ঞান (Climatology)

স্থানীয় জলবায়ু উদ্ভিদ্‌ ও জীবজন্তুর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু উদ্ভিদ্‌ ও পশু-জীবনে নানাবিধ বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া থাকে, সুতরাং জলবায়ু-বিজ্ঞানসম্বন্ধে কৃষকগণের কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা ছাড়া আবহ-বিদ্যা কৃষিকার্য্যের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

ভূ-তত্ত্ব (Geology)

কোন স্থানের কৃষিকার্য্যের সফলতা ঐ স্থানের ভূমির গঠনের উপর নির্ভর করে সুতরাং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা কৃষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কৃষিকার্য্য কি প্রকার দুরূহ ও জটিল ব্যাপার। যদিও কৃষিকার্য্য বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অত্যধিক শ্রমসাপেক্ষ, তথাপি বিবিধ প্রকার বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও কৃষকগণকে বহুবিধ জটিল বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আপন আপন সূক্ষ্ম-দর্শিতার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হয়। কৃষকগণকে বিবিধজাতীয় উদ্ভিদের চাষ এবং বিবিধজাতীয় পশুপালন করিতে হয়; ঐ সকল উদ্ভিদ্‌ ও পশুর বিবিধরূপ প্রকারভেদ আছে। ঐ সকল অসংখ্য প্রকৃতির উদ্ভিদ্‌ ও পশুর উৎপাদন, পালন ও পরিচর্য্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কৃষকগণকে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া কার্য্য করিতে হয়। অসংখ্য আকস্মিক সমস্যা, জলবায়ুর খামখেয়ালী, কীট ও রোগাদির আক্রমণ, জন-মজুরের অনিশ্চয়তা ও অন্যান্য অভাবনীয় বিষয়ের সংঘর্ষের ভিতর দিয়া কৃষকগণের জীবন চিরদিন জটিল ও বৈচিত্র্যময় হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্তিকা

মৃত্তিকার উৎপত্তি

সচরাচর আমরা যে সকল উদ্ভিদ্ দেখিতে পাই তাহা মাটিতেই জন্মে এবং মাটি হইতেই আপন খাদ্য গ্রহণ করে, সুতরাং মাটির গঠন ও প্রকৃতিসম্বন্ধে কৃষকগণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আমরা এই যে মৃত্তিকার উপরে ঘর-বাড়ী তৈয়ার করিয়া বসবাস করিতেছি, এই মৃত্তিকা সৃষ্টির আদিকাল হইতেই এমন ভাবে ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী অনুমান করেন যে সৃষ্টির প্রথম অবস্থাতে এই পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, নীহারিকা প্রভৃতি কিছুই স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান ছিল না। এই মহাকাশ ব্যাপিয়া এক বিরাট্ তেজোময় মণ্ডলাকৃতি বাষ্পীয় পদার্থ নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইত এবং উহা ক্রমে ক্রমে তাপ বিকিরণ করিয়া সঙ্কুচিত ও শীতল হইতে লাগিল। ঐরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে উহার গাত্র হইতে বৃহদায়তন অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। সেই বিক্ষিপ্ত অংশগুলিই ক্রমে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট যাহা রহিয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান সূর্য্যমণ্ডল। পৃথিবী ঐরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রায় দশ কোটি মাইল দূরে আপন কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া লইল। উত্তাপের মূল উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উহার বাষ্পীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহা বাষ্পীয় অবস্থা হইতে একটি গলিত ও ঘনীভূত গোলকাকারে পরিণত হইল। এইরূপে ক্রমে তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার উপরিভাগে একটি সূক্ষ্ম প্রস্তরাবরণের সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ উহার

শৈত্যের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই উল্লিখিত প্রস্তরাবরণ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে লাগিল। তৎপরে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ বিবিধ শক্তির প্রভাবে উহাতে জল, বায়ু, পর্ব্বত ও নদ-নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান অধ্যায়ের বিষয়ীভূত নহে। এই প্রস্তরীভূত পৃথিবীর বহিরাবরণ হইতে অবশেষে কি প্রকারে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান অধ্যায়ের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়।

উল্লিখিত প্রস্তরীভূত ভূগোলক জল, বায়ু, তাপ ও অবশেষে উদ্ভিদ্ ইত্যাদির সাহায্যক্রমে স্তরপর্য্যায়ে মৃত্তিকাতে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে স্তরে স্তরে মৃত্তিকার গঠনকার্য্য চলিয়া আসিতেছে এবং যতকাল পৃথিবীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল প্রকৃতির এই গঠনকার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে না।

মৃত্তিকা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—স্থিতিশীল (Residual or Sedentary soil) এবং গতিশীল (Transported soil)। স্থিতিশীল মৃত্তিকা যে পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করে সেই পর্ব্বতের গাত্র হইতে আর অধিক দূরে অগ্রসর হয় না, এই জন্যই যাবতীয় পার্ব্বত্য প্রদেশে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গতিশীল মৃত্তিকা আপন জন্মস্থান (পর্ব্বত) পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশদেশান্তরে যাইয়া গা ঢালিয়া দেয়। এই জাতীয় মৃত্তিকার সর্ব্বপ্রধান চালক জল। গতিশীল মৃত্তিকার বিশেষত্ব এই যে ইহা স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে, কিন্তু স্থিতিশীল মৃত্তিকাতে কোন প্রকার স্তরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে না। গতিশীল মৃত্তিকা তিন প্রকারের হয়, যথা—তুষারবাহিত মৃত্তিকা (Drift or boulder clays), জলবাহিত মৃত্তিকা (Alluvium) এবং বায়ুচালিত মৃত্তিকা (Aeolian clays and sands)। পর্ব্বতের তুষার-রাশি যখন শিথিল হইয়া নিম্নের দিকে নামিয়া আসে তখন বহু শিলাখণ্ড বিচ্যুত হয়, এবং সংঘর্ষণের ফলে সূক্ষ্মতর বালুকণা ও পলিমাটির সৃষ্টি হয়। এই তুষাররাশি নিম্নে তাপাধিক্যবশতঃ গলিয়া নদীতে

পরিণত হয়। ক্রমে ঐ তুষারনদী যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় তখন পলি ও বালুকারাশি তাহার তলদেশে স্তর রচনা করে, ইহাই তুষারবাহিত মৃত্তিকা। প্রবল ঝটিকাঘাতে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইলে তাহার মূলসংলগ্ন মৃত্তিকা এবং প্রস্তরসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নিম্নে পতিত হয়। ঐ সকল বালুকণা ও চূর্ণীভূত প্রস্তর বৃষ্টিবারি-দ্বারা নদীতে পরিচালিত হইয়া স্রোতে দেশদেশান্তরে নীত হয়। ঐ মৃত্তিকা এবং চূর্ণীভূত প্রস্তরগুলি পর্ব্বত হইতে যতই দূরে যায়, পরস্পর ঘর্ষণের ফলে ততই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে। নদীর স্রোতের বৈষম্যহেতু উহা জলের নিম্নে পতিত হইয়া নানা স্থানে নানা প্রকার স্তরের সৃষ্টি করে এবং বর্ষার সময়ে ঐ পলিমাটি নদীর উভয় কূলের শস্যক্ষেত্রগুলিকে সারবান্ করিয়া তুলে। ঐ সকল জমিতে শস্যোৎপাদনের জন্য অন্য কোনপ্রকার সারের প্রয়োজন হয় না; ইহারই নাম জলবাহিত মৃত্তিকা। বায়ুর সাহায্যে কখনও কখনও মৃত্তিকা ও বালুকারাশি পরিচালিত হইয়া থাকে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে নানা স্থানে নানা ভাবে সঞ্চিত হয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ তরঙ্গায়িত বালুকারাশির নাম করা যাইতে পারে। মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ইহাকে "বালিয়াড়ি" কহে, চীনদেশের "লোয়েস্" (Loess এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মাটি যে কোনো শ্রেণীর হউক না কেন সাধারণতঃ পাথরের চূর্ণীভূত ও ক্ষয়প্রাপ্ত (disintegrated) অবস্থামাত্র। জল, বায়ু, তাপ এবং শৈত্যের প্রভাবে পাথর চূর্ণ হইয়া মাটিতে পরিণত হয়। পাথর ছাড়া অন্যান্য জিনিষ-দ্বারাও অবস্থাবিশেষে মাটির স্তর গঠিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ের যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে। পাথর কি কি কারণে চূর্ণীভূত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মাটিতে পরিণত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে নিম্নে লিখিত হইল :—

জমাট তুষারের চাপে পাথর গুঁড়া হইয়া মাটিতে পরিণত হয়।

পর্ব্বতে বৃষ্টি হইলে প্রবল জলধারা নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িবার সময় পাথর ক্ষয় হইয়া যায় এবং স্রোতে চালিত পাথরের নুড়িগুলি পরস্পর সংঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মাটিতে পরিণত হয়।

প্রবল বাতাসে ছোট ছোট পাথরের কণা চারিদিকে পরিচালিত হয়। প্রবল ঘূর্ণি-বাতাসে বালু ও কাঁকরের সংঘর্ষে পর্ব্বতগাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ ক্ষয়িত অংশগুলি মাটিতে পরিণত হইয়া যায়।

আকস্মিক উত্তাপে অনেক সময়ে পাথর ফাটিয়া যায় এবং বৃষ্টির প্রভাবে কালক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মাটিতে পরিণত হয়। উত্তাপ সংযোগে পাথর ফাটাইবার উদাহরণ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। খুব বড় পাথর ফাটাইতে হইলে শ্রমজীবিগণ উহা অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর জল ঢালিয়া দেয়। জল ঢালিবামাত্রই পাথর আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়।

বর্ষার সময়ে পাহাড়ের ফাটলে যে জল প্রবেশ করে, শীত ঋতুতে ঐ জল বরফে পরিণত হইয়া যায়; জল বরফে পরিণত হইলে উহা আয়তনে বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ঐ বরফের চাপে পাথর চূণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ চূর্ণীভূত প্রস্তররাশি জলের সহিত পরিচালিত হইয়া পলি-মাটির সৃষ্টি করে।

গাছের সরু শিকড় পাথরের ফাটলে প্রবেশ করিয়া ক্রমে মোটা হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফাটাইয়া মাটিতে পরিণত করে। বৃষ্টি-সম্পাতের সময় অল্পাধিক জল ও বায়ু ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর পতিত হয় ও নিম্নস্তরে প্রবেশ করে। প্রবেশ করিবার সময় উক্ত জল ও বায়ু ভূপৃষ্ঠজাত উদ্ভিদের (বৃক্ষ ও শৈবাল ইত্যাদি) ধ্বংসাবশিষ্ট গলিত অংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক এসিড্ গ্যাস (Carbonic acid gas) ও হিউমিক বা উল্‌মিক (Humic or Ulmic acid) এসিড উৎপন্ন করে এবং নিম্নস্থিত প্রস্তরগাত্রে প্রবাহিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষয় করিতে থাকে।

ফেল্‌স্‌পার (Felspar) নামক খনিজ পদার্থ অল্পবিস্তর অনেক প্রস্তরেই আছে। জল কিংবা জলের সহিত মিশ্রিত নাইট্রিক (Nitric) প্রভৃতি এসিড্ এবং ফ্লোরিন (Flourine), অক্‌সিজেন (Oxygen), কার্ব্বনিক এসিড্ (Carbonic acid) প্রভৃতি গ্যাস এই ফেল্‌স্‌পারের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে এবং ফলে হাইড্রেটেড্ এলুমিনিয়াম সিলিকেট (Hydrated Alluminium Silicate) উৎপন্ন হয়,—ইহাই মৃত্তিকার প্রধান রাসায়নিক উপাদান। * এই প্রকারে প্রস্তর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাতে পরিণত হয় এবং ক্ষয়িত অংশ যতই পুরু স্তরে পরিণত হয় ততই সুবৃহৎ তরু-গুল্মাদি জন্মিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

প্রবল ঝড়ে যখন বড় গাছ উৎপাটিত হয় তখন উহার শিকড়ের টানে পাথর গুঁড়া হইয়া মাটিতে পরিণত হয়।

আরও কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে পাহাড়-পর্ব্বতের পাথর মাটিতে পরিণত হয়। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতুতে নির্ঝর বা ঝরণার সহিত উহা সমতল ভূমির দিকে নামিয়া আসিয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে থাকে। পুকুর অথবা অন্য কোনপ্রকার খাত খনন করিবার সময়ে ঐ সকল স্তরের সমাবেশ সুন্দররূপে লক্ষ্য করা যায়।

জীবাণু (Bacteria) দ্বারাও মৃত্তিকায় নানাপ্রকারের স্তরের সৃষ্টি হয় (জীবাণু অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে, ল্যাটারাইট (Laterite) নামক যে পাটল মৃত্তিকা বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা এই জীবাণুরই কার্য্য।

---

* রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় শস্যের উপযুক্ত মৃত্তিকা তিনটি প্রধান উপাদানে গঠিত, যথা :—ফেল্‌স্‌পার হইতে উৎপন্ন হাইড্রেটেড্ এলুমিনিয়াম সিলিকেট, কোয়ার্টজ্ (Quartz) এবং ঐ শ্রেণীর প্রস্তর হইতে উৎপন্ন বালুকণা ও গলিত উদ্ভিদ্-দেহ হইতে উৎপন্ন হিউমাস (Humus) ; ইহা ব্যতীত মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদানগুলি নানাপ্রকার খনিজ, রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন।

ইহা ছাড়া ভূগর্ভের তাপের প্রভাবে আগ্নেয়গিরি হইতে নানা-প্রকার খনিজ পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্তরের সৃষ্টি করে এবং কালক্রমে উহাই মৃত্তিকাস্তরে পরিণত হয়।

ভূকম্পন-দ্বারা সাগরতলস্থ মৃত্তিকা উত্তোলিত হইয়া সাগরগর্ভে দ্বীপের সৃষ্টি করে।

সাগরতলে ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ প্রভৃতি জলচর প্রাণিগণ বাস করে। উহারা মরিয়া গেলে উহাদের খোলাগুলি সাগরতলে জমা হইয়া এক প্রকার চূণবহুল স্তরের সৃষ্টি করে, ঐ সকল স্তর ক্রমে উচ্চ হইয়া সমুদ্রের উপকূলভাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

প্রবাল-কীট নামক একপ্রকার জলজ কীট সমুদ্রের তলে জন্মগ্রহণ করে। এইজাতীয় বহুসংখ্যক কীট একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; একদল মরিয়া গেলে উহাদের কঙ্কালের উপরে নূতন আর এক দলের সৃষ্টি হয়; এইরূপে উহাদের কঙ্কালজাত স্তর-দ্বারা সমুদ্রের উপকূলের নিকট বহু দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে। ভারত-মহাসাগরে লাক্ষা এবং মাল দ্বীপপুঞ্জ প্রবাল-কীট-দ্বারা গঠিত হইয়াছে।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ

সাধারণতঃ কর্দ্দম, বালুকা, চূণ এবং বিবিধ জৈবিক পদার্থের সংমিশ্রণে মৃত্তিকা সংগঠিত হইয়াছে। ঐ সকল জিনিষের মধ্যে কর্দ্দম, বালুকা ও চূণ প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্ সমূহের ধ্বংসাবশেষ জৈবিক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। এই কর্দ্দম, বালুকা এবং জৈবিক পদার্থের তারতম্যের উপরে ভূমির উর্ব্বরতা এবং অনুর্ব্বরতা নির্ভর করে।

মাটি প্রধানতঃ এঁটেল ও বেলে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুইটির মিশ্রণে আরও কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে—যেমন দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ প্রভৃতি।

বেলে মাটি

যে মাটিতে বালুর ভাগ বেশী তাহার নাম বেলে মাটি। নিভাজ বেলে মাটিতে শতকরা ৮০ ভাগ বালি থাকে। নদীর নূতন চড়াভূমি ঐ শ্রেণীভুক্ত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বেলে মাটি কৃষিকার্য্যের উপযোগী নহে, কিন্তু শীতপ্রধান দেশ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বেলে মাটিতেও কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করা যায়। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য মাটিতে উপযুক্ত মাত্রায় বালুকা মিশ্রিত থাকা আবশ্যক, কারণ নিভাজ এঁটেল মাটি শস্যের পক্ষে অনুকূল নহে। মাটিতে বালুকা মিশ্রিত থাকিলে মাটি বেশ 'হাল্‌কা' হয় এবং সহজে উহার ভিতরে জলবায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

এঁটেল মাটি

যে মাটিতে কাদার অংশ বেশী তাহার নাম এঁটেল মাটি। নিভাজ বেলে মাটি যেমন কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনুপযোগী, নিভাজ এঁটেল মাটিতেও তেমন কৃষিকার্য্য চলিতে পারে না। নিভাজ এঁটেল মাটি বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেরূপ মাটি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; আমরা যাহাকে এঁটেল মাটি বলি তাহা স্বভাবতঃই উর্ব্বরা। এঁটেল মাটির পরমাণুগুলি স্বভাবতঃই সূক্ষ্ম, এই কারণেই উহার জলধারণের ক্ষমতা অধিক। বেলে মাটি অপেক্ষা এঁটেল মাটি শক্ত, তাই বেলে মাটি অপেক্ষা এঁটেল মাটির চাষে খরচ বেশী। এঁটেল মাটি ভিজা অবস্থায় চাষ করিয়া রাখিলে অত্যন্ত শক্ত হইয়া পড়ে। শেষে ঐ মাটি গুঁড়া করিয়া লওয়া বিশেষ শ্রম-সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য হয়, সুতরাং বৃষ্টির পরে খুব ভিজা অবস্থায় ঐ মাটি চাষ না করিয়া একটু শুকাইয়া আসিলেই চাষ করা উচিত।

দো-আঁশ মাটি

বেলে ও এঁটেল মাটির সংমিশ্রণে দো-আঁশ মাটি গঠিত হয়। দো-আঁশ মাটিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে মাটিতে কাদা

ও বালির অংশ সমান তাহাকে দো-আঁশ, এবং যাহাতে বালির অংশ বেশী তাহাকে বেলে দো-আঁশ, এবং যাহাতে কাদার অংশ বেশী তাহাকে এঁটেল দো-আঁশ বলে। এঁটেল মাটি অপেক্ষা দো-আঁশ মাটিতে জৈবিক পদার্থের পরিমাণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিকার্য্যে দো-আঁশ মাটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। এই মাটিতে প্রায় সকলজাতীয় ফসলই উৎপন্ন হইতে পারে। এই মাটির উৎপাদিকা শক্তি অধিক এবং ইহার উৎপাদিকা শক্তি সহজে নষ্ট হয় না। অপর দিকে দো-আঁশ মাটি খুব সহজে কর্ষণ করা যায়। সারপ্রয়োগে দো-আঁশ মাটিতে যেমন ফল পাওয়া যায় তেমন আর কোন শ্রেণীর মাটিতেই পাওয়া যায় না। উপযুক্ত পরিমাণ আর্দ্রতা রক্ষা করিবার শক্তি দো-আঁশ মাটির যেমন আছে, অন্য কোন মাটির তেমন নাই। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে এই মাটি খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

চূণা পাথর হইতে যে মাটির গঠন হয় তাহাকে চূণবহুল মৃত্তিকা অথবা ক্যালকেরিয়াস্ সয়েল (Calcareous soil) বলে। এই মাটিতে চূণের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর যে মাটিতে চূণের অংশ শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগের মধ্যে আছে তাহাকে মার্লি সয়েল (Marly soil) বলে। এই মাটি স্বভাবতঃই খুব 'হাল্কা' এবং চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে 'সাল্ফেট্'-এর ভাগ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জাত মাটি

নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থের মিশ্রণে যে মাটির গঠন হয় তাহার নাম উদ্ভিজ্জাত মাটি। এই শ্রেণীর মাটিতে চূণের ভাগ প্রায়ই থাকে না।

উল্লিখিত কয়েকপ্রকার মাটি ছাড়া নদী ও মোহনার স্থানে স্থানে একপ্রকার চড়া-ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য স্থান হইতে ভাঙ্গনের মাটি স্রোতের সহিত চালিত হইয়া ঐ মাটি স্রোতোহীন স্থানে স্তরে স্তরে

সজ্জিত হয় এবং প্রতিবৎসর এইরূপ পলি পড়িতে পড়িতে ক্রমে উচ্চ হইয়া চড়া-ভূমি গঠিত হয়। নদীতীরস্থ বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার মাটির সংমিশ্রণে এই মাটি গঠিত হয় বলিয়া ইহা বিশেষ সারবান্ হইয়া থাকে। এই কারণেই চড়া-ভূমিতে ফসল করিতে সারের প্রয়োজন হয় না।

উল্লিখিত বালু, কাদা, চূণ এবং জৈবিক পদার্থগুলি মাটিতে ওত-প্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে। ঐগুলিকে পৃথক্ করিয়া লইবার জন্য নানাবিধ সহজ উপায় আছে, তাহার ভিতর হইতে একটির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। কতক মাটি লইয়া ২১২° ফা. তাপাংশে উহা উত্তপ্ত করিলে ঐ মাটি হইতে জলীয় অংশ সব নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তৎপরে ঐ মাটি হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাটি ওজন করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ মাটি যতক্ষণ লাল না হইয়া উঠে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনে পোড়াইতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে মাটি হইতে দাহ্যমান জৈবিক পদার্থগুলি পুড়িয়া গিয়া ঐ মাটির ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। এইরূপে ঐ মাটিতে কত জৈবিক পদার্থ ছিল তাহা জানা যাইবে। তারপর ঐ মাটি একটি পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে জলের সহিত মিশাইয়া মাটিমিশ্রিত জল কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে পাত্রের উপরিভাগ হইতে কতক জল ফেলিয়া দিলে উহার সহিত কাদার কতক অংশ চলিয়া যাইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ৪।৫ বার করিলেই কাদার ভাগ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া বালুর ভাগ সম্পূর্ণ পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকিবে। এখন এই বালু আগুনে শুষ্ক করিয়া ওজন করিয়া লইতে হইবে, তৎপরে পুনরায় আগুনে পোড়াইয়া অবশিষ্ট জৈবিক পদার্থ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতে হইবে। পূর্ব্ববারের উত্তাপে যে জৈবিক পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে তাহার সহিত বর্ত্তমান নিঃশেষিত জৈবিক পদার্থ যোগ করিলে ঐ মাটিতে মোট কতটা জৈবিক পদার্থ ছিল তাহা নির্ণীত হইবে। এইরূপে বালুকার পরিমাণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এখন ঐ মাটির

ওজন হইতে জৈবিক পদার্থ ও বালুকার ওজনের সমষ্টি বাদ দিলেই কাদার ওজন বাহির হইয়া পড়িবে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ড, খড়ি বা চূণ (Chalk) ও কঙ্করবহুল মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পদার্থের প্রাচুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ঐ সকল মাটি প্রস্তরময় (Stony), চূণবহুল (Calcareous), কঙ্করময় (Gritty) প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মাটিতে ঐ সকল পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে বিশ্লেষণের পূর্ব্বেই মাটি হইতে উহা পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইবে। মাটিগুলি প্রথমে ঘরের শুষ্ক মেজেতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তারপর মাটি শুকাইয়া গেলে উহা ভালরূপে গুঁড়া করিয়া প্রস্তরখণ্ডগুলি চালুনী দিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে। ঐগুলি হইতে ভালরূপে মাটি ছাড়াইয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে ঐ মাটিতে কি পরিমাণ প্রস্তর ছিল তাহা জানিতে পারা যাইবে। এখন অবশিষ্ট মাটিগুলি একটি সূক্ষ্মতর চালুনী দিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিলে কাঁকরগুলি চালুনীতে থাকিয়া যাইবে এবং মাটি চালুনী হইতে বাহির হইয়া যাইবে। ইহার পর মাটিগুলি পূর্ব্বলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হইবে।

মৃত্তিকার প্রকৃতি

ভূ-পৃষ্ঠে বৃষ্টিবারি পতিত হইলে তাহার কতক অংশ নিম্নভূমির দিকে চলিয়া যায়, অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করে। পৃথিবীর জড়-পদার্থমাত্রেরই সচ্ছিদ্রতা (Porosity) নামে একটি গুণ বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ জড়-পদার্থমাত্রই ছিদ্রময়; এমন কি লৌহ, প্রস্তর, কাচ ইত্যাদিতেও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বর্ত্তমান আছে। মৃত্তিকাতেও ঐ গুণ বর্ত্তমান আছে। জলরাশি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে এই সচ্ছিদ্রতা গুণেই প্রবেশ করে। মৃত্তিকা-ভেদে সচ্ছিদ্রতা-গুণের পার্থক্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকার এই গুণটি মৃত্তিকার উর্ব্বরতার আধিক্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়—প্রস্তরগাত্রে লিচেন (Lichen) জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ

ভিন্ন কিছুই জন্মিতে পারে না। কিন্তু এই প্রস্তর চূর্ণ করিয়া দিলে তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে।

মৃত্তিকার দানার সূক্ষ্মতার তারতম্যের উপর উহার সচ্ছিদ্রতা গুণ নির্ভর করে। যে মৃত্তিকার দানা যত মোটা তাহার ছিদ্রও সেই পরিমাণে মোটা। স্থূল ছিদ্র-দ্বারা বৃষ্টির জল সহজে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে (Sub-soil) প্রবেশ করিতে পারে। বেলে মাটি এই জাতীয় মৃত্তিকার উদাহরণস্থল। পক্ষান্তরে যে জাতীয় মৃত্তিকার দানা যত সরু উহার ছিদ্র সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম ছিদ্র-দ্বারা সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই এই জাতীয় মৃত্তিকার শোষণ-শক্তি অল্প। এঁটেল মাটি এই শ্রেণীভুক্ত।

যে মৃত্তিকা যে পরিমাণে জল শোষণ ও ধারণ করিতে পারে, সেই মৃত্তিকাতে উৎপন্ন শস্য সেই পরিমাণে অনাবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

বেলে মাটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ছিদ্রবিশিষ্ট, সেই জন্য উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল শোষণ করিতে পারে, কিন্তু উহার জল ধারণ করিবার শক্তি অত্যন্ত অল্প। পক্ষান্তরে এঁটেল মাটির অন্তর সূক্ষ্ম বলিয়া উহার জল শোষণ করিবার শক্তি কম, কিন্তু জলধারণের শক্তি বেশী।

বৃষ্টির সময়ে মৃত্তিকা আপন আপন শক্তি অনুসারে অল্পাধিক পরিমাণে জল ধারণ করিয়া রাখে। পরে ঐ সঞ্চিত জলরাশি সূর্য্যোত্তাপে বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। বেলে মাটি স্থূলচ্ছিদ্র বলিয়া উহার সঞ্চিত জলরাশি অতি অল্প সময়েই নিঃশেষিত হয়।

এঁটেল মাটির ছিদ্র সরু হওয়ার জন্য উহার সঞ্চিত জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। এই জন্যই অনাবৃষ্টির সময়ে এঁটেল মাটিতে উৎপন্ন ফসল অপেক্ষা বেলে মাটিতে উৎপন্ন ফসল অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বৃষ্টিপাত হইলে মৃত্তিকা আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে অল্পাধিক জল গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে গৃহীত জলের

কতক অংশ বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া যায়, যাহা বাকী থাকে তাহা ভূপৃষ্ঠের কোন বিশেষ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদের শিকড়ের নিকট উপস্থিত হয়। উদ্ভিদ্ তাহা মূল-দ্বারা আবশ্যকমত শোষণ করিয়া আপন আপন জীবন ধারণ করে। ভূপৃষ্ঠের যে আকর্ষণ-দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল এইভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity) বলে। এই শক্তির প্রভাবেই শলিতা তৈল শোষণ করে এবং স্পঞ্জ জল শোষণ করিয়া লইতে পারে।

মৃত্তিকার কৈশিক আকর্ষণশক্তি উহার দানার সূক্ষ্মতার উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাতে কৈশিক আকর্ষণের শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বেলে মাটির দানা অল্প বলিয়া উহার কৈশিক আকর্ষণশক্তি অল্প, কিন্তু এঁটেল ও দো-আঁশ মাটির দানা সূক্ষ্মবিধায় উহাদের কৈশিক আকর্ষণশক্তি প্রবল। যে দো-আঁশ মাটিতে জৈবিক পদার্থের অংশ বেশী তাহার এই শক্তি অত্যন্ত অধিক।

মাটি উত্তমরূপে চূর্ণিত অবস্থায় থাকিলে তাহাতে কৈশিক আকর্ষণ-শক্তিও উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারে। আর যদি উহা ডেলাযুক্ত অবস্থায় থাকে তাহা হইলে কৈশিক আকর্ষণের শক্তি উহাতে ভালরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে দুইটি ক্ষেত্রের মধ্যে যেটি উত্তমরূপে কর্ষিত ও যাহার মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণিত তাহাতে বীজ বপন করিলে যেরূপ সত্বর অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং উদ্ভিদ্ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় অল্পকর্ষিত জমিতে ঐরূপ ফল কখনও পাওয়া যায় না।

দিবাভাগে মৃত্তিকা হইতে কতক পরিমাণ জল বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এই বাষ্পরাশি বায়ুমণ্ডলেই অবস্থিতি করে এবং ঐ জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু যখন ভূপৃষ্ঠে আসিয়া লাগে তখন উহার জলীয় ভাগ মৃত্তিকা কতক পরিমাণে শোষণ করিয়া রাখে। ইহার দ্বারা পূর্ব্বের ক্ষতির কিছু পরিমাণে পূরণ হয়। যে শক্তি-দ্বারা মৃত্তিকা বায়ুমণ্ডলস্থ এই জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া থাকে তাহাকে আর্দ্রতাগ্রাহী

ক্ষমতা বা হাইগ্রোস্কোপিক্ পাওয়ার (Hygroscopic power) বলে।

শ্রেণীভেদে মৃত্তিকা জল ও উত্তাপ দ্বারা অল্পাধিক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এঁটেল ও দো-আঁশ মাটিতেই এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ-গুণ অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

গ্রীষ্মকালে জমির মধ্যে জালের ন্যায় বিস্তৃত এক প্রকার ফাটল দৃষ্ট হয়; মৃত্তিকার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ-গুণেই জমি এইরূপ বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এঁটেল মাটিতে এই ফাটল অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, এঁটেল মাটির দানাগুলি খুব সূক্ষ্ম হয় এবং সহজেই উহারা পরস্পর যোগাকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া আসিতে চাহে। এইরূপ পরস্পর যোগসূত্রে আবদ্ধ মৃত্তিকার প্রকৃতি পরস্পর বিপরীতভাবাপন্ন; অর্থাৎ বেলে মাটির জলধারণ-ক্ষমতা অল্প কিন্তু জলশোষণ-শক্তি অধিক, এবং এঁটেল মাটির জলধারণ-শক্তি অধিক কিন্তু জলশোষণ-শক্তি অল্প। বেলে মাটি স্থূলচ্ছিদ্র বলিয়া উহাতে জল সেচন করিলে সূর্য্যোত্তাপে তাহা অতি সত্বর বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, এইজন্য ইহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে অনুকূল নহে। অপর পক্ষে এঁটেল মাটি অত্যন্ত সূক্ষ্মচ্ছিদ্র বলিয়া উহাতে সিঞ্চিত জল সহজে নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য বৃষ্টির সময়ে উহার উপরিভাগে জল দাঁড়াইয়া যায় এবং রৌদ্রে শুষ্ক হইলে এমন শক্ত হয় যে উহার মধ্যে জল চালনা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এঁটেল মাটি সিক্ত অবস্থাতে চাষ করিলে কর্ষিত মৃত্তিকা ডেলাতে পরিণত হয় এবং উহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। এঁটেল মাটির আর একটি প্রধান দোষ—উহা সূর্য্যোত্তাপে এত ফাটিয়া যায় যে তন্মধ্যস্থ জল অতি সহজেই ঐ ফাটল দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়।

এই সকল কারণে এঁটেল মাটিও কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযোগী নহে। দো-আঁশ মাটিতে উল্লিখিত কোন প্রকার অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই দো-আঁশ মাটি কৃষিকার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ

উপযোগী। বেলে ও এঁটেল মাটিকে কি প্রকারে দো-আঁশে পরিণত করিতে হয় সে বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

বেলে মাটির সহিত গোময়-সার, আবর্জ্জনা, পচা পাতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-পদার্থমিশ্রিত সার মিশাইয়া দিলে, ইহা কতক পরিমাণে দো-আঁশ মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জসারের জলধারণ-শক্তি অধিক, অতএব এই সার-মিশ্রণ দ্বারা বেলে মাটির জলধারণ-শক্তির অল্পতা দুর হইয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত জমিতে ধঞ্চে, শণ অথবা অন্য কোন প্রকার শিম্বাদিজাতীয় (Leguminous) শস্য জন্মাইয়া ঐ গাছগুলি চাষ এবং মৈ দ্বারা কাঁচা অবস্থাতে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলে মৃত্তিকা কতক পরিমাণ দো-আঁশে পরিণত হয়। স্থানান্তর হইতে এঁটেল মাটি আনিয়া বেলে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলেও উহা দো-আঁশে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বেলে মাটির জলরক্ষণ-শক্তি অত্যন্ত অল্প। এই দোষনিবারণের জন্য ক্ষেত্রের উপরিভাগে "রোলার" যন্ত্র-দ্বারা উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে নিম্নস্তরের জল সত্বর উপরে উঠিয়া আসে।

বর্ষার সময়ে যে সকল জমি জলে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পূর্ব্ব হইতেই সেই সকল জমির চতুষ্পার্শ্বে আল বাঁধিয়া জল আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ জলমিশ্রিত পলি, ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, উহাকে কতক পরিমাণে দো-আঁশ করিয়া দেয়। যদি আপনা হইতে ক্ষেত্র জলে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে নিকটবর্ত্তী নদী, খাল অথবা অন্য কোনও জলাশয় হইতে নালা কাটিয়া জল চালাইয়া আনিয়া ঐ জল ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও উল্লিখিত কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

এঁটেল মাটিকে দো-আঁশে পরিণত করিবার নিয়ম :—এঁটেল মাটির সঙ্গে বালি অথবা ছাই মিশাইয়া দিলে উহা দো-আঁশে পরিণত হয়। চূণ-মিশ্রণ দ্বারাও ঐ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। জমি গভীরভাবে

কর্ষণ করিয়া নিম্নস্তরের মাটি উপরে আনিয়া দিলে উহা কতক পরিমাণে দো-আঁশে পরিণত হয়।

গোময়-সার, সবুজ-সার এবং গৃহজাত সার (আবর্জ্জনাদি) প্রয়োগ করিলে এঁটেল মাটি কতক পরিমাণে দো-আঁশে পরিণত হয়। নালা কাটিয়া জলনিকাশের উত্তম ব্যবস্থা করিলেও মৃত্তিকার অবস্থান্তর ঘটে।

উল্লিখিত কয়েকটি প্রণালী ব্যতীত, ক্ষেত্রের উপরিভাগ অগ্নি-সংযোগ দ্বারা পোড়াইলেও এঁটেল মাটি কতক পরিমাণে দো-আঁশে পরিণত হয়। মৃত্তিকা পোড়াইলে তন্মধ্যস্থ কতকগুলি উপাদান উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী আহার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু যাহাতে মাটি অতিরিক্ত পুড়িয়া না যায় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাটি অতিরিক্ত মাত্রায় পুড়িয়া গেলে উহার নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য জৈবিক পদার্থের ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। নূতন আবাদী বা গড়তোলা জমি ভিন্ন অন্য কোন জমি অতিরিক্তমাত্রায় দহন সহ্য করিতে পারে না। মৃত্তিকা অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য জৈবিক পদার্থের হ্রাস ব্যতীত আর একটি দোষ ঘটিয়া থাকে। যে 'হাল্‌কা' অবস্থায় পরিণত করিবার জন্য জমিকে পোড়ান হয়, তাহার পরিবর্ত্তে উহা আরও শক্ত হইয়া যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ্-জীবন

মানবগণের ব্যবহারোপযোগী নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ উৎপাদন করাই কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্য। অতএব কৃষিকার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে উদ্ভিদ্-বিদ্যায় মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা দ্বারা উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, প্রকৃতি এবং জীবনধারা প্রভৃতি বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ্গণও প্রাণবান্ পদার্থ। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদ্গণেরও স্বয়ংবর্দ্ধনশীলতা (independent growth), সচলতা (power of movement and locomotion), বংশবিস্তারক্ষমতা (power of reproduction) এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া (respiration) বর্ত্তমান আছে। জীব-বিজ্ঞানে যেমন জীবসম্বন্ধে বহু দিক্ দিয়া বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানেও সেইরূপ শরীরতত্ত্ব (Morphology), উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব (Physiology), উদ্ভিদের জীবনযাত্রাবিষয়ক তত্ত্ব (Ecology) এবং উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ (Classification) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। এ স্থলে উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; কৃষি-বিজ্ঞানের সংস্রবে উদ্ভিদ্-বিদ্যার যে সকল অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কেবল তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

মনুষ্য এবং পশু প্রভৃতি যেমন মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, বীজ হইতে তেমন উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। বীজ হইতে কেমন করিয়া উদ্ভিদের উৎপত্তি হয় সে বিষয়ে নিম্নে আলোচিত হইল।

মটর, ছোলা, সিম প্রভৃতির বীজ ভিজাইয়া রাখিলে ঐগুলি ফুলিয়া উঠে এবং খোসা নরম হইয়া যায়। তখন ঐ বীজ হইতে খোসা ছাড়াইয়া লইলে দেখা যায় যে, (১ নং চিত্র) ভিতরের দানাটি (যাহা আমরা ডালরূপে আহার করিয়া থাকি) সমান দুইভাগে বিভক্ত রহিয়াছে। ঐ দুইটি ভাগের নাম বীজদল বা বীজপত্র (Cotyledon)। এই দল দুইটিকে

নখের সাহায্যে ফাঁক করিয়া লইলে উহার ভিতর একটি ছোট জিনিষ
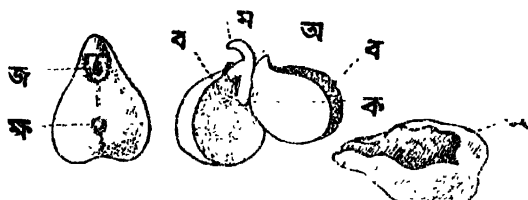
১ নং চিত্র

জ=জলরন্ধ্র ; ক্ষ=বীজক্ষত ; ব=বীজদল ; ম=ভাবী মূল ;
অ=অঙ্কুর ; ক=ভাবী কাণ্ড ; খ=বীজচ্ছদ।

দেখিতে পাওয়া যায়, ঐটিই ভবিষ্যৎ-উদ্ভিদের অঙ্কুর (Embryo)। গাছের অঙ্কুরের বাঁকা সূক্ষ্ম মুখটির নাম ভাবী মূল (Radicle) এবং চ্যাপ্টা কাটা দিক্‌টার নাম ভাবী কাণ্ড (Plumule)। ঐ অঙ্কুরের ভিতরই গাছের সমস্ত অবয়ব অপরিস্ফুটভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ অঙ্কুরটিই কালক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাবয়ব উদ্ভিদে পরিণত হয় অর্থাৎ ভাবী মূল বৃদ্ধি পাইয়া গাছের মূল, এবং ভাবী কাণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া গাছের কাণ্ডে পরিণত হয়।

একটি দ্বিদল-বীজ (মটর, ছোলা ইত্যাদি) ভিজাইয়া খোসা ছাড়াইবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিলে (১ নং চিত্র) খোসার গায়ে একটি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্কুরের ভাবী মূলের সূক্ষ্ম বাঁকা অংশ ঐ ছিদ্রের দিকে মুখ করিয়া বীজদলের মধ্যে থাকে। ঐ ছিদ্রটিকে জলরন্ধ্র (Micropyle) বলে। ঐ জলরন্ধ্রের নীচে লম্বাভাবে একটি রেখা চলিয়া গিয়াছে। ঐ রেখার গায়ে গাঢ়-রংবিশিষ্ট একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম বীজক্ষত (Hilum)। বীজটি ঐ স্থানে ফলের সহিত আবদ্ধ থাকে। বীজের আবরণ বা খোসাকে বীজচ্ছদ (Testa) বলে।

সমস্ত উদ্ভিদের বীজ দুই দলে বিভক্ত নহে; ধান, গম, যব ও নারিকেল প্রভৃতির বীজ একদলবিশিষ্ট। এই হিসাবে বীজকে একদল-বীজ (Monocotyledon) ও দ্বিদল-বীজ (Dicotyledon) এই দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

একদল-বীজের বীজদল ভিন্নরূপ। একটি ভিজানো ধানকে লম্বাভাবে (longitudinal) সমান দুইভাগে ছেদন করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—(২ নং চিত্র) স্থূলাগ্রের দিকে খোসা বা বীজচ্ছদের দুই পাশে পক্ষের ন্যায় দুইটি ক্ষুদ্র সাদা অংশ আছে। ধানের অঙ্কুর সেই সাদা অংশের কাছে থাকে। অঙ্কুরটির ভাবী মূল ও ভাবী কাণ্ডের সংযোগ-স্থলে একটি বেষ্টনীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই একদল-বীজের বীজদল। এই অঙ্কুরটি ধানের ভিতর অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ধানের বাকী অংশ অর্থাৎ যাহা আমরা চাউলরূপে আহার করিয়া থাকি, সেই পদার্থের নাম "ভ্রূণান্ন" (Albumen)। এই
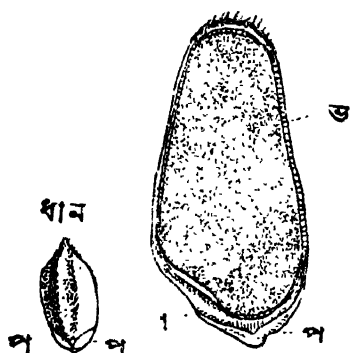
২ নং চিত্র। প=পক্ষ ; অ=অঙ্কুর ; ভ=ভ্রূণান্ন

ভ্রূণান্নই একদল-বীজ উদ্ভিদের অঙ্কুরাবস্থার খাদ্য। ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিবার সময়ে উল্লিখিত অঙ্কুরটি ভ্রূণান্ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তুষের সঙ্গে চলিয়া যায়। এই নিমিত্তই ধানের পরিবর্তে চাউল বপন করিলে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

উদ্ভিদ্-শিশু যতদিন মৃত্তিকা হইতে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত না হয়, ততদিন বীজমাতা আপন দেহ হইতে উহাদের জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য যোগান। ঈষৎ বড় হইলে আর বীজ-দেহস্থ খাদ্যে উহাদের কুলাইয়া উঠে না, তখন আপনাদের জীবনধারণের উপায় আপনাদেরই করিয়া লইতে হয়।

উপযুক্ত মাত্রায় জল, বায়ু এবং উত্তাপের সাহায্য ব্যতীত বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। ঐ গুলির মধ্যে কোন একটির অভাব বা অল্পতা, অঙ্কুর বাহির হওয়ার পক্ষে অনিষ্টজনক।

প্রাণিমাত্রেরই বাঁচিয়া থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত

পরিমাণ খাদ্যের অভাবে যেমন মানুষ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে মরিয়া যায়, উদ্ভিদেরও ঠিক সেই অবস্থা। মানবশিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে না, বৃক্ষও অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে অসমর্থ থাকে। মানব-শিশু ঐ সময়ে মাতৃস্তন্যে পুষ্ট হয়, বৃক্ষশিশুও তাহার বীজমাতার দেহস্থিত সঞ্চিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠে।

গাছের সমস্ত অঙ্গটিকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। মাটির উপরে আমরা যে ভাগ দেখিতে পাই, সে ভাগের নাম সপত্র কাণ্ড (Shoot) ; মাটির নীচের ভাগকে মূল (Root) বলে। আলোর বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাটির নীচে মূলের কার্য্য চলিতে থাকে। কাণ্ডের কার্য্য মাটির উপরে অর্থাৎ আলোর দিকে হইয়া থাকে।

মূল, কাণ্ড, পত্র, ফুল এবং ফল এই পাঁচটি অংশ প্রায় সকল উদ্ভিদেই বর্ত্তমান আছে। এই পাঁচটি অংশ ক্রমে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হইবে।

মূল

মূল প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—(১) স্থানিক মূল (True root), (২) আস্থানিক মূল (Adventitious root), (৩) শোষণ-মূল (Haustoria), (৪) পরবৃক্ষী মূল (Epiphytic root), (৫) জলীয় মূল (Aquatic root)।

(১) স্থানিক মূল (True root)

অঙ্কুরস্থ ভাবী মূল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্তিকার মধ্যে যে মূলের গঠন করে তাহাকে স্থানিক মূল বলে। আম, জাম ইত্যাদি গাছের মূল এই শ্রেণীর।

ভাবী মূল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সাপের লেজের মত সূক্ষ্ম আকারে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, উহাই গাছের প্রধান মূল (Primary root)।

প্রধান মূলটি কার্য্যকরী অবস্থায় থাকিলে, অর্থাৎ উহা হইতে শাখামূল ও প্রশাখামূল (Secondary root) বাহির হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অবস্থায় আসিলে, তাহাকে কাণ্ডমূল (Tap root) বলে। সাধারণতঃ দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদেই কাণ্ডমূল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষের কাণ্ডের (Shoot) সহিত এই মূলের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে কাণ্ডমূল বলে। কাণ্ডমূলগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) কৌণিক (Conical) মূল (৩ ক নং চিত্র)--যে মূলের গোড়ার দিক্ স্থূল এবং মাথার দিক্ হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। যেমন—গাজর, পালম ইত্যাদি।

(খ) মোচাকার (Fusiform) মূল (৩ খ নং চিত্র)—যে মূলের মধ্যভাগ স্থূল এবং গোড়া ও মাথার দিক্ কৌণিক মূলের ন্যায় ক্রমশঃ সরু। যেমন—মূলা।

(গ বর্ত্তুলাকার (Napiform) মূল (৩ গ নং চিত্র)—যে মূল স্ফীত এবং গোলাকার। যেমন—শালগম, বীট।
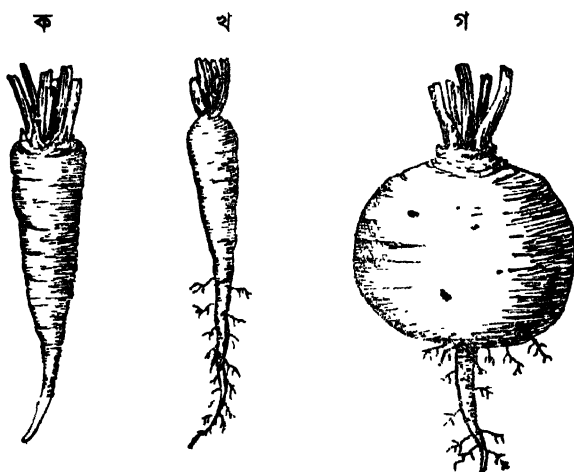
৩ নং চিত্র

ক=কৌণিক মূল; খ=মোচাকার মূল; গ=বর্ত্তুলাকার মূল

বিশেষ কোন কারণবশতঃ প্রধান মূলের বৃদ্ধি স্থগিত থাকিলে ঐ স্থান হইতে গুচ্ছাকারে যে মূল বাহির হয় তাহাকে গুচ্ছ-মূল (Fibrous root) বলে (৫ নং চিত্র); যেমন ধানের মূল। গঠনভেদে বিভিন্ন প্রকার গুচ্ছ-মূল দেখিতে পাওয়া যায় :—

৪ নং, চিত্র গুচ্ছমূল

(ক) কন্দাল (Tubercular)—যে • গুচ্ছ-মূলের এক অথবা ততোধিক শাখা স্ফীত হইয়া কন্দের আকার ধারণ করে (৫ নং চিত্র); যেমন—শকরকন্দ আলু।
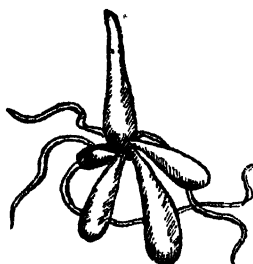
৫ নং, চিত্র কন্দাল মূল

(খ) জটিল কন্দাল (Fasciculate)—যে গুচ্ছ-মূলের বহুসংখ্যক শাখা জটার ন্যায় স্ফীত হইয়া থাকে (৬ নং চিত্র) ; যেমন—শতমূলী।
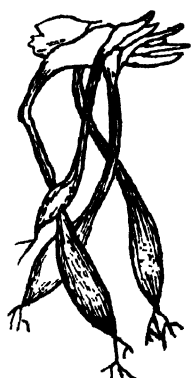
৬ নং, চিত্র জটিল কন্দাল মূল

(গ) স্ফীতাগ্র (Nodulose)—যে গুচ্ছ-মূলের শাখার অগ্রভাগ স্ফীত হইয়া গুটিকার আকার ধারণ করে (৭ নং চিত্র)।
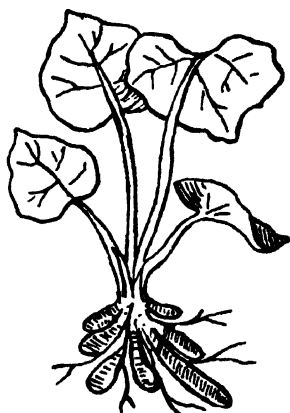
৭ নং, চিত্র স্ফীতাগ্র মূল

(ঘ) মালিকাকার (Moniliform)—যে গুচ্ছ-মূলের শাখাগুলির গায়ে গ্রন্থির আকারে বহুসংখ্যক গুটিকা দেখিতে পাওয়া যায় (৮ নং চিত্র)।
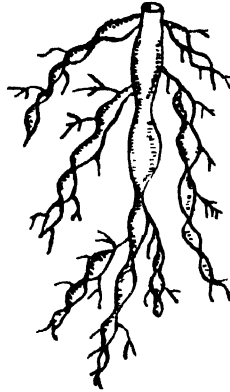
৮ নং, চিত্র মালিকাকার মূল

(ঙ) বলয়ী (Annulated)—যে গুচ্ছ-মূলের শাখাগুলিতে বলয়াকৃতি বহু গ্রন্থি দৃষ্ট হয় (৯ নং চিত্র); যথা—ইপিকাকুয়ানা (Ipecacuanha)।
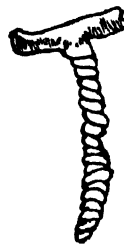
৯ নং, চিত্র বলয়ী মূল

(২) আস্থানিক মূল (Adventitious root)

যে মূল জ্রূণমূল হইতে উৎপন্ন না হইয়া উদ্ভিদের অন্য স্থান হইতে নির্গত হয় তাহাকে আস্থানিক মূল বলে। আস্থানিক মূল উদ্ভিদের কাণ্ড অথবা পত্র হইতেও নির্গত হইতে পারে। বটের ঝুরি (১০ নং চিত্র) ইহার উত্তম উদাহরণ।

১০ নং, চিত্র আস্থানিক মূল—বটের ঝুরি

কোন কোন লতা অন্য কোন পদার্থ কিংবা বৃক্ষের গায়ে আরোহণ করিবার জন্য নিজের কাণ্ড হইতে আস্থানিক মূল বাহির করিয়া ঐ আশ্রয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐ সকল আস্থানিক মূলকে আশ্রয়ী (Climbing) মূল বলে; যেমন 'আইভি' ও গজ-পিপ্পলী।

কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডস্থ কোন স্থান হইতে আস্থানিক মূল বাহির হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে এবং ঐ অবস্থায় বায়ুমণ্ডল হইতে

১১ চিত্র নং

'অর্কিড'গাছের বায়বীয় মূল

উদ্ভিদের আহার্য্য গ্রহণ করে। ঐ সকল আস্থানিক মূলকে বায়বীয় (Aerial) মূল বলে। 'অর্কিড' (Orchid) গাছের মূলই (১১ নং চিত্র) ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। আর কোন কোন আস্থানিক মূল উদ্ভিদের কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া শূন্যে ঝুলিতে থাকে এবং কালক্রমে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বটের ঝুরি, এবং কেয়াগাছের কাণ্ড

(১২ নং চিত্র) হইতে বহির্গত মূলও ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে বায়বীয় শ্রেণীভুক্ত থাকে।

১২ নং চিত্র

কেয়া (কেতকী) গাছের আস্থানিক মূল

সুন্দরবন অঞ্চলের জলা ভূমিতে জাত সুন্দরী এবং গেঁটে প্রভৃতি গাছের কতকগুলি বিশেষ মূল নীচের দিকে বিস্তৃত না হইয়া মাটির উপরে তাহাদের মাথা তুলিয়া দেয়। ঐ মূলগুলির গাত্র স্বভাবতঃই কর্কশ এবং উহাতে বায়ুপ্রবেশের জন্য ছিদ্র আছে। ঐ মূলগুলিকে প্রশ্বাসক মূল (Breathing root) বলে।

(৩) শোষণ-মূল (Haustoria)

আলোক-লতা প্রভৃতি পরজীবী (Parasites) উদ্ভিদের বায়বীয় শিকড় হইতে অন্য একপ্রকার শিকড় বাহির হইয়া আশ্রয়-বৃক্ষের কাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে ; এই প্রকার মূলকে শোষণ-মূল (Haustoria) বলে।

(৪) পরবৃক্ষীমূল (Epiphytic root)

কতকগুলি গাছ অন্য কোন বৃক্ষের উপরে জন্মে, ঐ সকল উদ্ভিদ্‌কে পরগাছা বলে। ঐ সকল গাছের মূল ভূমি স্পর্শ করে না। বায়ুমণ্ডল হইতেই উহারা মূলের সাহায্যে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে। ঐ সকল গাছের মূলকে পরবৃক্ষী মূল (Epiphytic root) বলে। রাস্না গাছের মূল এই শ্রেণীভুক্ত।

(৫) জলীয় মূল (Aquatic root)

কতকগুলি জলজ ভাসমান উদ্ভিদের শিকড় জলের মধ্যে অসংলগ্ন অবস্থায় ঝুলিতে থাকে, মাটির সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই। ঐ সকল শিকড়ের কোন প্রকার শাখাপ্রশাখা বাহির হয় না এবং ঐ গুলির গায়ে রোমমূলও (Root hair) দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল মূলকে জলীয় মূল (Aquatic root) বলে।

উদ্ভিদের প্রধান মূল সোজা মাটির নীচে চলিয়া যায়। তাহার চারিপার্শ্ব হইতে শাখামূল ও প্রশাখামূলগুলি বাহির হইয়া ভূপৃষ্ঠের সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে মাটির নীচে বিস্তৃত হয়। প্রধান মূল যতই নীচের দিকে যাইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে শাখামূলের সৃষ্টি হয়। প্রধান মূল ও শাখামূলগুলির এইরূপ বিপরীত সমাবেশ দ্বারা বৃক্ষের কাণ্ড মাটির উপরে দাঁড়াইয়া ঝড় ও ঝঞ্ঝার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে

এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। মূলা, গাজর, বীট, শতমূলী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের মূল স্বভাবতঃই স্থূল এবং রসাল ; ঐসকল উদ্ভিদের খাদ্য তাহাদের মূলমধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়িত হয়।

মূলের কার্য্যকারিতা

এখন দেখা যাইতেছে বৃক্ষের মূল একাধারে মৃত্তিকা হইতে তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহাকে মাটির উপরে দাঁড় করাইয়া রাখে এবং তাহার খাদ্যভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া আরোহী জাতীয় লতার কাণ্ড হইতে উদ্গত মূল উহাদের আশ্রয়-বস্তুতে আরোহণ ও অবলম্বন-বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে।

শিকড়ের গায়ে কতকগুলি রোম আছে, ঐগুলিকে রোমমূল (Root hair) বলে (১৩ নং চিত্র)। আমাদের সম্মুখে কোন লোভনীয় জিনিষ রাখিলে আমাদের জিহ্বায় যেমন লালার সঞ্চার হয়, ঐ রোম মূলগুলি হইতেও মৃত্তিকানিহিত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলির লোভে ঐরূপ অম্লরস নির্গত হইয়া, ঐ আহার্য্য পদার্থগুলিকে দ্রবণীয় করিয়া উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য করিয়া দেয়। ফলতঃ এই রোম মূলগুলিই মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদের আহার্য্যগ্রহণের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। মূলের গায়ে ঐ রোমগুলি সহজে লক্ষ্য করা যায়।

১৩ নং চিত্র

চারাগাছের রোমমূল

শিকড়গুলির মাথার সরু দিক্‌টা অত্যন্ত কোমল ; ঐ কোমল অংশটি রক্ষা করিবার জন্য টুপীর মত একটি পর্দ্দা দ্বারা উহা ঢাকা আছে। ঐ আবরণটিকে মূলত্রাণ (Root Cap) বলে (১৪ নং চিত্র)। শিকড় বৃদ্ধি পাইয়া মাটির ভিতরে যতই অগ্রসর হয় মূলত্রাণগুলির অগ্রভাগও ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু এই ক্ষতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হইতে নূতন কোষ (Cells) আসিয়া মূলত্রাণের অগ্রভাগের ব্যয়িত কোষগুলির স্থান অধিকার করে। এইরূপে মূলের কোমল অংশ কখনও অরক্ষিত ভাবে থাকে না। এই মূলত্রাণের অব্যবহিত নিম্নেই রোম-মূলগুলি উত্থিত হইয়া থাকে।

১৪ নং চিত্র
ক = মূলত্রাণ।

মূলের অভ্যন্তর

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বহু কোষের (Cell) সমষ্টি লইয়া উদ্ভিদ্-দেহ গঠিত। একটি উদ্ভিদের মূলকে আড়াআড়ি ভাবে ছেদন (Cross section) করিয়া অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যেও ঐরূপ বহুসংখ্যক কোষের (Cell) অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ঐ মূলটি দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদের মূল হইলে দেখা যাইবে—উহার চক্রাকারে সজ্জিত প্রথম অর্থাৎ বহিঃস্থ স্তরে যে সকল কোষ সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এক একটি কোষ শুণ্ডাকারে বাহিরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ঐ শুণ্ডাকৃতি অংশের নামই রোম-মূল (Root-hair) এবং রোমমূল আছে বলিয়া ঐ স্তরটির নাম রোমাল (Piliferous) স্তর। ঐ স্তরের পরে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের কতকগুলি কোষস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কোষগুলির নাম বাল্কল কোষ (Cortical tissue)

বাল্কল কোষসমূহের অব্যবহিত পরেই চক্রাকারে বেষ্টিত আর একটি স্তর আছে, তাহার নাম অন্তস্ত্বক্ (Endodermis)। অন্তস্ত্বকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার কোষযুক্ত আর একটি স্তরের নাম পরিচক্র (Pericycle)। তৎপরে দারুক (Xylem) এবং বল্কক (Phloem) নামক কতকগুলি নালিকাগুচ্ছ (Vasculer Bundles) একটির পর একটি পাশাপাশি স্থাপিত হইয়া মূলের কেন্দ্রস্থিত মজ্জাকোষ (Pith) গুলিকে বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ দারুক (Xylem) এবং বল্কক (Phloem) নামক নালিকাগুলির মধ্যে উৎপাদক (Cambium) নামে আর একপ্রকার কোষ আছে। ঐ কোষগুলির দ্বারাই মূল প্রস্থের দিকে বৃদ্ধি পাইয়া স্থূল হইয়া থাকে।

একদল-বীজজাত উদ্ভিদের মূলের আভ্যন্তরিক গঠনও প্রায় দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদের মূলের অনুরূপ। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এইটুকু লক্ষ্য করা যায় যে, ইহার অভ্যন্তরস্থ নালিকাগুচ্ছগুলির সংখ্যা দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদের মূলস্থিত নালিকাগুচ্ছ অপেক্ষা অধিক। আর উহাতে কোন প্রকার উৎপাদক কোষের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং একদল-বীজজাত উদ্ভিদের মূল প্রস্থের দিকে বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

কাণ্ড

ভাবী কাণ্ড (Plumule) আলো ও হাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে কাণ্ডে পরিণত হয়। কাণ্ডের গাত্রে পত্র থাকে, কিন্তু মূলের গাত্রে তাহা থাকে না। শুধু পত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কাণ্ড ও মূলকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে পারা যায়। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির নীচে বর্দ্ধিত হয়, ঐ কাণ্ডের গায়েও পত্র থাকে; যেমন—আদা, হলুদ, গোলআলু। কিন্তু আলো হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন, ঐ সকল পত্র সাধারণ পত্রের ন্যায় সবুজ নহে। ঐগুলি মাছের আঁইসের ন্যায় কাণ্ডের গায়ে

আবদ্ধ থাকে। এই নিমিত্ত ঐগুলিকে শল্ক-পত্র (Scale leaves) বলে। কাণ্ডের গায়ে পত্রসংলগ্ন স্থানে চক্রাকার গ্রন্থি বা গাঁট (Node) থাকে। দুই গ্রন্থির মধ্যস্থানের নাম পর্ব্ব বা পাব (Internode)। বাঁশ বা আকের পাবগুলি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সচরাচর চারিদিকে আম, কাঁটাল, তাল, নারিকেল, বাঁশ ইত্যাদি যে সকল গাছ দেখিতে পাই ঐগুলির কাণ্ড, স্তম্ভ বা থামের ন্যায় গোলাকার। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ডের গঠন বিভিন্ন প্রকারেরও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—মুথার শীষ ত্রিকোণ; তুলসী গাছের কাণ্ড চতুষ্কোণ; পুঁই, লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ড কতকটা শিরাবিশিষ্ট; ফণী মনসার গাছ চেপ্টা। এইরূপ উদ্ভিদ্‌ভেদে কাণ্ডের অনেক বৈচিত্র্য আছে।

মুকুল

মুকুল বলিতে আমরা ফুলের মুকুলকেই বুঝিয়া থাকি আম ও লিচুর বোলকে আমরা আম ও লিচুর মুকুল বলি। কিন্তু গাছের মুকুল বলিতে গাছের ফুলের এবং শাখার উভয়েরই অস্ফুট অবস্থাকে বুঝায়। একটি চারা গাছের কাণ্ডের ঠিক অগ্রভাগটি পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ঐ স্থানের ক্ষুদ্র কাণ্ডাংশ কতকগুলি ছোট ছোট পাতার সহিত জমাট হইয়া আছে।

কাণ্ডের অগ্রভাগস্থিত ঐ অংশকেও মুকুল বলে। মুকুলের কাছে কাণ্ডের পর্ব্বগুলি খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট থাকে। কাণ্ড বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বগুলি লম্বা হয়, সুতরাং গ্রন্থিগুলিও পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পড়ে। কাণ্ডের অগ্রভাগ ভিন্ন, কাণ্ডের গাত্রস্থিত পত্রের গ্রন্থিসংলগ্ন কক্ষ হইতেও মুকুল বাহির হয়। ঐ মুকুলগুলিকে কক্ষমুকুল (Axillary Bud) বলে। কাণ্ডের অগ্রভাগস্থিত মুকুলের নাম অন্ত্যমুকুল (Terminal Bud)। অন্ত্যমুকুল হইতে আসল কাণ্ডটি লম্বা হইয়া উপরের দিকে

বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর কক্ষমুকুল হইতে গাছের শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়।

বৃক্ষকাণ্ডের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বৃক্ষগুলিকে সাধারণতঃ কঠিন-কাণ্ড ও কোমল-কাণ্ড, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কঠিন কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ্‌গুলিকে বৃক্ষ, গুল্ম, ঝোপ এবং ঝাড় এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

কঠিন ও বৃহৎ-কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ রীতিমত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ১৫ হাত অথবা তদপেক্ষা উচ্চ হইলে তাহা বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত হয়। ১৫ হাত হইতে ১০ হাতের মধ্যে হইলে তাহাকে ক্ষুপ বলে। আম, কাঁটাল, শাল, সেগুন ইত্যাদি উদ্ভিদ্ নিজ নিজ উচ্চতা অনুসারে ঐ দুই শ্রেণীভুক্ত। যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড নিতান্ত অনুচ্চ অথবা কাণ্ড একেবারে নাই, অথচ অল্পসংখ্যক শাখা কাণ্ড হইতে অথবা মাটি হইতে বাহির হইয়া প্রশাখা বিস্তার করে, তাহাকে গুল্ম বলা যায়। গুল্মের উচ্চতা ১০ হাতের নিম্নে। জবা, টগর ইত্যাদি ফুলের গাছ এই শ্রেণীভুক্ত।

মাটি হইতে বহুসংখ্যক শাখা বিস্তৃতভাবে একস্থানে জন্মিলে তাহাকে ঝোপ বলে। ঝোপের উচ্চতা ৩।৪ হাতের অধিক হয় না। দুই হাতের অনধিক উচ্চ গুল্মের নাম ঝাড়। ঝাড়জাতীয় উদ্ভিদের কতক অংশ বর্ষার পরে মরিয়া যায়।

কোমল-কাণ্ড উদ্ভিদ্‌গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বর্ষজীবী (Annual) এবং দ্বিবর্ষজীবী (Biennial)। যে সকল উদ্ভিদ্ ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, সে সকল উদ্ভিদ্ ওষধি নামে খ্যাত। ধান, গম, মটর, ছোলা, কলা, আদা, হলুদ ইত্যাদি ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মকাল হইতে একবৎসরের মধ্যেই ফল প্রদান করিয়া মরিয়া যায়; এইগুলিকে বর্ষজীবী ওষধি বলে।

কতকগুলি উদ্ভিদ্ প্রথম বর্ষে বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাটির উপরে পত্র বিস্তার করে এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ মূলটিকে আহার্য্যসামগ্রীতে

পূর্ণ করিয়া ঐ পত্রগুলি মরিয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষে ঐ সঞ্চিত আহার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া মাটির উপরে একটি কাণ্ড উদ্গত হয় এবং ফল পাকিবার পরেই মরিয়া যায়; ঐ কাণ্ডটির নাম ভৌম-পুষ্পদণ্ড বা তেউর (Scape) এবং এই জাতীয় ওষধিকে দ্বিবর্ষজীবী (Biennial) ওষধি বলে। দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ্ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাজর, সালগম, বীট প্রভৃতি উদ্ভিদ্ শীতপ্রধান দেশে এই নিয়মের বিষয়ীভূত। কিন্তু এদেশে ঐগুলি সংবৎসরের মধ্যেই ফলবান্ হইয়া মরিয়া যায়।

যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড কোমল এবং সত্বর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মাটির উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হয় না, সে জাতীয় উদ্ভিদ্‌কে লতা বলে। প্রকৃতিভেদে লতাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) যে সকল লতা মাটির উপরে শায়িত অবস্থায় থাকিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সে গুলিকে শায়িত লতা (Creepers) বলা যায়; যথা—গোলআলু, রাঙ্গাআলু ইত্যাদি; এবং (২) যে সকল লতা অন্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধগামী হয় তাহাদিগকে আরোহক লতা (Climbers) বলে; যথা—লাউ, কুমড়া ইত্যাদি।

লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি কতকগুলি আরোহক লতার গাত্র হইতে আঁকাড় (Tendrils) বাহির হইয়া আশ্রয়-বস্তুকে জড়াইয়া ধরে। আবার কতকগুলি আরোহক লতার কাণ্ডস্থিত গ্রন্থি হইতে আস্থানিক (Adventitious) শিকড় বাহির হইয়া ঐ শিকড়ের সাহায্যে আশ্রয়-বস্তুকে ধরিয়া রাখে। পান, চই, গোলমরিচ প্রভৃতি এই জাতীয় লতা। এইরূপে কোন লতা কণ্টকের সাহায্যে, কোন লতা পত্রের সাহায্যে আশ্রয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হয়।

যে লতা ডান দিকে মাথা রাখিয়া আশ্রয়-বস্তুকে বেষ্টন করে তাহার নাম দক্ষিণাবর্ত্ত (Dextrorse) লতা; চুবড়ী বা খাম আলুর লতা এই জাতীয়। আর যে লতা বাম দিকে মাথা রাখিয়া আশ্রয়-বস্তুকে বেষ্টন

করে তাহার নাম বামাবর্ত্ত (Sinistrorse) লতা; সীম, কলাই, কল্মী লতা এই জাতীয়।

কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকে এবং তথা হইতে মৃত্তিকার উপরে শাখা বিস্তার করিয়া পরিপুষ্ট হয়; ঐগুলিকে ভৌমকন্দ (Underground stem) বলে। এই শ্রেণীর কাণ্ডগুলিকে স্বভাবতঃই মূল বলিয়া ভুল হয়, কিন্তু বাস্তবিক ঐগুলি মূল নহে। মূলের গাত্র হইতে কখনও পত্র বা শাখার উদ্ভব হয় না; এই ভৌমকন্দের গায়ে শল্কাকৃতি পত্র আছে এবং ঐগুলি মৃত্তিকার উপরে শাখা বিস্তার করে। আদা, হলুদ, কচু, পিঁয়াজ, রসুন, গোলআলু প্রভৃতি এই শ্রেণীর কন্দ। ভৌমকন্দগুলিকে নিম্নলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) স্ফীতকন্দ (Tuber), যথা—আলু।

(২) শল্ককন্দ (Bulb), যথা—পিঁয়াজ, রসুন।

(৩) নিরাটকন্দ (Rhizome), যথা—কচু।

(৪) বজ্রকন্দ (Corm), যথা—ওল।

কাণ্ডের কার্য্যকারিতা

কাণ্ডবিষয়ে আলোচনার ফলে দেখিতে পাওয়া যায়—(১) কাণ্ড উদ্ভিদের সবুজ পত্র, ফুল, এবং ফল ধারণ করিয়া রাখে; এবং (২) কাণ্ড উদ্ভিদের দ্রব আহার্য্যপদার্থগুলি প্রবাহিত হওয়ার প্রণালীরূপে ব্যবহৃত হয়।

কাণ্ডের অভ্যন্তর

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদের অভ্যন্তরভাগ ছেদন করিয়া পরীক্ষা করিলে উহাতে বহু ছোট ছোট কোষ (Cells) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ছোট ছোট কোষগুলি বাক্সের ন্যায় চারিদিকেই আবরণ দ্বারা আবদ্ধ। ঐ আবরণের নাম কোষ-প্রাচীর (Cell Wall)।

ঐ কোষগুলি একপ্রকার তরল পিচ্ছিল পদার্থে পূর্ণ থাকে। ঐ পদার্থটির নাম প্রাণ-পদার্থ (Protoplasm); এই প্রাণ-পদার্থটিকেই উদ্ভিদের প্রাণ বলা যাইতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের কার্ব্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণ দ্বারা কোষ-প্রাচীরগুলি গঠিত হয় এবং উহার নাম সেলিউলোস (Cellulose)।

কোন উদ্ভিদের কাণ্ডস্থ উল্লিখিত কোষগুলির মধ্যে প্রাণ-পদার্থের সহিত শ্বেতসার (Starch) নামক আর একটি ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়দা, চাউলের গুড়া, শঠীর পালো ইত্যাদি শ্বেতসার-জাতীয়।

এই কোষগুলির একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, পুষ্ট হইলে উহারা ভাঙ্গিয়া দুইটি পৃথক্ পৃথক্ কোষে পরিণত হয় এবং ক্রমে ঐ দুই কোষের মধ্যে একটি কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়। আবার এই দুইটি কোষ ভাঙ্গিয়া চারিটি, এবং চারিটি ভাঙ্গিয়া আটটি, এই প্রণালীতে কোষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহাকে কোষবিভাগ (Cell division) বলে। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে উদ্ভিদের কলেবরও বর্দ্ধিত হয়। উল্লিখিত প্রাণ-পদার্থপূর্ণ কোষগুলি একটির উপরে আর একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে সজ্জিত হইয়া নলের আকার ধারণ করে, ঐগুলিকে কোষ-নালিকা (Vessels) বলে। কোষ-নালিকাগুলি পুরাতন হইলে উহাদের প্রাচীর শক্ত হইয়া কাষ্ঠে পরিণত হয়। তখন আর ঐগুলির মধ্যে প্রাণ-পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। বৃক্ষের যে অংশকে আমরা কাষ্ঠ বলি তাহা ঐ লম্বা লম্বা কোষ-নালিকার সমষ্টিমাত্র। এইরূপে কোষ-নালিকাগুলির সংস্থানকে নালিকাগুচ্ছ বলে।

দ্বিদল-বীজজাত উদ্ভিদের কাণ্ডকে আড়াআড়ি ভাবে ছেদন করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বহুপ্রকার কোষের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। উহার মধ্যে প্রথম চক্রাকারে সজ্জিত কোষের স্তরের নাম অধিত্বক্ (Epidermis); এই স্তরের কোষের ভিতর প্রাণ-পদার্থ নাই।

তার পর একজাতীয় কতকগুলি কোষের স্তর লইয়া বাল্কল স্তর গঠিত। উহার অব্যবহিত পরেই চক্রাকারে আর একটি স্তর আছে, তাহার নাম অন্তস্ত্বক্। এই স্তরের কোষের ভিতর শ্বেতসার দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে ক্ষুদ্রাকার কোষের স্তরটি পরিচক্র। ইহার পরে কোষ-নালিকাগুলি চক্রাকারে সজ্জিত অবস্থায় থাকে। প্রতিবৎসর যে নূতন কোষ-নালিকার সৃষ্টি হয় তাহা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একটির পর একটি নালিকাচক্র গঠিত হয়। একটি দ্বিদল-বীজজাত বৃক্ষের গোড়া করাত দিয়া আড়াআড়ি ভাবে ছেদন করিলে ঐ চক্রাকারে সজ্জিত নালিকাগুচ্ছগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ চক্রের সংখ্যা গণনা করিয়া ঐ বৃক্ষের বয়স নিরূপণ করা যায়। এজন্য ঐগুলিকে **বর্ষচক্র** (Annual ring) বলে।

একদল-বীজ উদ্ভিদে কাণ্ডের আভ্যন্তরিক গঠনও দ্বিদল-বীজ উদ্ভিদের অনুরূপ কিন্তু উহার কোষ-নালিকাগুলি ঐরূপে চক্রাকারে সজ্জিত থাকে না। ঐগুলি এলোমেলো ভাবে থাকিয়াই কাণ্ডের কলেবর গঠন করে। একদল-বীজবিশিষ্ট একটি তাল বা নারিকেল গাছকে এইরূপে ছেদন করিয়া পরীক্ষা করিলেই উহার কোষ-নালিকার বিশৃঙ্খল অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যে প্রাচীন কোষ-নালিকাগুলির প্রাচীর কঠিন হইয়া কাষ্ঠে পরিণত হয়, সেগুলির আর স্বাভাবিক ধর্ম্মানুযায়ী সংখ্যায় বর্দ্ধিত হওয়ার শক্তি থাকে না। তাহাদিগকে মৃতকোষ (Dead cells) কহে।

দ্বিদল-বীজ বৃক্ষের কোষ-নালিকাগুচ্ছের ভিতরে একপ্রকার কোষ আছে, তাহাকে উৎপাদক কোষ (Cambium) কহে। ইহাই প্রতি-বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া নূতন কোষ-নালিকা সৃষ্টি করে এবং এইজন্যই পূর্ব্বোল্লিখিত চক্রের আবির্ভাব হয়। গাছের এইরূপ বৃদ্ধিতে বাহিরের দিকের কোষগুলিতে অত্যন্ত চাপ পড়িয়া ঐগুলি ছিঁড়িয়া যায় এবং তাহাদের রক্ষার জন্য অন্য আর একপ্রকার কোষের সৃষ্টি হয়, উহাকে 'কর্ক' উৎপাদক স্তর (Cork Cambium) কহে। ঐ কোষগুলিই

গাছের ছালের ভিতর কর্ক-নামক জিনিষ সৃষ্টি করে। কিন্তু একদল-বীজ বৃক্ষের কলেবর ঐরূপ প্রস্থে বৃদ্ধি পায় না; এবং তাহার কোষ-নালিকাগুলিরও ঐরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল চারিদিকের কতকগুলি কোষ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাও অনেক দিন স্থায়ী হয় না।

পত্র

উদ্ভিদের কাণ্ডের গ্রন্থি হইতে পত্রের উদ্ভব হয়। আবার পত্রের কক্ষ হইতে শাখা বা পুষ্পের উদ্ভব হয়। একটি পত্রকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) পত্রমূল (Leaf-base), (২) পত্রবৃন্ত (Petiole), (৩) পত্রফলক (Lamina)।

কাণ্ডস্থিত যে চেপ্টা অপ্রশস্ত অংশটির সঙ্গে পত্রের বৃন্ত সংলগ্ন থাকে তাহাকে পত্রমূল বলে। পত্রমূল ও পত্রফলকের মধ্যবর্ত্তী অংশটির নাম বৃন্ত বা বোঁটা। উদ্ভিদ্‌ভেদে পত্রবৃন্ত ছোট বড় হইয়া থাকে। এমন কি কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদের পত্রে বৃন্ত মোটেই দেখা যায় না। বৃন্তের উপরের চেপ্টা ফলকাকার অংশটির নাম পত্রফলক। পত্রফলক ঐ পত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। উদ্ভিদ্‌ভেদে পত্রের ফলক চেপ্টা না হইয়া গোলাকার এবং অন্যান্য আকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে।

আমরা চারিদিকে যত রকম গাছ দেখিতে পাই তাহাদের পাতাও তত রকমের। সুতরাং আকৃতিভেদে পাতার শ্রেণীবিভাগ করা অসম্ভব ব্যাপার। নিম্নে আমাদের পরিচিত কতকগুলি গাছের পত্র-ফলকের বাহ্য আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল (১৫নং চিত্র) :—

(১) গোলাকারপত্র (Orbicular or Round)

যে পত্রফলক গোলাকার অথবা প্রায় গোলাকার তাহাকে গোলাকার পত্র বলে; যথা—জলপদ্ম।

(২) দীর্ঘ পত্র (Linear)

যে পত্রফলক দীর্ঘ, সরু, চেপ্টা এবং দুই পার্শ্ব সমান্তরাল তাহাকে দীর্ঘপত্র বলে ; যথা—ধান, মুথা, ইত্যাদি।

(৩) ভল্লাকার পত্র (Lanceolate)

যে পত্রফলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় তিনগুণ এবং নীচের দিক্ হইতে উপরের দিক্ চওড়া, অর্থাৎ ভল্লনামক অস্ত্রের ফলার সদৃশ, তাহাকে ভল্লাকার পত্র বলে ; যথা—বাঁশপাতা।

(৪) বাদামী পত্র (Elliptical)

যে পত্রফলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অর্দ্ধেক হইতে কিঞ্চিৎ অল্প এবং মাথা ও গোড়ার দিকের প্রস্থ ক্রমে সমভাবে কমিয়া যাইয়া এক বিন্দুতে মিলিত হয় তাহাকে বাদামী আকার পত্র বলে ; গোলাপ, জাম ও পাতিলেবুর পাতা এই জাতীয়।

(৫) আয়তাকার পত্র (Oblong)

যে পত্রফলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণের অধিক, দুই পার্শ্ব সমান্তরাল এবং মাথা ও গোড়ার দিক্ প্রায় গোলাকার তাহাকে আয়তাকার পত্র বলে ; কলা ও বকফুলের পত্র এই শ্রেণীভুক্ত।

(৬) ডিম্বাকার পত্র (Ovate)

যে পত্রফলকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা চওড়া, নীচের দিক্ অর্দ্ধ-বৃত্তাংশের ন্যায়, উপরের দিক্ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ঠিক ডিম্বের আকৃতি, তাহাকে ডিম্বাকার পত্র বলে ; যথা—বটের পাতা।

(৭) বিপরীত ডিম্বাকার পত্র (Obovate)

উল্লিখিত ডিম্বাকার পত্রের বিপরীত সংস্থান, অর্থাৎ উপরের দিক্ অর্দ্ধবৃত্তাকার এবং নীচের দিক্ সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে বিপরীত ডিম্বাকার পত্র বলে; দেশী বাদামের পাতা এই শ্রেণীভুক্ত।

(৮) নৌ-দণ্ডাকার পত্র (Spathulate)

যে দীর্ঘাকৃতি পত্রফলকের মাথার দিক্ গোলাকার এবং গোড়ার দিক্ ক্রমে লম্বভাবে সূক্ষ্ম, অর্থাৎ নৌকার দাঁড়ের আকৃতিবিশিষ্ট তাহাকে নৌ-দণ্ডাকার পত্র বলে; যথা—পালমপাতা।

(৯) বর্ব্বটাকার পত্র (Reniform)

যে পত্রফলকের বোঁটার দিক্ পানের ন্যায় খাতবিশিষ্ট এবং মাথার দিক্ অর্দ্ধবৃত্তাকার তাহাকে বর্ব্বটাকার পত্র বলে; যথা—থুলকুড়ি বা থানকুনীর পাতা।

(১০) শরমুখাকৃতি পত্র (Sagittate)

যে পত্রফলকের গোড়ার দিক্ গভীরখাতযুক্ত এবং মাথার দিক্ পানের মতন তাহাকে শরমুখাকৃতি পত্র বলে; কচুপাতা এই শ্রেণীভুক্ত।

(১১) ত্রিশূলাকার পত্র (Hastate)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং গোড়ার দিকের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি সূক্ষ্মাগ্র পত্রাংশ বাহির হইয়া ত্রিশূলের আকার ধারণ করে, তাহাকে ত্রিশূলাকার পত্র বলে; কলমীপাতা এই শ্রেণীভুক্ত।

(১২) হৃৎপিণ্ডাকার পত্র (Cordate)

যে পত্রফলকের মাথার দিক্ ক্রমে সূক্ষ্ম, গোড়ার দিক্ প্রশস্ত এবং অর্দ্ধবৃত্তাকার কিন্তু বোঁটার নিকট গভীরভাবে খাতযুক্ত অর্থাৎ তাসের হরতনের আকৃতি তাহাকে হৃৎপিণ্ডাকার পত্র বলে; যথা—পান।

(১৩) ত্রপুনাকার পত্র (Sabulate)

যে পত্রফলক সরু এবং যাহার মধ্যে কোন প্রকার পার্শ্ব বা প্রান্তের বিকাশ নাই, অথচ গোড়া হইতে ক্রমে সরু হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হয় তাহাকে ত্রপুনাকার পত্র বলে, যথা—ঝাউপাতা।
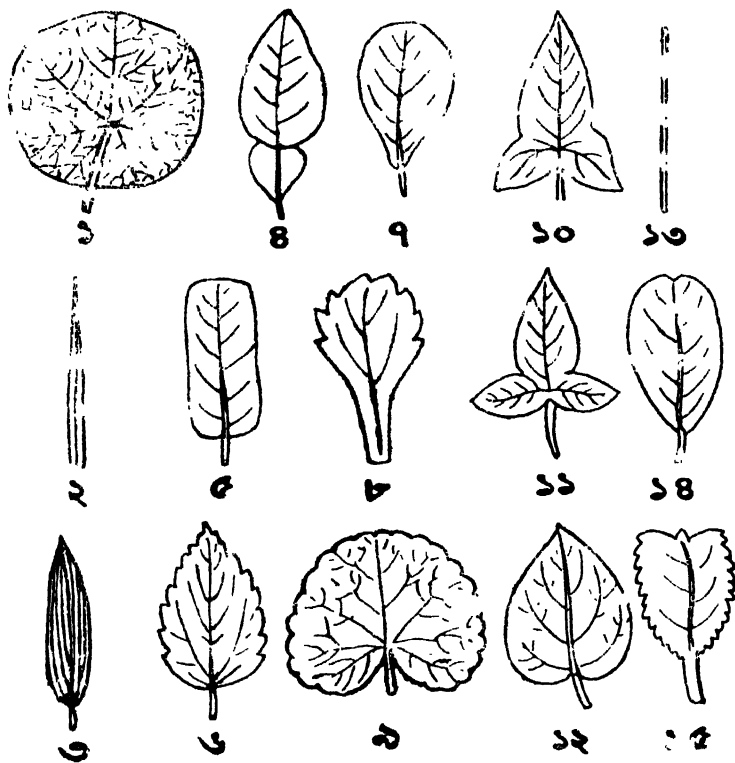
১৫ নং চিত্র, পত্রফলকের বিভিন্ন প্রকার বাহ্য আকৃতি

১=গোলাকার পত্র; ২=দীর্ঘ পত্র; ৩=ভল্লাকার পত্র; ৪=বাদামী পত্র; ৫=আয়তাকার পত্র; ৬=ডিম্বাকার পত্র; ৭=বিপরীত ডিম্বাকার পত্র; ৮=নৌ-দণ্ডাকার পত্র; ৯=বর্ব্বটাকার পত্র; ১০=শরমুখাকৃতি পত্র; ১১=ত্রিশূলাকার পত্র; ১২=হৃৎপিণ্ডাকার পত্র; ১৩=ত্রপুনাকার পত্র; ১৪=তীক্ষ্ণখাতাগ্র পত্র; ১৫=কীলকাকার পত্র।

(১৪) তীক্ষ্ণখাতাগ্র পত্র (Emarginate)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগ প্রশস্ত অথচ গভীরখাতযুক্ত থাকে এবং বোঁটার দিক্ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে তাহাকে তীক্ষ্ণখাতাগ্র পত্র বলে ; যথা—কাঞ্চনপাতা।

(১৫) কীলকাকার পত্র (Cuneate)

যে পত্রফলকের মধ্যশিরার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, অথচ উহার দুই পার্শ্ব প্রশস্ত হইয়া ক্রমে নীচের দিকে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, সেরূপ পত্রকে কীলকাকার পত্র বলে ; বড় পানা এই শ্রেণীভুক্ত।

প্রান্ত বা পার্শ্বের গঠনভেদে পত্রগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে (১৬ নং চিত্র) :—

(১) সমপ্রান্ত (Entire)

যে পত্রফলকের প্রান্ত সরল, অর্থাৎ কোন প্রকার দন্তিত বা কুঞ্চিত নহে তাহাকে সমপ্রান্ত পত্র বলে ; যথা—আম, বট ইত্যাদি।

(২) তরঙ্গায়িত (Repand)

যে পত্রফলকের প্রান্ত ঢেউখেলানো গোছের তাহাকে তরঙ্গায়িত পত্র বলে ; যথা—দেবদারুপত্র।

(৩) দন্তিত (Dentate)

যে পত্রফলকের প্রান্ত দন্তের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে কর্ত্তিত তাহাকে দন্তিত পত্র বলে ; যথা—রক্তকম্বলের পাতা।

(৪) স্থূলমুখদন্তিত (Crenate)

যে পত্রফলকের প্রান্তস্থ দন্তগুলির অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নহে তাহাকে স্থূলমুখদন্তিত পত্র বলে ; যথা—পাথরকুচির পাতা।

(৫) ঊর্দ্ধমুখদন্তিত (Serrate)

যে পত্রফলকের প্রান্তস্থ দন্তগুলি পাতার অগ্রভাগের দিকে মুখ করিয়া থাকে তাহাকে ঊর্দ্ধমুখদন্তিত পত্র বলে ; যথা—জবাপাতা ।
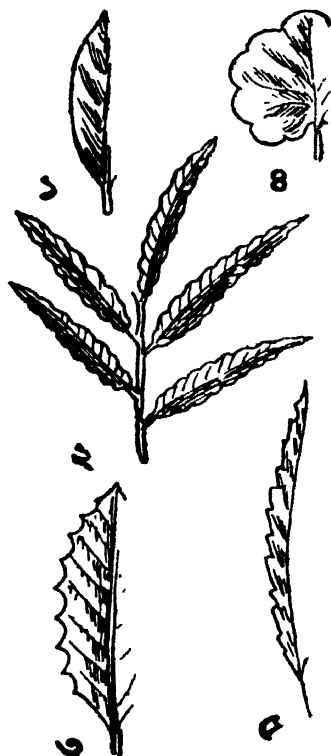
১৬ নং চিত্র, পত্রফলকের বিভিন্ন প্রকার প্রান্ত

১ = সমপ্রান্ত ; ২ = তরঙ্গায়িত ; ৩ = দন্তিত ; ৪ = স্থূলমুখদন্তিত
৫ = ঊর্দ্ধমুখদন্তিত ।

অগ্রভাগের গঠনভেদে পত্রফলককে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১৭ নং চিত্র) ঃ—

(১) স্থূলাগ্র (Obtuse)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগ স্থূল, অর্থাৎ প্রশস্ত, তাহাকে স্থূলাগ্র পত্র বলে ; যথা—বট, কাঁটাল ইত্যাদি।
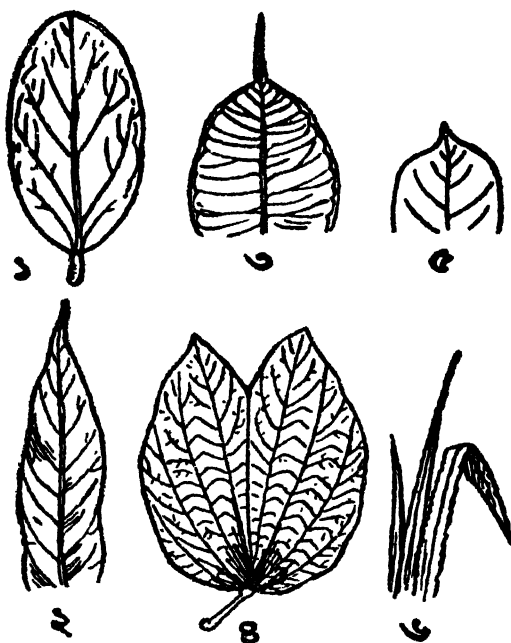
১৭ নং চিত্র, পত্রফলকের বিভিন্ন প্রকার অগ্রভাগ

১ = স্থূলাগ্র ; ২ = সূক্ষ্মাগ্র ; ৩ = স-শিখ ; ৪ = তীক্ষ্ণখাতাগ্র ;
৫ = স্থূলতীক্ষ্ণাগ্র ; ৬ = সূক্ষ্মতীক্ষ্ণাগ্র

(২) সূক্ষ্মাগ্র (Acute)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম তাহাকে সূক্ষ্মাগ্র পত্র বলে ; যথা—আম

(৩) স-শিখ (Acuminate)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগে সূত্রবৎ শিখা সংলগ্ন থাকে তাহাকে স-শিখ পত্রবলে ; যথা—অশ্বত্থপত্র।

(৪) তীক্ষ্ণখাতাগ্র (Emarginate)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণখাতযুক্ত তাহাকে তীক্ষ্ণখাতাগ্র পত্র বলে ; যথা—কাঞ্চন ফুলের পাতা।

(৫) স্থূলতীক্ষ্ণাগ্র (Mucronate)

যে পত্রফলকের অগ্রভাগ স্থূল অথচ ফলকের মধ্যশিরার অগ্রভাগে একটি কণ্টকের ন্যায় বর্দ্ধিত অংশ থাকে তাহাকে স্থূলতীক্ষ্ণাগ্র পত্র বলে ; যথা—কালকাসন্দ।

(৬) সূক্ষ্মতীক্ষ্ণাগ্র (Cuspidate)

সূক্ষ্মাগ্র পত্রফলকের মাথায় একটি কণ্টক যুক্ত থাকিলে তাহাকে সূক্ষ্মতীক্ষ্ণাগ্র পত্র বলে ; যথা—আনারসের পাতা।

পত্রের কার্য্যকারিতা

পাতা উদ্ভিদের প্রধানতম অঙ্গ। ইহা দ্বারা উদ্ভিদের নিশ্বাস, প্রশ্বাস, স্বেদ-নির্গম, বায়ুমণ্ডলস্থ আহার্য্য-পদার্থগুলি আত্মস্থকরণ এবং অল্পাধিক খাদ্যভাণ্ডারের কার্য্য হইয়া থাকে।

পত্রের অভ্যন্তর

পাতার বাহ্য গঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, এখন পাতার আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। একটি পত্রকে ছেদন করিয়া অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহার মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির কোষ স্তরে স্তরে সজ্জিত

আছে। একবারে বাহিরের স্তরটি পত্রের ত্বক্ (Epidermis) ; তাহার পরের কয়েকটি স্তর লম্বাটে ধরণের এবং ঘনসন্নিবিষ্ট, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী স্তরের কোষগুলি তত ঘনসন্নিবিষ্ট নয় এবং একটু গোলাকার। ত্বকের পরবর্ত্তী এই কোষগুলির নাম পত্রান্তকলা বা পত্রান্তকোষ (Mesophyll)। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে পত্রফলকের মধ্যে কাণ্ডের অভ্যন্তরের ন্যায় নানাপ্রকার কোষ লক্ষ্য হয়। এই কোষগুলির মধ্যে সবুজ রংএর একপ্রকার পদার্থ থাকে, ঐ পদার্থের নাম "পত্রহরিৎ" (Chlorophyll)। এই পত্রহরিৎ আছে বলিয়াই পাতার রং সবুজ হয়। সূর্য্যরশ্মি হইতে তেজ সঞ্চয় করিয়া উদ্ভিদের আহার-প্রস্তুতকার্য্যে সাহায্য করাই পত্রহরিতের বৈশিষ্ট্য।

পাতার উপর ও নীচের দিকের ছাল

কাঁচের ন্যায় কতকগুলি স্বচ্ছ কোষ দ্বারা পাতার ছালের সৃষ্টি হয়। এই কোষগুলির প্রাচীর পুরু, ইহার মধ্যে পত্রহরিতের অস্তিত্ব প্রায় থাকে না। প্রাণ-পদার্থ উহার ভিতরে অতি অল্পমাত্রায় থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের পাতার ছালের ঐ কোষগুলি নানা রংএর রসে (Cell sap) পূর্ণ থাকে। 'পাতাবাহার' জাতীয় গাছের পাতা ঐ কারণেই নানা রংএর দেখা যায়।

পাতার নীচের ছালে বহুসংখ্যক ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রগুলির নাম পত্রমুখ (Stomata)। ঐ পত্রমুখে কবাট-কোষ (Guard-cells) নামক একপ্রকার কোষ সংলগ্ন আছে, উদ্ভিদ্ আবশ্যকমত উহা খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। এই সকল ছিদ্র দিয়া উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডলস্থিত 'কার্ব্বন' ও 'অক্সিজেন' গ্রহণ করে। নীলপদ্ম, শালুক, রক্তকম্বল প্রভৃতি যে সকল জলজ উদ্ভিদের পত্র জলে ভাসিতে থাকে, তাহাদের পত্রমুখ পত্রের উপরিভাগে অবস্থিত। পাতার নীচের ছালের উপরে কতকগুলি বড় বড় খালি জায়গা আছে, উদ্ভিদের অভ্যন্তরস্থ সব দূষিত বাষ্প ঐ

জায়গাতে আসিয়া জমা হয় এবং পত্রমুখের কবাট-কোষ খোলা থাকিলে ঐগুলি বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের আবশ্যকের অতিরিক্ত জলও ঐ পথে বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

প্রাণিগণের শরীরে যেমন শিরা উপশিরা আছে, পাতার শরীরেও ঠিক উহার অনুরূপ শিরা উপশিরা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতা জলে থাকিয়া পচিলে উহার গায়ের কোমল অংশগুলি গলিয়া যায়, তখন শিরাগুলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ একদল-বীজজাত গাছের পাতার শিরাগুলি বৃন্তের দিক্ হইতে উঠিয়া কিছুদূর প্রায় সমান্তরালভাবে যায়, পরে সবগুলি যাইয়া পাতার অগ্রভাগে এক বিন্দুতে মিলিত হয়। এইগুলির নাম সমান্তরাল শিরা (Parallel Venation)। নানাজাতীয় ঘাস, বাঁশ, ধান ইত্যাদির শিরা এই শ্রেণীভুক্ত।

আম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি দ্বিপত্র-বীজজাত গাছের পাতার বোঁটা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা মোটা শিরা থাকে। ঐ শিরার দুইপাশ হইতে কতকগুলি শিরা আবার পাতার পাশ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। আবার কোন কোন গাছের পাতার বোঁটার দিক্ হইতে তিনটা, পাঁচটা অথবা ততোধিক মোটা শিরা বাহির হইয়া উপরের দিকে চলিয়া যায়, এবং ঐগুলি হইতে শাখা বিস্তার করিয়া পত্রফলকটিকে ছাইয়া ফেলে। এইরূপ শিরাবিস্তার দ্বারা পাতাটি জালের মত বুনট হইয়া যায়। এইগুলিকে জালাকৃতি (Reticulate Venation) শিরা বলা হয়।

পাতার একটি শিরা আড়াআড়ি ভাবে ছেদন করিয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে উহার ভিতরেও বহু কোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। উহাতে দারুক ও বল্কক এই দুই প্রকার নালিকাগুচ্ছ বিদ্যমান আছে। সূর্য্যের আলোর সাহায্যে পাতার ভিতর যে শর্করা (Sugar) ও অন্নসার (Proteid) প্রস্তুত হয়, তাহা ঐ বল্কক নামক নালিকাগুচ্ছ দ্বারা কাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উদ্ভিদের

পুষ্টিসাধন করে। দ্বিতীয় প্রকার নালিকাগুচ্ছ দ্বারা জল ও তাহার সহিত দ্রব অন্যান্য ধাতব পদার্থ মূল হইতে পাতায় প্রবেশ করে। এই গুলির কোষ-প্রাচীর সাধারণতঃ স্থূল এবং ইহারা শিরার ভিতরে বল্কক নালিকাগুচ্ছের উপরিভাগে অবস্থিত।

পাতার কোষস্তরের ভিতর যে পত্রহরিৎ নামক একটি পদার্থ আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পত্রহরিতের কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। বায়ুমণ্ডলস্থ অঙ্গারক বাষ্প পত্রমুখে পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অঙ্গার ও অক্সিজেন নামক একটি বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণে অঙ্গারক বাষ্পের (Carbon dioxide) সৃষ্টি হয়। অঙ্গারক বাষ্প পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পত্রহরিৎ ঐ বাষ্প হইতে অঙ্গারের অংশ শোষণ করিয়া রাখিয়া অক্সিজেন গ্যাসকে ঐ ছিদ্রপথে বাহির করিয়া দেয়। সূর্য্যের আলোর সহায়তা ভিন্ন পত্রহরিৎ একাকী এই কায্য সম্পন্ন করিতে পারে না, সেই জন্যই দিবাভাগে এই কার্য্যটি চলিতে থাকে। উদ্ভিদ্ মূল দ্বারা যে জল ও ধাতব পদার্থ শোষণ করিয়া লয়, তাহা শিরার মধ্য দিয়া পাতায় প্রবেশ করিয়া ঐ অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হয়। অবশেষে পত্রহরিৎ পুনরায় সূর্য্যালোকের সাহায্যে উল্লিখিত মিশ্রিত-পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদের নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করে। আমরা যেমন চাল, ডাল প্রভৃতি উপকরণগুলিকে অগ্নির উত্তাপের সাহায্য ভিন্ন খাদ্যে পরিণত করিতে পারি না, পত্রহরিৎও সেইরূপ সূর্য্যের উত্তাপের সাহায্য ভিন্ন উদ্ভিদের শরীরের সঞ্চিত উপকরণগুলিকে আহার্য্যরূপে পরিণত করিতে অসমর্থ। এই নিমিত্তই উদ্ভিদ্-পত্র সর্ব্বদা আলোর দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই ছায়াযুক্ত স্থানে বা 'আওতায়' গাছ-গাছড়া ভাল জন্মায় না।

কাণ্ডস্থ কোষের মধ্যে যে প্রাণ-পদার্থ আছে তাহাই উদ্ভিদের প্রাণস্বরূপ এবং ঐ প্রাণ-পদার্থের মধ্যে শ্বেতসার নামক একটি পদার্থ বিদ্যমান আছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পত্রহরিৎ সূর্য্যের

উত্তাপের সাহায্যে প্রথমতঃ শর্করা প্রস্তুত করে এবং উহাই পরে শ্বেতসারে পরিণত হয়। ঐ শ্বেতসার পাতার শিরা উপশিরা হইতে উদ্ভিদের সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়।

ফুল

উদ্ভিদের ফুল তাহার পাতারই রূপান্তর (modification) বিশেষ। একটি ফুল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—উহাতে কয়েকটি বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। নীচের স্তরটি সবুজ পাতার মত। উপরের স্তরটি কতকগুলি রঙ্গীন পাপ্ড়ির সমষ্টি! ফুলের নীচের ঐ সবুজ স্তরটির নাম পুষ্পচ্ছদ (Calyx) (১৮ নং চিত্র)।

ফুল যখন কলি বা কুঁড়ির অবস্থায় থাকে তখন ঐ পুষ্পচ্ছদ উহাকে রৌদ্র ও হিমের প্রভাব হইতে রক্ষা করার জন্য ঢাকিয়া রাখে।
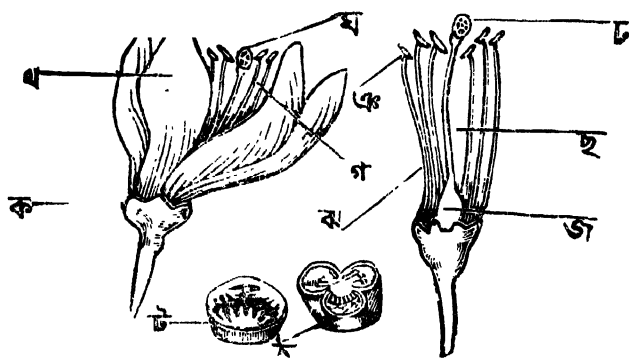
১৮ নং চিত্র।

ক—পুষ্পচ্ছদ, খ—পুষ্পমুকুট, গ—পুংকেশর, ঘ—স্ত্রীকেশর, চ—মুণ্ড, ছ—গর্ভতন্তু, জ—বীজাধার, ঝ—কেশরদণ্ড, ঞ—পরাগকোষ, ট, ঠ—খণ্ডিত বীজাধার।

কুঁড়ি ফুটিয়া যখন ফুলে পরিণত হয়, তখন পুষ্পচ্ছদ ফুলের নীচে থাকিয়া যায়। উপরের স্তরের রঙ্গীন পাপ্ড়ির স্তরটির নাম পুষ্প-

মুকুট (Corolla)। এই পুষ্পচ্ছদ ও পুষ্পমুকুট দুইটিই ফুলের বাহিরের আবরণমাত্র, ফুলের প্রধান অঙ্গগুলিকে নিরাপদে রাখাই ইহার একটি কার্য্য। ফলধারণবিষয়ে উহাদের কোনও প্রত্যক্ষ কার্য্যকারিতা নাই।

পাপ্‌ড়িগুলির মধ্যে চক্রাকারে কতকগুলি কেশর সাজান থাকে, ঐ গুলির নাম পুংকেশর (Stamens)। পুংকেশরগুলির কেশরদণ্ডের (Filament) মাথায় এক একটি দানার ন্যায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দানাগুলির নাম পরাগ-কোষ (Anther)। পরাগ-কোষগুলি এক একটি ছোট কৌটাবিশেষ। এই কৌটাগুলি (Pollen-sacs) পরাগ (Pollen grains) বা রেণুতে পূর্ণ থাকে। ঐ চক্রাকারে সজ্জিত পুংকেশরগুলির কেন্দ্রস্থলে একটি সবুজ লম্বা জিনিষ পাওয়া যায়, এই সবুজ লম্বা জিনিষটির নাম স্ত্রীকেশর, স্ত্রীকোষ বা মাতৃকোষ (Pistil)। উহার সূত্রবৎ অংশটির নাম গর্ভতন্তু (Style)। ঐ তন্তুর অগ্রভাগে পরাগকোষের ন্যায় একটি ছোট চেপ্টা জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই অংশটির নাম মুণ্ড (Stigma)।

উল্লিখিত স্ত্রীকোষের নীচের ফাঁপা অংশটির নাম বীজাধার (Ovary), এবং বীজাধারের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় জিনিষগুলিকে ডিম্বাণু (Ovules) বলে। সুতরাং স্ত্রীকোষে বীজাধার, গর্ভতন্তু এবং মুণ্ড এই তিনটি বিভিন্ন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুংকেশরস্থিত পরাগ স্ত্রীকোষস্থিত বীজাধারের ডিম্বাণুগুলির সহিত মিশ্রিত হইলে বীজের উৎপত্তি হয় এবং ঐ বীজাধারটি ফলে এবং ডিম্বাণুগুলি বীজে পরিণত হইয়া যায়।

উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সন্নিবেশ (sexual arrangement) তিন প্রকার, যথা—(১) ভিন্নাবাসপুষ্পী (Diœcious) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী ও পুং পুষ্প স্বতন্ত্র গাছে থাকে; তাল, পেঁপে প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। (২) দ্বিলিঙ্গভাক্ (Monœcious) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী এবং

পুং পুষ্প একই বৃক্ষে থাকে ; লাউ, কুমড়া প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। (৩)—উভলিঙ্গপুষ্পী (Hermaphrodite) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী এবং পুং কেশর একই ফুলে অবস্থিত থাকে ; অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই এই শ্রেণীভুক্ত।

যে সকল ফুলে স্ত্রী কেশর ও পুং কেশর একসঙ্গে থাকে না, সে ক্ষেত্রে পুং ফুল হইতে পুং কেশরের রেণু সাধারণতঃ জল, বায়ু, পতঙ্গ ও পক্ষীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ত্রী ফুলস্থিত স্ত্রী কেশরের বীজাধারে পতিত হয় এবং তাহাতেই বীজের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হইলে মনুষ্যও অনেক সময়ে পরোক্ষভাবে ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল দেশে ফলের জন্য খেজুরের চাষ করা হয়, সে সকল দেশের কৃষকগণ অনেক সময়ে জননকার্য্যের সহায়তার জন্য পুংগাছের ফুল আহরণ করিয়া স্ত্রীগাছের ফুলের উপর ঝাড়িয়া দেয়। কোন ফল অথবা শস্যের উৎকর্ষসাধন-উদ্দেশ্যে সঙ্করপ্রজননের আবশ্যক হইলে মনুষ্যগণ একই জাতীয় ফল বা শস্যের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহার ফুলের পুং কেশরের রেণু নিকৃষ্ট জাতীয়টির ফুলের স্ত্রী কেশরে কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

জলজ উদ্ভিদের পরাগ জলের উপরে ভাসিয়া আসিয়া গর্ভকোষের সহিত সংযুক্ত হয়।

শুধু মানবজাতির মনোরঞ্জন-উদ্দেশ্যেই ভগবান্ বর্ণ, গন্ধ ও মধু এই তিনের সমাবেশ দ্বারা ফুলের সৃষ্টি করেন নাই। ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও মধু দ্বারা উদ্ভিদ্‌জাতীর একটি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ফুলের বর্ণ ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গকুল ফুলের নিকটবর্ত্তী হয় এবং ফুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু পান করে। মধুপানকালে ফুলের পুং কেশরের পরাগ পতঙ্গশরীরে লাগিয়া যায়। ঐ অবস্থায় অন্য ফুলে মধু আহরণের সময়ে তাহার গাত্র হইতে অল্লাধিক পরাগ স্খলিত হইয়া স্ত্রী কেশরস্থিত বীজাধারে পতিত হয় ; ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ঝিঙ্গা ও শশার ফুলের নাম করা যাইতে পারে। কোন কোন জাতীয় ক্ষুদ্র পাখী মধু-

পান উপলক্ষে চঞ্চু ও পক্ষসংশ্লিষ্ট রেণু অন্য ফুলে বহন করিয়া থাকে। শুধু এই কারণেই দিবাচর পতঙ্গগুলিকে আকর্ষণ করিবার জন্য যাবতীয় রঙ্গীন ফুল দিবাভাগে বিকসিত হয়। অন্ধকারে রঙ্গীন ফুল লক্ষ্য হয় না, তাই সাদা ফুলগুলি নিশাকালে বিকসিত হইয়া নিশাচর পতঙ্গকুলের মধুপানের সুবিধা করিয়া দেয়।

ফুলের পুংকেশরস্থ পরাগ স্ত্রীকেশরস্থ বীজাধারের ডিম্বাণুগুলির সহিত মিশ্রিত হইলেই বীজের উৎপত্তি হয়। এ বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হয় তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

পুং কেশরের পরাগ স্ত্রী কেশরের মুণ্ডের উপরে ছড়াইয়া পড়িলেই মুণ্ডের গায়ে যে একপ্রকার আটার মত পদার্থ আছে তাহার সহিত আট্‌কাইয়া যায়। কিন্তু ঐ পরাগগুলি ঐ অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে না, মুণ্ডের উপরে পড়িয়াই উহারা মুণ্ডস্থিত রস শোষণ করিয়া ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে এবং আপন আপন দেহ হইতে এক একটি সূক্ষ্ম নল (Pollen tube) মাতৃকোষের দণ্ডের ভিতর দিয়া বীজাধারে নামাইয়া দেয়। ঐ নলগুলি বীজাধারের মধ্যস্থিত ডিম্বাণু-গুলি বিদ্ধ করিয়া ঐগুলির উদরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই পরাগ-নালিকাগুলি ডিম্বাণুর শরীরে বিদ্ধ হওয়ার পর হইতেই বীজগুলি পুষ্ট হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বীজাধার বড় হইয়া ফলের আকার ধারণ করে। পরাগ ও ডিম্বাণুর এই মিলন-প্রক্রিয়াটির নাম গর্ভাধান (Fertilisation)।

ফল

বীজাধার পুষ্ট হইয়া ফলে পরিণত হয়। বীজাধারের প্রাচীর পুরু এবং নরম হইলে তাহাকে ফলের শাঁস বলে। সকল জাতীয় ফলের শাঁস হয় না। আম ও পেয়ারার যেমন ছালের নীচেই শাঁস আছে ধান, মটর, যব ইত্যাদির তেমন নাই।

ছোলা, মটর, শিম, অতসী, অপরাজিতা প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলের উপরে একটি আবরণ আছে, ঐ আবরণটির নাম "বীজপূর" (Valve)। কিন্তু আম, জাম, তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি ফলের উপরে ঐরূপ বীজপূর নাই। এই দুইটি বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফলগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বীজপূরযুক্ত ফলগুলি পাকিলেই আপনা হইতে বীজপূরটি ফাটিয়া ফলগুলি ঝরিয়া পড়ে, এজন্য ঐ শ্রেণীর ফলের নাম স্ফোটক (Dehiscent)। ধুতুরা, দোপাটি, আমরুল প্রভৃতি ফলের বীজপুর না থাকা সত্ত্বেও ঐগুলি পাকিলেই ফাটিয়া যায়। ঐগুলিও স্ফোটক-শ্রেণীভুক্ত।

অস্ফোটক (Indehiscent) ফলগুলি রসাল ও শুষ্ক এই দুই প্রধান শ্রেণীভুক্ত। রসাল ফলগুলিকে নিরস্থিক (Berry), ও অস্থিক (Drupe) এবং শুষ্ক ফলগুলিকে একবীজ (Achene) ও বাদাম (Nut) প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বেগুন, পেয়ারা, তরমুজ প্রভৃতি ফলের উপরের ছাল ফেলিয়া দিলে ভিতরটা শাঁসে ভরপূর দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ শাসের ভিতর ছোট ছোট বীজ থাকে, ঐ জাতীয় ফলগুলি নিরস্থিক-শ্রেণীভুক্ত। পেঁপে, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি ফলের মাঝখানে কতকটা অংশ ফাঁকা থাকে। ঐ ফাঁকা স্থানে বীজগুলি শাঁস হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় ফলগুলিও নিরস্থিক-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

আম, কুল, হরীতকী, বহেড়া প্রভৃতি ফলের ছালের নীচে শাঁস এবং শাঁসের নীচে একটি করিয়া বড় আঁটি আছে, ঐগুলি অস্থিক-শ্রেণীভুক্ত।

লিচু, কালোজাম, গোলাপজাম প্রভৃতির ভিতর যে আঁটির ন্যায় পদার্থ আছে উহা প্রকৃত আঁটি নহে, ঐগুলি বীজ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ গুলির গায়ে বীজক্ষত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আঁটির পরিবর্তে বীজ থাকা সত্ত্বেও ঐগুলি অস্থিক ফলের মধ্যেই পরিগণিত।

ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের খোসা বা ছালের নীচে কোন প্রকার শাঁস নাই, ছালের নীচে যে নীরস, শক্ত পদার্থটি দেখিতে পাওয়া যায় উহা তাহাদের বীজ এবং ঐ সকল ফলে একটির বেশী বীজ হয় না; এই জন্য এই শ্রেণীর ফলের নাম "একবীজ" ফল। "বাদাম" জাতীয় ফলের উদাহরণ নারিকেল ও সুপারি।

কাঁটাল ও আতা দেখিতে ঠিক একটি গোটা ফলের মত; বাস্তবিক উহার এক একটি ফল অনেকগুলি ফলের সমষ্টি। কাঁটাল কিংবা আতা ভাঙ্গিলে উহার এক একটির ভিতর অনেকগুলি কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কোষগুলির প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন ফল। কোষের যে অংশ আমরা খাই তাহাই ফলের শাঁস, ঐ শাঁসের ভিতরে এক একটি বীজ থাকে। কাঁটাল এবং আতার উপরের আবরণটি ভিতরের ফলগুলির ছাল। নিরস্থিক এবং অস্থিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর সঙ্গেই এই জাতীয় ফলের সামঞ্জস্য নাই। এই কাঁটাল ও আতার মধ্যেও জননগত বিশেষ পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে।

কাঁটাল গাছে স্ত্রী এবং পুং জাতীয় দুইপ্রকার "মুচি" জন্মে, মুচিগুলি ঠিক মঞ্জরির মত কতকগুলি ফুলের সমষ্টি। পুং মুচিগুলিতে পুং ফুল এবং স্ত্রী মুচিগুলিতে স্ত্রী ফুল থাকে। পুং মুচি হইতে পুং ফুলের পরাগ স্ত্রী মুচিগুলির স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরে পতিত হইয়া উহাদের গর্ভাধান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইরূপে স্ত্রী মুচিস্থিত প্রত্যেক ফুলে এক একটি পৃথক্ ফল জন্মে। মুচিটি গর্ভাধানের পরেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু আতার স্ত্রী ফুল ও পুং ফুল পৃথক্ থাকে না। একই ফুলের মধ্যে পুং কেশর ও স্ত্রী কোষ থাকে। আতার ফুলের বীজাধারগুলি এত ঘন-সন্নিবিষ্ট থাকে যে ঐগুলির দ্বারা এক একটি পৃথক্ ফল জন্মিতে পারে না। সুতরাং আতা ফলকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ফলের সমষ্টিরূপে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব

প্রণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও জীবন আছে। প্রাণিমাত্রেরই জীবনধারণ করিবার জন্য যেমন জল, বায়ু এবং খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমন জল, বায়ু এবং খাদ্য ব্যতীত উদ্ভিদ্‌ও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এমন কি উল্লিখিত তিনটি পদার্থের মধ্যে কোনও একটির অভাব হইলে, প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ উভয়ই মরিয়া যায়।

জীবনধারণ, পরিপুষ্টি, বৃদ্ধি এবং কার্য্যক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ যাহা উদরস্থ বা দেহস্থ করে তাহাই উহাদের খাদ্য। অনেকের ধারণা—প্রাণী এবং উদ্ভিদের খাদ্য একজাতীয় নহে। তাঁহাদের মতে প্রাণিগণ জৈব পদার্থ (organic) আহার করিয়া জীবনধারণ করে, আর উদ্ভিদ্‌গণ কেবল অজৈব পদার্থই (inorganic) খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ ধারণাটি কিন্তু নিতান্তই অমূলক। উদ্ভিদ্‌-জীবনসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহারা কেবল অজৈব পদার্থ আহার করিয়াই জীবিত থাকিতে পারে না। তাহারা যে সকল অজৈব পদার্থ গ্রহণ করে, তাহা তাহাদের প্রকৃত খাদ্য নহে। অঙ্কুর অবস্থায় উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য বীজমধ্যে যে সকল পদার্থ সঞ্চিত থাকে, উহাই উদ্ভিদের প্রকৃত খাদ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অঙ্কুর অবস্থায় উদ্ভিদ্‌ সাধারণতঃ ঐ খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়াই জীবনধারণ করে। ঐ বীজস্থ খাদ্যের বিশ্লেষণ দ্বারা অঙ্গারোদক (carbohydrate), অন্নসার (proteid) এবং স্নেহ-পদার্থ (fat) এই তিনটি প্রাণীর খাদ্যোপযোগী জৈব পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ একজাতীয় আহার্য্য-দ্বারা জীবনধারণ

করিয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তবে উভয়ের আহার্য্যগ্রহণ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রাণিগণ তাহাদের আহার্য্য পদার্থগুলি আহারোপযোগী অবস্থায় উদরস্থ করে। কিন্তু উদ্ভিদ্‌গণ তাহাদের আহার্য্য পদার্থের 'কাঁচা' উপাদানগুলি (raw materials) আপন দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া পরে উহা আহারোপযোগী করিয়া লয়। উদ্ভিদের দৈহিক গঠন স্বভাবতঃই কঠিন এবং ঘন পদার্থ গ্রহণের উপযোগী নহে। উহারা কেবল বায়বীয়, বাষ্পীয় এবং তরল পদার্থগুলিই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং কোন কঠিন অথবা ঘন পদার্থ জলের সংস্পর্শে দ্রবীভূত না হইলে উদ্ভিদ্ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নসার (proteid) এবং স্নেহ-পদার্থ (fat) উদ্ভিদের প্রকৃত আহার্য্য হওয়া সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে একটি কঠিন এবং অপরটি ঘন বলিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে উদ্ভিদ্ উহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এই কারণেই উদ্ভিদ্ বায়বীয় অথবা বাষ্পীয় পদার্থ এবং মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত জল ও ধাতব পদার্থগুলি আপন দেহমধ্যে রাসায়নিক উপায়ে যুক্ত করিয়া, অঙ্গারোদক (carbohydrate), অন্নসার (proteid) এবং স্নেহ-পদার্থ (fat) প্রস্তুত করিয়া লয়। ফলতঃ উহাই উদ্ভিদের প্রকৃত খাদ্য।

উদ্ভিদ্ কি উপায়ে বায়বীয়, বাষ্পীয়, জলীয় এবং ধাতব প্রভৃতি আহার্য্যের 'কাঁচা' উপাদানগুলি (raw materials) হইতে তাহাদের প্রকৃত খাদ্য অঙ্গারোদক (carbohydrate), অন্নসার (proteid), শ্বেতসার (starch) এবং স্নেহ-পদার্থ (fat) প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সে বিষয় নিম্নে আলোচিত হইল।

অঙ্গারোদক (carbohydrate)।—উদ্ভিদের খাদ্যপ্রস্তুত বিষয়ে উহার পত্রই সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। পত্রমধ্যেই উদ্ভিদের যাবতীয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উদ্ভিদ্-পত্রকে উদ্ভিদ্-খাদ্যপ্রস্তুতের কারখানা বলা যাইতে পারে। পত্রের তলদেশে বহুসংখ্যক ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রগুলির নাম পত্রমুখ (stomata)। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া ব্যাপ্তিকরণ-(diffusion) ক্রিয়ার ফলে, অঙ্গারাম্ল বা কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস

(Carbonic acid gas) বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। উদ্ভিদ্ মূল-দ্বারা মৃত্তিকামধ্য হইতে যে জল গ্রহণ করে, তাহা পত্রস্থ কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পত্র-কোষ মধ্যে প্রাণ-পদার্থ (protoplasm) এবং পত্রহরিৎ (chlorophyll) নামক আরও দুইটি পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পত্রহরিৎ প্রাণ-পদার্থ ও সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গারাম্ল ও জলের রাসায়নিক সংযোগ সঙ্ঘটন করিয়া, অঙ্গারোদক (carbohydrate) প্রস্তুত করে। এই ক্রিয়াকে অঙ্গার-সমীকরণ (carbon assimilation) বলে। পত্রকোষের অভ্যন্তরস্থ পত্র-হরিৎই (chlorophyll) এই কার্য্যের নিয়ন্তৃস্বরূপ। পত্রহরিৎ প্রাণ-পদার্থের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তি দ্বারা অঙ্গারাম্ল এবং জল এই দুইটি জিনিষকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, অবশেষে উহা হইতে শ্বেতসার (starch) প্রস্তুত করে এবং কতক অম্লজান (oxygen) বাহির করিয়া দেয়। কোন কার্য্য করিতে হইলে অল্পাধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সূর্য্যরশ্মি শক্তির আধার। পত্রহরিৎ প্রাণ-পদার্থের সাহায্য ব্যতীত ঐ শক্তি সূর্য্যরশ্মি হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব পত্রের যে সকল কোষে প্রাণ-পদার্থ এবং পত্রহরিৎ একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে, কেবল সেই সকল কোষেই অঙ্গার-সমীকরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কার্য্য কেবল দিবাভাগে সম্পন্ন হয়। কারণ সূর্য্যরশ্মির সাহায্য ব্যতীত পত্রহরিৎ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। পত্রহরিৎ কেবল উদ্ভিদের পত্রে এবং সবুজ অংশে বিদ্যমান থাকে; উদ্ভিদের অন্য কোন অঙ্গে উহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। সুতরাং উদ্ভিদের পত্র ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গে অঙ্গার-সমীকরণ সম্পন্ন হইতে পারে না।

এই অঙ্গার-সমীকরণের ফলে, পত্র-কোষমধ্যে শ্বেতসার (starch) নামক পদার্থ অস্থায়িভাবে সঞ্চিত হইতে থাকে। অবশেষে ঐ শ্বেতসার রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা শর্করাতে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন অঙ্গে পরিচালিত হয়।

অন্নসার (proteid)।—অঙ্গারোদক (carbohydrate) যেমন কেবলমাত্র উদ্ভিদের সবুজ অংশে প্রস্তুত হয়, অন্নসার (proteid) সম্বন্ধে সেইরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। উদ্ভিদের যে স্থানে প্রাণ-পদার্থ (protoplasm) বর্ত্তমান আছে, সেখানেই অন্নসার-প্রস্তুতক্রিয়া চলিতে পারে। তবে উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় পত্রমধ্যেই অধিক পরিমাণ অন্নসার প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ শিকড় দ্বারা জল শোষণ করিয়া, যখন উহা সর্ব্ব অঙ্গে চালনা করে, সেই সময়ে নাইট্রেট [১] (nitrate), সালফেট [২] (sulphate), এবং ফস্‌ফেট [৩] (phosphate) প্রভৃতি ক্ষার-পদার্থ ঐ জলের সঙ্গে উদ্ভিদ্-শরীরে প্রবেশ করে। এই ক্ষার-পদার্থগুলি এবং উল্লিখিত অঙ্গার-সমীকরণের ফলে উৎপন্ন শর্করা (sugar), প্রাণ-পদার্থের (protoplasm) কার্য্যকারিতাদ্বারা রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত হইয়া অন্নসারের (proteid) সৃষ্টি করে। এই সংযোগ ঘটিবার পূর্ব্বে উল্লিখিত পদার্থগুলির কি কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে নাইট্রেট (nitrate) এবং শর্করা হইতে প্রথমে এমাইড্‌স্ (amides) প্রস্তুত হয়, পরে ফস্‌ফেট (phosphate) এবং সাল্‌ফেটের (sulphate) সহিত রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হইয়া অন্নসারে (proteid) পরিণত হয়। অন্নসার-প্রস্তুতক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যকিরণের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এই ক্রিয়া রাত্রেও চলিতে পারে।

স্নেহ-পদার্থ (fat)।—উদ্ভিদ্দেহ পোষণের জন্য উদ্ভিদ্‌শরীরে যে স্নেহ-পদার্থ (fat) দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয় তাহা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। যতদূর জানা গিয়াছে তাহা-দ্বারা অনুমান হয় যে, স্নেহ-পদার্থ উদ্ভিদের অন্যান্য খাদ্যের ন্যায়

---

১ নাইট্রেট—নাইট্রিক এসিড্ বা তাম্রদ্রাবকের অন্তর্গত লবণবিশেষ।

২ সালফেট—সাল্‌ফিউরিক্ এসিড বা গন্ধকদ্রাবকের অন্তর্গত লবণবিশেষ।

৩ ফস্‌ফেট—ফস্‌ফরিক্ এসিড বা প্রস্ফুরকের অন্তর্গত লবণবিশেষ।

বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক যোগে উদ্ভিদ্‌দেহমধ্যে প্রস্তুত হয় না। অন্নসার এবং প্রাণ-পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্রমে স্নেহ-পদার্থে পরিণত হয়।

অঙ্গারোদক, অন্নসার এবং স্নেহ-পদার্থ প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের পোষণোপযোগী জৈব-পদার্থগুলি ভিন্নও উহাদের দৈহিক গঠনের নিমিত্ত কতকগুলি অজৈব (inorganic) ধাতব পদার্থের আবশ্যক হয়। ঐগুলির মধ্যে (১) লৌহ (Iron), (২) পত্রক (Potassium), (৩) খটিক (Calcium), (৪) মগ্নক (Magnesium)—এই কয়টি প্রধান।

(১) লৌহ (Iron)—যদিও উদ্ভিদ্ অতি সামান্য পরিমাণে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে তথাপি পত্রহরিৎ-গঠনে লৌহের প্রয়োজন অনিবার্য্য।

(২) পত্রক (Potassium)—শ্বেতসার গঠনের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ।

(৩) খটিক (Calcium)—উদ্ভিদ্‌দেহের কোষ-প্রাচীরে (cell wall) ইহা বর্ত্তমান থাকে। সম্ভবতঃ প্রাণ-পদার্থের মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে।

(৪) মগ্নক (Magnesium)—এই ধাতব পদার্থটি উদ্ভিদের সমস্ত শরীরেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা যে উদ্ভিদের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয় তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

উল্লিখিত ধাতব পদার্থগুলি লবণাকারে মৃত্তিকামধ্যে বর্ত্তমান থাকে। জলের সহিত দ্রব অবস্থায় উদ্ভিদ্ উহা শিকড়দ্বারা গ্রহণ করিয়া নানা অঙ্গে পরিচালনা করে।

খাদ্যপরিপাক ও দেহপোষণ।—প্রাণী এবং উদ্ভিদের খাদ্যপরিপাক ও দেহপোষণবিষয়ে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং প্রাণিগণের খাদ্যপরিপাক ও দেহপোষণ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া ঐ বিষয়ে উদ্ভিদের কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা করিলে বিষয়টি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রাণিগণের ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলী এবং পাকাশয়ে পরিপক্ক হইয়া উহার সারাংশ দ্রব অবস্থায় সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় এবং তদ্দ্বারা রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি দৈহিক উপাদান গঠিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের আহারের সময়ে আহার্য্য সামগ্রী লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া, কণ্ঠনালী-দ্বারা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। লালার মধ্যে "শ্বেতসার কিণ্ব" (diastase) নামে এক প্রকার অজৈব অন্তরুৎসেক (enzyme) আছে। ঐ অজৈব অন্তরুৎসেক শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে শর্করাতে (sugar) পরিণত করে। "শ্বেতসার কিণ্বে"র (diastase) ক্রিয়া আহারের সময়ে মুখের মধ্যে আরম্ভ হইয়া পাকাশয়ে যাইয়া সমাপ্ত হয়। উক্ত শর্করাদ্বারা প্রাণীর দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে। পাকস্থলী হইতেও এক প্রকার পাচক রস নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ রসের মধ্যে 'পেপ্‌সিন' (pepsin) নামক এক প্রকার অজৈব অন্তরুৎসেক (enzyme) বর্ত্তমান থাকে। ঐ অজৈব অন্তরুৎসেক অন্নসারের (proteid) উপর ক্রিয়া করিয়া উহাকে দ্রব (dissolve) করে। অতঃপর ঐ সকল ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলী হইতে পাকাশয়ে (small intestines) চলিয়া যায়। পাকাশয়ে যাওয়ার পরে, "ক্লোমরস" এবং "পিত্তরসে"র সঙ্গে মিলিত হইয়া জীর্ণ হইয়া যায়। পিত্তরসের মধ্যে 'লাইপেজ' (lipase) নামক এক প্রকার অজৈব অন্তরুৎসেক (enzyme) আছে; ঐ অজৈব অন্তরুৎসেক স্নেহ-পদার্থের (fat) উপর ক্রিয়া করিয়া, তাহাকে দ্রব করিয়া দেয়। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে, উহার দ্রব সারাংশ প্রাণিদেহ শোষণ করিয়া লয় এবং উহা দেহের সর্ব্বাংশে পরিচালিত হইয়া পোষণ ও গঠনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশ মলরূপে বাহির হইয়া যায়।

প্রাণিগণের ভুক্ত দ্রব্যের যে প্রণালীতে পরিপাক হয়, উদ্ভিদের আহার্য্যেরও সেইভাবে পরিপাক হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্, অঙ্গারোদক, অন্নসার, স্নেহ-পদার্থ প্রভৃতি যে সকল জৈব খাদ্য তাহাদের দেহমধ্যে প্রস্তুত করে, ঐ সকল খাদ্য দ্রব না হইলে তদ্দ্বারা তাহাদের পোষণকার্য্য

সম্পন্ন হইতে পারে না। উদ্ভিদের প্রত্যেক কোষস্থিত প্রাণ-পদার্থগুলির অজৈব অন্তরুৎসেক (enzyme) প্রস্তুত করার ক্ষমতা আছে। প্রয়োজন অনুসারে উহারা 'ডাইয়েষ্টেস' (diastase), 'পেপ্‌টেস' (peptase) প্রভৃতি অজৈব অন্তরুৎসেক (enzyme) নির্গত করিতে সমর্থ হয়। "শ্বেতসার কিণ্ব" (diastase) শ্বেতসারের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে দ্রব শর্করাতে পরিণত করে। পেপ্‌টেসের (peptase) ক্রিয়ার ফলে অন্নসার (proteid) পেপ্‌টোনে (peptone) পরিণত হয়। লাইপেজ (lipase) স্নেহ-পদার্থ-গুলির উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে দ্রবণশীল স্নেহ-শর্করা (glycerine) এবং বসাসিকাম্লেতে (fatty acids) পরিণত করে। এইরূপে খাদ্যদ্রব্যগুলি দ্রব অবস্থায় উদ্ভিদের সমস্ত দেহে পরিচালিত হইয়া, তৎপরে প্রাণ-পদার্থ (protoplasm) এবং কাষ্ঠসার (cellulose) প্রভৃতি দৈহিক উপাদান গঠন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদের ভুক্তদ্রব্য-পরিপাকপ্রণালী এবং দেহপোষণার্থ উহার ব্যবহারবিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে এইমাত্র পার্থক্য দেখা যায় যে, প্রাণিগণের কোন বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে অজৈব অন্তরুৎসেক (enzyme) নির্গত হইয়া পাকস্থলী এবং পাকাশয়ের মধ্যে পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়; আর উদ্ভিদের পরিপাকক্রিয়া তাহাদের অঙ্গে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে প্রাণীদিগের পরিপাকক্রিয়ার জন্য পাকযন্ত্রের মধ্যে যে সকল পাচক রসের উদ্ভব হয়, তাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রেরণার ফল। প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপাকক্রিয়া যখন একই প্রণালীতে সংসাধিত হইতেছে তখন উদ্ভিদ্‌গণেরও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সত্তা বর্ত্তমান থাকা বিচিত্র নহে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি।—দেহস্থ কোষের সংখ্যা এবং আয়তনবৃদ্ধি দ্বারা উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোষের আয়তনবৃদ্ধির একটা সীমা আছে, সুতরাং কেবল কোষের আয়তনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদের বর্দ্ধনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ফলতঃ নূতন

কোষের সৃষ্টির সঙ্গেই উদ্ভিদের কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উদ্ভিদ্-কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি অতি বিচিত্র।

উদ্ভিদ্-কোষের (cell) একটি সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, পুষ্ট হইলেই উহারা ভাঙ্গিয়া যাইয়া পৃথক্ দুইটি কোষে পরিণত হয় এবং ঐ দুই কোষের মধ্যে একটি কোষ-প্রাচীর (cell wall) গঠন করে। এইরূপে দুইটি কোষ ভাঙ্গিয়া চারিটি (৪) এবং চারিটি (৪) ভাঙ্গিয়া আটটি, (৮)— এই প্রণালীতে উত্তরোত্তর কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের কলেবরও বর্দ্ধিত হয়। উদ্ভিদ্‌দেহের সর্ব্বত্র এই কোষবর্দ্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ এই ক্রিয়া দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ঐ সকল স্থানের কোষগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ঐ কোষগুলিকে বর্দ্ধনশীল কোষ বলে। এই কোষগুলি উদ্ভিদ্-কাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্দ্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। কাণ্ডের ছালের অব্যবহিত নিম্নের কোষগুলি দ্বারা কাণ্ডের পরিসর বর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ কাণ্ডটি মোটা হয় এবং কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগের কোষসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ্ দৈর্ঘ্যে বড় হয়।

উদ্ভিদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration)।—প্রাণিমাত্রই প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে উহা পরিত্যাগ করে। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রাণিসকল প্রশ্বাস-সহযোগে বায়ু গ্রহণ করিয়া, ঐ বায়ুস্থিত অম্লজান (অক্সিজেন) রক্তের সাহায্যে দেহের সর্ব্বত্র পরিচালিত করে এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল বা অঙ্গার বাষ্প (কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস) পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সেইরূপ উদ্ভিদ্‌ও তাহাদের শরীরের সর্ব্বস্থান দ্বারা প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করিয়া ঐ বায়ুস্থ অম্লজান অভ্যন্তরস্থ সমস্ত কোষে পরিচালিত করে এবং নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল বাহির করিয়া দেয়। এই নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদ্‌দিগেরও দিনরাত্র সমভাবে চলিতেছে। অম্লজান প্রাণি-শরীরের অণুকোষ-

গুলিকে জারিত (oxidize) করিয়া উহাদের কার্য্য করিবার শক্তি প্রদান করে। উদ্ভিদের পক্ষেও অম্লজানের কার্য্য ঠিক সেইরূপ। উদ্ভিদের প্রাণ-পদার্থগুলি সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে। প্রাণ পদার্থ পুরাতন হইলেই উহার সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ঐ পুরাতনগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় নূতন সজীব প্রাণ-পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাণ-পদার্থগঠনের জন্য অম্লজানের প্রয়োজন হয়। এই নিমিত্তই উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ-পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে এবং অঙ্গারাম্ল বাহির করিয়া দেয়।

অঙ্গারসমীকরণের (Carbon assimilation) জন্য উদ্ভিদ্ দিবাভাগে পত্রচ্ছিদ্রপথে অঙ্গারাম্ল গ্রহণ করে এবং অম্লজান পরিত্যাগ করে। এই কার্য্যটি উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্যের ঠিক বিপরীত এবং এই কার্য্য দিবাভাগে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। * এইজন্যই দিবাভাগে উদ্ভিদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া উপলব্ধি করা কিছু শক্ত হয়। রাত্রিকালে অঙ্গারসমীকরণ (Farbon assimilation) ক্রিয়া বন্ধ থাকে; তখন উদ্ভিদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ রাত্রিকালে উদ্ভিদ্-দেহ হইতে কেবল অঙ্গারাম্লই বাহির হইয়া যায়।

অঙ্গারসমীকরণ এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাস,—এই উভয় ক্রিয়াই উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং যাহাতে এই দুইটি ক্রিয়াবিষয়ে কোন প্রকার ভ্রমের উদয় না হয়, তজ্জন্য উহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে।

* কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে রাত্রিতেও এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

অঙ্গারসমীকরণ

১। কেবলমাত্র উদ্ভিদের সবুজ অংশে অর্থাৎ যেখানে পত্রহরিৎ বর্ত্তমান আছে সেখানে সম্পন্ন হয়।

২। কেবলমাত্র দিবালোকে সম্পন্ন হয়।

৩। এই প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত হয়।

৪। সূর্য্যরশ্মি হইতে পত্রহরিতের সাহায্যে শক্তি গৃহীত হইয়া সঞ্চিত হয়।

৫। অঙ্গারাম্ল গৃহীত হয় এবং অম্লজান পরিত্যক্ত হয়।

৬। এই প্রক্রিয়ার জন্য জলের প্রয়োজন হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস

১। শরীরের সর্ব্বত্র এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২। দিবারাত্র সমভাবে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩। এই প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য বিশ্লিষ্ট হয়।

৪। ইহা দ্বারা কার্য্য করিবার শক্তি ব্যয়িত হয়।

৫। অম্লজান গৃহীত হয় এবং অঙ্গারাম্ল পরিত্যক্ত হয়।

৬। এই প্রক্রিয়া দ্বারা জল প্রস্তুত হয়।

উদ্ভিদ্ ও জল।—উদ্ভিদ্‌জীবনে জলের আবশ্যকতা বহুবিধ: (১) ধাতব পদার্থগুলি জলে দ্রবীভূত না হইলে উহা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয় না। (২) অঙ্গারোদক-সংক্রান্ত উদ্ভিদের আহার্য্যগুলি প্রস্তুত করিতে জলের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। (৩) প্রাণ-পদার্থকে সজীব ও সুস্থ রাখিবার জন্য জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। (৪) উদ্ভিদের কোষের মধ্যে প্রচুর জল না থাকিলে কোষের দৃঢ়তা নষ্ট হয় এবং উদ্ভিদের পাতা, বোঁটা প্রভৃতি নেতাইয়া পড়ে এবং আস্তে আস্তে শুকাইয়া যায়। প্রাণিগণের যেমন পানীয় হিসাবে জলের প্রয়োজন উদ্ভিদেরও সেইরূপ পানীয় হিসাবে জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কোন প্রকার শাক অথবা উদ্ভিদের নিরস্থিক অংশের (Succulent portion) কাঠিন্য কিংবা অনমনীয়তা উহাদের অভ্যন্তরস্থ জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন উদ্ভিদের একটি নিরস্থিক (Succulent) শাখা ঐ উদ্ভিদ্ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে সূর্য্যোত্তাপে উহার অভ্যন্তরস্থ জল বাষ্পীভূত হইয়া চলিয়া যায় এবং তাহার ফলে ঐ শাখাটি অবসন্ন হইয়া একেবারে নেতাইয়া পড়ে। একটি উদ্ভিদের বর্দ্ধনশীলতা, উহার অভ্যন্তরস্থ কোষসমূহে নিয়মিতভাবে জলপ্রসারণ অথবা রসস্ফীতির (Turgidity) উপর নির্ভর করে। যে প্রণালী অবলম্বনে মৃত্তিকাস্থিত জল উদ্ভিদের জীবিতকোষ হইতে কোষান্তরে পরিচালিত হয় তাহাকে চর্ম্মান্তর্ব্বাহ (Osmosis) প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত জল উদ্ভিদ্‌কোষের ঝিল্লিসমূহ (Membranes) ভেদ করিয়া উদ্ভিদ্‌দেহে বিস্তৃত হয়।

মূলত্রাণের পশ্চাদ্ভাগে মূলের গায়ে যে রোমমূল আছে, উহার প্রত্যেকটিতে নলের ন্যায় এক একটি কোষ বর্ত্তমান থাকে। ঐগুলি মূলের উপরিস্তরের কতকগুলি নালিকা-কোষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে; ঐ কোষগুলি পরস্পর এক একটি কোষপ্রাচীর দ্বারা বিভক্ত এবং উহার প্রত্যেক কামারা কোষের অভ্যন্তরে কোষরসের সহিত প্রাণ-পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। ঐ রোমমূলগুলি মৃত্তিকার অণুসকল ঠেলিয়া মৃত্তিকা মধ্যে বিস্তৃত হয়। রোমমূল-গুলির কোষের মধ্যে ঘন কোষরস থাকার দরুন উহারা চর্ম্মান্তর্ব্বাহ (Osmosis) প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত জল সহজে শোষণ করিয়া লইতে সমর্থ হয়। ঐ জলের সঙ্গে অন্যান্য ধাতব পদার্থগুলিও দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ্‌দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। চর্ম্মান্তর্ব্বাহ প্রক্রিয়া দ্বারা অত্যন্ত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতেও উদ্ভিদ্ জল শোষণ করিতে সমর্থ হয়। চর্ম্মান্তর্ব্বাহ প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, উহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত তরল পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঘন পদার্থের মধ্যে যাইয়া দ্রুত মিশ্রিত হয়।

চর্ম্মান্তর্ব্বাহ প্রক্রিয়া দ্বারা তরল পদার্থ যেমন ঘন পদার্থের সহিত দ্রুত গতিতে মিলিত হয়, তেমন আবার ঘন পদার্থও তরল পদার্থের সহিত মন্দ গতিতে মিলিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্তিকাস্থ জলীয় পদার্থ যেমন রোমমূলস্থ কোষ-রসে মিলিত হয়, তেমন অল্প পরিমাণে কোষ-রসও মৃত্তিকাস্থিত জলীয় পদার্থে মিলিত হয়। ঐ কোষ-রস স্বভাবতঃই অম্ল-স্বাদ-যুক্ত; উহা দ্বারা মৃত্তিকাস্থ ধাতব পদার্থগুলি দ্রব হইয়া, জলের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌শরীরে প্রবেশ করে। চর্ম্মান্তর্ব্বাহ প্রক্রিয়ার উল্লিখিত দুইটি ধারার মধ্যে প্রথমোক্তটির নাম অন্তশ্চর্ম্মান্তর্ব্বাহ (Endosmosis) এবং শেষোক্তটির নাম বহিশ্চর্ম্মান্তর্ব্বাহ (Exomosis)।

একটি উদ্ভিদ্‌দেহ গঠিত হইতে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদ্ মূল দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক জল শোষণ করিয়া থাকে। উদ্বৃত্ত জল বাষ্পীভূত হইয়া উদ্ভিদ্‌দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। উহার অধিকাংশই উদ্ভিদ্‌পত্র এবং অন্যান্য সবুজ অংশ দ্বারা দ্রুতভাবে বাষ্পাকারে নির্গত হয়। উদ্ভিদ্‌দেহস্থ এই জলপ্রবাহ দ্বারা উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ-গুলি অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে।

উদ্ভিদের পত্রমুখগুলি পারিপার্শ্বিক উত্তাপের ন্যূনাধিক্যহেতু খুলিয়া ও বন্ধ হইয়া যায়। উত্তাপের আধিক্য হইলে, মুক্ত অবস্থায় ঐ সকল ছিদ্রপথ দ্বারা পত্র-কোষের মধ্যস্থ সঞ্চিত উদ্বৃত্ত জল বাষ্পাকারে (Transpiration) বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদ্‌দেহস্থ জল কেবল যে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায় এমন নহে। প্রস্বেদক্রিয়া (Exudation) দ্বারা অর্থাৎ ঘর্ম্মরূপেও অনেক সময়ে উদ্ভিদ্‌দেহ হইতে জল নির্গত হয়। অতিশয় উত্তাপ, শুষ্ক বায়ু, প্রবল বায়ু এবং কাণ্ডের আন্দোলনজনিত উদ্ভিদ্‌দেহ হইতে জল বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া থাকে। অত্যন্ত উত্তপ্ত দিনে অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত নীরস থাকিলে, কোন কোন বৃক্ষ একেবারে মুসড়াইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—ঐ বৃক্ষ, মূল দ্বারা যে পরিমাণ জল শোষণ করে, প্রস্বেদ দ্বারা

তদপেক্ষা অধিক জল দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যাওয়ার দরুন উহার প্রয়োজনানুযায়ী জলের অভাব হয়। সুতরাং বৃক্ষটি অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়ে।

মূলের শোষণ শক্তি দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত রস উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ করে এবং মূলজ চাপে (root pressure) ঐ রস উর্দ্ধে পরিচালিত হয়। মূলের পার্শ্বস্থ কোষগুলি অন্তশ্চর্ম্মান্তর্ব্বাহ প্রক্রিয়া দ্বারা জলপূর্ণ হওয়াতে স্ফীত হইয়া উঠে। তখন ঐ কোষগুলির মধ্যে এক প্রকার চাপের (pressure) সৃষ্টি হয় এবং কোষগুলির আবরণের দৃঢ়তা ঐ চাপের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া ঐ জলকোষের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখে। কোষস্থ জলের বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ চাপেরও বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে ঐ চাপের প্রভাবে অতিরিক্ত জল মূলের মধ্যস্থ কাষ্ঠাংশে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে কাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়। এই চাপকেই মূলজ চাপ (root pressure) বলে।

ফলতঃ চর্ম্মান্তর্ব্বাহ মূলজ চাপ এবং অন্যান্য শক্তি দ্বারা শোষিত রস উদ্ভিদের কাষ্ঠনালিকায় (wood vessel) প্রবেশ করিয়া, ক্রমে মূল হইতে কাণ্ডে এবং কাণ্ড হইতে পত্র-বৃন্তে ও বৃন্ত দ্বারা পত্র-ফলকে উপনীত হয়।

উদ্ভিদের অনুভূতি।—প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদের অনুভবশক্তি আছে। প্রাণিগণের যাবতীয় অনুভূতি তাহাদের ইন্দ্রিয়-সকল দ্বারা সাধিত হয়। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সকল বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; কিন্তু প্রাণিগণের ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত উদ্ভিদ্‌দেহের কোন কোন অংশের কার্য্যকারিতার সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাণিগণের ইচ্ছাশক্তি মস্তিষ্ক হইতে চালিত হইয়া তাহাদিগকে বিবিধ কার্য্যে নিয়োজিত করে। মস্তিষ্ক বলিয়া কোন একটা পদার্থ উদ্ভিদ্‌দেহে বর্ত্তমান আছে কি না এবং উদ্ভিদ্‌গণ ঐ মস্তিষ্কের পরিচালনাধীন কি না তাহাও অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। উদ্ভিদের অনুভবশক্তি বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

লজ্জাবতী লতার পাতাগুলি স্পর্শ করিলেই উহার মধ্যে এক প্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ঐ উত্তেজনার ফলে পাতাগুলি একেবারে নেতাইয়া পড়ে এবং বুজিয়া যায়।

পেসিফ্লোরা (Passiflora) নামক উদ্ভিদের আঁকৃড়ির বিশেষ অনুভবশক্তি আছে। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই ঐ আঁকৃড়িগুলি স্পন্দিত হইতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বাঁকিয়া যায়। ঐ লতার আঁকৃড়ি ভিন্ন অন্য কোন স্থান স্পর্শ করিলে ঐরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না।

সানডিউ (Sundew) নামক এক প্রকার কীট-ভুক্ বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষের পত্রের উপরে কতকগুলি গ্রন্থিযুক্ত শুঁয়া থাকে। মক্ষিকা কিংবা অন্য কোন প্রকারের কীট ঐ পত্রের উপরে বসিলে উহার শুঁয়াগুলি উত্তেজিত হইয়া ঐ কীটটিকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। তখন পত্রটি একটি পাত্রের আকার ধারণ করে এবং গ্রন্থিগুলি হইতে একপ্রকার পাচক রস নির্গত হইয়া ঐ কীটটিকে মারিয়া ফেলে। তৎপরে ঐ পাচক রসের সাহায্যে কীটের সারাংশ শোষণ করিয়া লয়। অনৈসর্গিক উপায়ে শুঁয়াগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দিলে উহা স্ফীত হয় বটে, কিন্তু উহা হইতে পাচক রস নির্গত হয় না।

ডাইয়োনিয়া (Dionea) বৃক্ষের পাতার উপরেও কতকগুলি অনুভূতিযুক্ত রোম (sensitive hair) আছে। কোন প্রকার কীট ঐ রোমগুলির সংস্পর্শে আসিলেই পাতাটি বুজিয়া যাইয়া কীটকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। ঐ অবস্থায় পাতার মধ্যে কীটটি জীর্ণ হইয়া যায়।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উদ্ভিদের স্পর্শানুভবশক্তি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ঐ শক্তি উদ্ভিদ্‌দেহের সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান নাই। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও কতকগুলি অনুভব-আয়তন (sensory area) আছে। ঐ স্থানগুলি অতি অল্প উত্তেজনায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থান ভিন্ন অন্যত্র কোন প্রকার উত্তেজনার সাড়া পাওয়া যায় না।

প্রাণিগণ দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোক অনুভব করে। উদ্ভিদেরও আলোক অনুভবের শক্তি আছে। একটি টবের মধ্যে কুমড়ার বীজ বপনের পর উহা একটি আবদ্ধ গৃহে রাখিয়া দিয়া ঐ গৃহের একটিমাত্র জানালা খুলিয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ বীজটি অঙ্কুরিত হইয়াই আলোর দিকে মুখ করিয়া থাকিবে এবং উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ঐ খোলা জানালার দিকে লতাইয়া যাইবে। এই অবস্থায় ঐ জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার বিপরীত দিকের জানালাটি খুলিয়া রাখিলে, লতাটি ক্রমে ঘাড় বাঁকাইয়া পুনরায় ঐ খোলা জানালার দিকে চলিয়া আসিবে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ্ আলোক অনুভব করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে সমর্থ। এই প্রকার আলোকের দিকে বৃদ্ধি পায় বলিয়া উদ্ভিদ্-কাণ্ডকে আলোকাভিমুখ (positively heliotropic) এবং উদ্ভিদ্‌মূলের ইহার বিপরীত দিকে গতি বলিয়া উহাকে আলোকানভিমুখ (negatively heliotropic) বলে।

প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করিবার শক্তি আছে। একটি টবের গাছকে উণ্টাভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে কিছুদিন পরে আমরা দেখিতে পাইব, শিকড়গুলি নীচের দিকে অর্থাৎ টবের মাটির উপরে চলিয়া আসিয়াছে* এবং কাণ্ডটি ঘাড় বাঁকাইয়া উপরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। উদ্ভিদ্‌মূল ঐরূপ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যায় বলিয়া উহাকে ভূ-কেন্দ্রাভিমুখ (positively geotropic) এবং উদ্ভিদ্-কাণ্ড উহার বিপরীত দিকে যায় বলিয়া উহাকে ভূ-কেন্দ্রানভিমুখ (negatively geotropic) বলে।

মৃত্তিকার যে অংশে জলের আধিক্য বর্ত্তমান, উদ্ভিদ্ জল শোষণ করিবার জন্য সেই দিকেই শিকড় বিস্তার করিয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে উদ্ভিদ্‌গণের জলের অস্তিত্ব অনুভব করিবার শক্তি আছে। ঐরূপ জলাভিমুখ হয় বলিয়া উদ্ভিদ্‌মূলকে জলানুগামী (positively hydrotropic) বলে।

উদ্ভিদ্ তড়িৎ-প্রবাহ অনুভব করিতেও সমর্থ। উদ্ভিদ্‌দেহে

তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইলে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া সাড়া দেয় এবং স্পন্দিত হইতে থাকে। এই স্পন্দন এত মৃদু যে অতি সূক্ষ্ম তড়িৎ-মানযন্ত্রের (delicate Galvanometer) সাহায্য ব্যতীত উহা অনুভব করা যায় না। এই বিষয় লইয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বহুবিধ গবেষণা করিয়াছেন এবং তিনি তড়িৎ-মানযন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট ঐ বিষয়টি সপ্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদ্দেহে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে উহা উত্তেজিত হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। কিন্তু ঐ স্পন্দন বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঐ অবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিয়া কিছুকাল পরে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালন করিলে উহা পুনরায় উত্তেজিত ও স্পন্দিত হইতে থাকে। ইহাতে বুঝা যায় কিছু কাল স্পন্দনের পরই উহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে,—ক্লোরোফরম্ (Chloroform), ইথার (Ether) প্রভৃতি অচেতনকারক বাষ্পের প্রভাবে প্রাণিগণের যেমন চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, উদ্ভিদ্গণেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। গাজর, মূলা, ফুলকপি প্রভৃতির অবসাদ সহজে লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ক্লোরোফরম্ কিংবা ইথার বাষ্প প্রয়োগমাত্রই উহাদের অনুভব-শক্তি হ্রাস পায়। তখন উহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও স্পন্দিত হয় না, কিন্তু উহাদিগকে এই বাষ্পের প্রভাব হইতে সরাইয়া লইলেই প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদেরও অবসাদ দূর হইয়া যায় এবং উত্তেজিত করিলে পুনরায় স্পন্দিত হয়। আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি—কোন একটি বড় গাছকে মাটি হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে অনেক সময়েই উহারা ঐ আঘাত সাম্লাইতে না পারিয়া ক্রমে নিস্তেজ হয় এবং অবশেষে মরিয়া যায়। আচার্য্য বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে, বড় বড় গাছকেও ক্লোরোফরম্ কিংবা ইথার দ্বারা অসাড় করিয়া স্থানান্তরিত করিলে ঐ স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে ক্লেশ হয়, তাহা তাহারা মোটেই অনুভব করিতে পারে না এবং গাছগুলি সহজেই বাঁচিয়া থাকে।

তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন—অবসাদক বিষের সাহায্যে প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদেরও সম্পূর্ণরূপে স্পন্দন লোপ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত কারণপরম্পরা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও অনেক বিষয়ে অনুভবশক্তি আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ভিদের খাদ্য

বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত আমাদের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদ্‌গণও ঠিক সেইরূপ আহার ভিন্ন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি আমরা দেখিতে পাই কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্যদ্রব্য-গুলি আমরা দেখিতে পাই না। উহারা বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা হইতে অদৃশ্যভাবে উহা গ্রহণ করে। উদ্ভিদের আহার্য্য এই অদৃশ্য পদার্থগুলি কি এবং ঐগুলি কোন্ কোন্ উপাদানের সংমিশ্রণের ফল, সে বিষয়টি জানিয়া রাখা দরকার।

একটি উদ্ভিদ্‌কে ২১২° ফাঃ উত্তাপে (অর্থাৎ যে পরিমাণ উত্তাপে জল ফুটিতে থাকে) পোড়াইলে উহা হইতে যাবতীয় জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। জলীয় ভাগ নিঃশেষিত হওয়ার পর উহা হইতে ধূম বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ দহনীয় ভাগ অর্থাৎ জৈব পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া গেলে কেবল ছাই অর্থাৎ খনিজ পদার্থগুলি পড়িয়া থাকিবে। এখন একে একে এই তিনটি জিনিষ অর্থাৎ জলীয় ভাগ, দহনীয় ভাগ, এবং ছাইএর ভাগ লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে—(১) বাষ্প অর্থাৎ জলের উপাদান জলজান বা হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং অম্লজান বা অক্সিজেন (Oxygen) ; (২) ধূমের উপাদান অঙ্গার বা কার্ব্বন (Carbon), অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন (Nitrogen), এবং গন্ধক বা সাল্‌ফার (Sulphur) ; এই পদার্থ পাঁচটি * উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ;

* এতদ্ব্যতীত কখনও কখনও সামান্য পরিমাণে জৈব প্রস্ফুরক বা ফস্‌ফরাস ধূমের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) ছাইএর উপাদান পত্রক বা পটাসিয়াম (Potassium), মগ্নক বা ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), খটিক বা ক্যাল্‌সিয়াম (Calcium), লৌহ বা আয়রন (Iron), প্রস্ফুরক বা ফস্‌ফরাস (Phosphorus) এবং গন্ধক (Sulphur); উদ্ভিদের জীবনধারণ-পক্ষে এই ছয়টি পদার্থও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে একটি উদ্ভিদের দেহে (১) জলজান, (২) অম্লজান, (৩) অঙ্গার, (৪) যবক্ষারজান, (৫) গন্ধক, (৬) পত্রক, (৭) মগ্নক, (৮) খটিক, (৯) লৌহ, (১০) প্রস্ফুরক—এই কয়টি পৃথক্ পৃথক্ উপাদান আছে। ইহা ছাড়া (১১) লবণক বা সোডিয়াম (Sodium), (১২) মঙ্গলক বা ম্যাঙ্গানিজ (Manganese), (১৩) সিকতক বা সিলিকা (Silica), (১৪) হরিক বা ক্লোরিন্ (Chlorine) প্রভৃতি অন্যান্য উপাদান উদ্ভিদ্-শরীরে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

উল্লিখিত আহার্য্যগুলির মধ্যে উদ্ভিদ্ অঙ্গার, অম্লজান, জলজান ও যবক্ষারজান * এই চারিটি উপাদান প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ-ভাবে বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে। বাকী দশটি উপাদানই

* বায়ুমণ্ডলে যবক্ষারজান মুক্তভাবে অবস্থান করে এবং সেই হেতু উদ্ভিদ্ উহা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু বায়ুমণ্ডলস্থিত বিদ্যুতের প্রভাবে এই মুক্ত যবক্ষারজান, অম্লজান ও জলজান-গ্যাসের সহিত মিলিয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিবারির সহিত ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া উদ্ভিদ্‌জীবনের পক্ষে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই প্রকারে বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া উদ্ভিদের জীবনের পক্ষে কার্য্যকারী হইতেছে।

ইহা ছাড়া মটর, কলাই, অড়হর, শণ, ধইঞ্চা, অতসী, শিম ইত্যাদি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের বায়ুমণ্ডল হইতে মুক্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। এই জাতীয় উদ্ভিদ্ তাহাদের মূলস্থিত একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যে মুক্ত যবক্ষারজান বায়ুমণ্ডল হইতে সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকাতে আনয়ন করে। এই বিষয়ে জীবাণু অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত উপাদানের পরিমাণ উদ্ভিদের শুষ্ক অংশের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ এবং বায়ুমণ্ডল হইতে গৃহীত চারিটি উপাদানের পরিমাণ শতকরা পঁচানব্বই ভাগ দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উদ্ভিদের আহার্য্যগুলি আমরা দেখিতে পাই না। চিনির সরবৎ পান করিবার সময়ে আমরা যেমন অদৃশ্যভাবে চিনি খাইয়া থাকি, উদ্ভিদ্‌গণ তাহাদের মৃত্তিকানিহিত খাদ্যদ্রব্যগুলি সেইরূপ অদৃশ্যভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহ-বিশ্লেষণের ফলে উল্লিখিত যে উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে ঐগুলির মধ্যেও একাধিক উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে উদ্ভিদের দেহ-পোষণোপযোগী হিতকর খাদ্যের উৎপত্তি হয়। নতুবা ঐগুলির মধ্যে এমন সকল উপাদান রহিয়া গিয়াছে যাহা উদ্ভিদের পক্ষে হিতকর না হইয়া বরং মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সকল উপাদান কি প্রণালীতে উদ্ভিদের আহার্য্যরূপে পরিণত হয় নিম্নে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইল।

(১) জলজান বা হাইড্রোজেন (Hydrogen)।—ইহা বর্ণহীন একপ্রকার গ্যাস, অগ্নিসংযোগে ইহা প্রজ্বলিত হওয়ার সময়ে একপ্রকার নিষ্প্রভ নীল আভা বিস্তার করে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে এবং উদ্ভিদ্ ও জন্তুগণের পচনকালে জলজান উৎপন্ন হয়। পত্রক এবং লবণক জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জ্বলিয়া উঠে এবং উহা হইতে কতক জলজান বিমুক্ত হইয়া যায়। জলজান সাধারণতঃ মুক্ত অবস্থায় থাকে না। অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া জলের একটি উপাদানরূপে ইহা প্রধানতঃ অবস্থান করে।* ইহা

* বাস্তবিক "জলজান" নামটি দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে জলের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, দুইভাগ জলজান এবং একভাগ অম্লজানের মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। জল বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে যে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় উহার ওজন মাত্র জলের ওজনের $\frac{১}{৯}$ অংশ এবং বাকী $\frac{৮}{৯}$ অংশই অক্সিজেন গ্যাস।

ছাড়া বায়ুমণ্ডলস্থ কার্ব্বন, হাইড্রোজেনের সহিত বিবিধভাবে মিলিত হইয়া কার্ব্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) নামক উদ্ভিদ্‌দেহের পোষণকারী কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা নাইট্রোজেনের সহিতও মিলিত হইয়া এমোনিয়া (Ammonia) নামক গ্যাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এই এমোনিয়া গ্যাস নাইট্রিক কিংবা সাল্‌ফিউরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া কৃষিক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সারপ্রয়োগ দ্বারা উদ্ভিদের সবিশেষ পরিপুষ্টি সাধিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে উদ্ভিদের যাবতীয় খাদ্যের মধ্যেই হাইড্রোজেন কোন না কোন প্রকারে বর্ত্তমান আছে।

(২) অম্লজান বা অক্সিজেন (Oxygen)।—এই গ্যাসের কোনপ্রকার বর্ণ, গন্ধ কিংবা স্বাদ নাই। ইহা হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা ষোল গুণ ভারী। সমগ্র ভূ-ভাগের প্রায় অর্দ্ধাংশই অম্লজান। একভাগ অম্লজান চারিভাগ যবক্ষারজানের সহিত মিলিত হইয়া বায়ু-মণ্ডলে বিরাজ করে। যাবতীয় দাহ্য পদার্থ অম্লজানের প্রভাবেই দগ্ধ হইয়া থাকে। অম্লজানের দাহক গুণ এত প্রবল যে যদি বায়ুমণ্ডলে যবক্ষারজান বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে এতদিন সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইত। অম্লজানের প্রভাব দ্বারাই প্রাণিদেহের পচনক্রিয়া সাধিত হয়। অম্লজান ভিন্ন বীজ অঙ্কুর হইতে উদ্‌গত হইতে পারে না। বাড়ন্ত অবস্থায় উদ্ভিদ্ চব্বিশ হইতে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে উহাদের দেহের সমপরিমাণ অম্লজান গ্রহণ করে।

পত্র, পুষ্প, মুকুল, পল্লব ইত্যাদি এবং শিকড় দ্বারা উদ্ভিদ্ অম্লজান গ্রহণ করিয়া দেহস্থ সমুদয় কোষে এবং অণুকোষে ছড়াইয়া দেয়।

উদ্ভিদ্ অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ (Carbon Dioxide) গ্যাস পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদ্‌দেহে এই কার্য্য জীবদেহে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের অনুরূপ। উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করা ব্যতীত মূলের সাহায্যে জল হইতেও অক্সিজেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

উদ্ভিদের প্রায় সমস্ত আহার্য্য পদার্থের মধ্যেই অক্সিজেন বর্ত্তমান আছে। অক্সিজেন সর্ব্বদাই নানা প্রকারে উদ্ভিদ্-জাতির দেহ-পোষণে সহায়তা করিতেছে। শুধু উদ্ভিদ্ কেন, অন্যান্য জীবজন্তুও অক্সিজেন ভিন্ন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অম্লজান সহজেই অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলির সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হয়। অম্লজান অঙ্গারকে জারিত করিয়া উদ্ভিদ্-পোষণের সর্ব্বপ্রধান উপাদান কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ (Carbon Dioxide) প্রস্তুত করে। তদ্ব্যতীত ইহা ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যাল্সিয়াম, এলুমিনিয়াম (Aluminium) ও সিলিকনের মূল উপাদান-গুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া যথাক্রমে ম্যাগ্নেসিয়া (Magnesia), চূণ (Lime), এলুমিনা (Alumina) এবং সিকতক (Silica) প্রভৃতি উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থগুলি প্রস্তুত করিয়া দেয়। সকল প্রকার বালুকার ভিত্তি সিলিকা (Silica) এবং সকল প্রকার কর্দ্দমের ভিত্তিতেই এলুমিনা (Alumina) রহিয়াছে।

(৩) অঙ্গার বা কার্ব্বন (Carbon)।—বিভিন্ন আকারে অঙ্গারের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠ কিংবা হাড় পোড়াইলে যে কয়লা হয় তাহার মধ্যে অঙ্গারের ভাগ এত অধিক থাকে যে মোটামুটি-ভাবে উহাকেই অঙ্গার বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। জগতের যাবতীয় জৈব পদার্থের মধ্যেই অঙ্গার বর্ত্তমান আছে, এই নিমিত্তই জৈব পদার্থ-গুলিকে পোড়াইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্গণের স্থূল দেহের অর্দ্ধাংশই অঙ্গার। একখানা কয়লাকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করিতে থাকিলে উহার অঙ্গারের ভাগ বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক এসিড বা কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। উহাকেই আমরা 'পুড়িয়া যাওয়া' বলি।

উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রের সবুজ অংশ এবং সূর্য্যালোকের সাহায্যে উল্লিখিত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং নিজদেহ-পোষণের জন্য কার্ব্বন গ্রহণ করিয়া অম্লজান পরিত্যাগ করে। কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের প্রভাবে চূণ খড়িমাটিতে পরিণত হইয়া থাকে।

চূণের জলের উপর নিশ্বাস ত্যাগ করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই উহা সাদা (milky) হইয়া যায়। নিশ্বাসের সহিত পরিত্যক্ত কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাব দ্বারাই চূণের জল ঐ প্রকার রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদ্গণেরও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য আছে। প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ উভয়েই নিশ্বাসের সহিত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থ পুড়িয়া অহরহঃ বহু পরিমাণ কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত হইতেছে এবং উহা বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যাইতেছে। কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রাধিক্য প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক। উদ্ভিদ্জগৎ ঐ অতিরিক্ত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং প্রাণিজগৎ বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন গ্রহণ করে; এই নিমিত্তই বায়ু-মণ্ডলে উক্ত উভয় পদার্থের সমতা রক্ষিত হয়। এইভাবে উক্ত দুই পদার্থের সমতা রক্ষিত না হইলে প্রাণিজগৎ এতদিন প্রাণিশূন্য হইয়া যাইত।

কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ্জীবনের পক্ষে একটি বিশিষ্ট উপাদান। পত্রমুখগুলির ভিতর দিয়া ব্যাপ্তিকরণ ক্রিয়ার (diffusion) ফলে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উদ্ভিদ্ মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে যে জল গ্রহণ করে তাহা পত্রস্থ কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পত্রকোষমধ্যে পত্রহরিৎ এবং প্রাণ-পদার্থ নামক আরও দুইটি পদার্থ বর্ত্তমান আছে; ঐ দুইটি পদার্থ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের রাসায়নিক সংযোগ সংঘটন করিয়া উদ্ভিদ্জীবনের পক্ষে একটি বিশিষ্ট উপাদান অঙ্গারোদক (Carbohydrate) নামক পদার্থ প্রস্তুত করে। এই ক্রিয়াকে অঙ্গারসমীকরণ (Carbon assimilation) বলে। এই কার্য্য কেবল দিবাভাগে সম্পন্ন হয়, কারণ সূর্য্যরশ্মি কিংবা কৃত্রিম রশ্মির সাহায্য ব্যতীত পত্রহরিৎ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। পত্রহরিৎই ঐ কার্য্যের নিয়ন্তা স্বরূপ। পত্রহরিৎ প্রাণ-পদার্থের

সাহায্যে সূর্য্য-কিরণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তি দ্বারা কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল এই দুইটি জিনিষকে ভাঙ্গিয়া অবশেষে উহা হইতে শ্বেতসার (Starch) প্রস্তুত করে এবং কতক অম্লজান (Oxygen) বাহির করিয়া দেয়। উল্লিখিত শ্বেতসার অবশেষে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শর্করাতে (Sugar) পরিণত হইয়া উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন অঙ্গে পরিচালিত হয়। উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪) যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন (Nitrogen)।—উদ্ভিদের জীবনধারণ ও বিকাশের পক্ষে নাইট্রোজেন একান্ত প্রয়োজনীয়। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের $\frac{4}{5}$ ভাগ যবক্ষারজান। সোরার মধ্যে মিশ্রিতভাবে যবক্ষারজান পাওয়া যায়। যবক্ষারজানের কোন প্রকার বর্ণ, গন্ধ কিংবা স্বাদ নাই ; ইহা নিজেও পোড়ে না কিংবা অন্য কোন জিনিষকে দহন করিতে সহায়তাও করে না। অত্যধিক তাপপ্রয়োগে বা তড়িৎপ্রভাবে যবক্ষারজান অম্লজানের সহিত মিলিত হয়। নাইট্রোজেনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে উহা বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেনের দ্রুত কার্য্যকারিতাকে মন্দীভূত করিয়া দেয়।

নাইট্রোজেন উদ্ভিদ্-শরীর গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহা উদ্ভিদের সমস্ত পত্রে এবং কঠিন (woody) অংশে বিদ্যমান থাকে। ইহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নাইট্রোজেনের আধিক্যে উদ্ভিদের পত্র ও শাখাগ্র বৃহৎ ও তেজস্কর হয় কিন্তু উহা তদনুপাতে দৃঢ় হয় না। নাইট্রোজেনের অল্পতা হইলে উদ্ভিদ্ ক্ষুদ্রকায়, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পত্র ও কাণ্ডের উদ্দেশ্যে যে সকল উদ্ভিদের আবাদ করা হয় তাহার জন্য নাইট্রোজেন-যুক্ত সার বিশেষ উপযোগী।

হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিলনে এমোনিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই এমোনিয়া হইতে উদ্ভিদ্ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে। নাইট্রোজেনের আর একটি যৌগিক পদার্থ নাইট্রিক এসিড

(Nitric acid); ইহা নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

এই নাইট্রিক এসিডের সঙ্গে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি মিশ্রিত হইলে পটাসিয়াম নাইট্রেট (Potassium Nitrate), সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium Nitrate) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট (Calcium Nitrate) প্রভৃতি উদ্ভিদের পোষণোপযোগী প্রয়োজনীয় পদার্থের উদ্ভব হয়।

গলিত উদ্ভিজ্জাত (Humus) মৃত্তিকাতে বহুল পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঐ নাইট্রোজেন অদ্রবণীয় হওয়ার দরুন উদ্ভিদ্ তাহা শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

মৃত্তিকানিহিত কতকগুলি জীবাণুর সাহায্যে উদ্ভিদের ঐ নাইট্রোজেন-গ্রহণকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন-ঘটিত ঐ সকল জীবাণুর ক্রিয়াকে নাইট্রিফিকেশন (Nitrification), এমোনিফিকেশন (Amonification), নাইট্রোজেন ফিক্সেশন (Nitrogen fixation) বলা হয়। ব্যাক্টেরিয়া (Bacteria) বা জীবাণু নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই এমোনিয়া ও নাইট্রেট অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উর্ব্বরা ভূমিতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

মটর, সিম, ধইঞ্চা প্রভৃতি সিম্বীজাতীয় শস্যগুলি জীবাণুবিশেষের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডল হইতে নাইটোজেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। মাটিতে এক প্রকার জীবাণু আছে; ঐগুলির কার্য্য মাটির মধ্যস্থ নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থকে নাইট্রেটে পরিণত করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করিয়া দেওয়া। এই কার্য্য করে বলিয়া ঐ জীবাণু-গুলিকে নাইট্রিফাইং ব্যাক্টেরিয়া (Nitrifying Bacteria) বলে।

সিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ্গুলির শিকড়ের গায়ে কতকগুলি গুটি বাহির হয়, জীবাণুবিশেষ ঐ গুটির মধ্যে বাস করে এবং তথা হইতে বায়ুমণ্ডলস্থ

নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেনের ভাগ বৃদ্ধি করে। নাইট্রোজেন-মিশ্রিত পদার্থ অন্যান্য জীবাণু দ্বারাও নাইট্রেটে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়।

কখনও কখনও জীবাণুর সাহায্যে নাইট্রেট-প্রস্তুত কার্য্য এত ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় যে ঐ অবস্থায় উদ্ভিদের প্রয়োজনানুযায়ী নাইট্রোজেনের অংশ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of soda), সালফেট অব এমোনিয়া (Sulphate of Ammonia) প্রভৃতি নাইট্রোজেন-প্রধান সারপ্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) **প্রস্ফুরক বা ফস্‌ফরাস** (Phosphorous)।—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সহিত ফস্‌ফরাস মিশ্রিত হইলে ফস্‌ফরিক এসিড (Phosphoric acid) উৎপন্ন হয়। নাইট্রোজেনের পরেই ফস্‌ফরিক এসিড উদ্ভিদ্‌গণের একটি প্রধান আহার্য্য। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উদ্ভিদের আহার্য্য যে সকল খনিজ পদার্থ আছে তন্মধ্যে ফস্‌ফরাসই প্রধান। ফস্‌ফরাস অক্সিজেন গ্যাস এবং অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, একক অবস্থায় ইহাকে পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ্‌কে দৃঢ় ও ফলশালী করিবার পক্ষে ফস্‌ফরাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ধান, গম, যব, মটর, কলাই ইত্যাদি শস্যের পক্ষে ফস্‌ফরাস বিশেষ উপযোগী। শস্যের চারা অবস্থায় পরিমিতভাবে গ্রহণোপযোগী ফস্‌ফরিক এসিড সাররূপে প্রদান করিলে উহারা সবল ও সতেজ হইয়া থাকে।

বহু পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে উদ্ভিদ্‌কে সবলভাবে বর্দ্ধিত করিবার জন্য ফস্‌ফরাস অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, উদ্ভিদ্‌দেহের অণুকোষ-কেন্দ্রে ফস্‌ফরাস বিদ্যমান না থাকিলে উদ্ভিদের বর্দ্ধনক্রিয়া অসম্ভব হয়। উদ্ভিদ্ তাহার অন্যান্য আহার্য্য ফস্‌ফরাসের সাহায্যে আত্মস্থ (assimilation) করিয়া থাকে, ফস্‌ফরাস উদ্ভিদের বীজোৎপাদন-কার্য্যের সহায়ক এবং ফস্‌ফরাসের সাহায্যেই উদ্ভিদের দেহ পরিণত (mature) হইয়া থাকে। জমিতে গ্রহণোপযোগী ফস্‌ফরিক এসিডের

অংশ অধিক থাকিলে শস্য শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বীজগুলিও বেশ পুষ্ট হয়।

জীবজন্তুর অস্থিতে প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফরিক এসিড চূণের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ফস্‌ফেট অব লাইম (Phosphate of Lime) রূপে পাওয়া যায়। জীবজন্তুর অস্থির অভ্যন্তরস্থ এই ফস্‌ফরাস কিন্তু উদ্ভিদ্-দেহ হইতেই প্রাপ্ত। প্রতিদিন জীবজন্তু যে উদ্ভিজ্জ খাদ্য আহার করে তৎসঙ্গে উদ্ভিদ্-দেহস্থ ফস্‌ফরাস জীব-দেহে প্রবেশ করিয়া অস্থিতে সঞ্চিত হয়। অস্থির মধ্যে শতকরা এগার ভাগ ফস্‌ফরাস থাকে। কোন কোন জাতীয় প্রস্তরের মধ্যে ফস্‌ফরিক এসিড চূণের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু অস্থি এবং উক্ত ফস্‌ফরিক এসিডযুক্ত প্রস্তর জলে দ্রবীভূত হয় না, সুতরাং ঐ পদার্থগুলিকে দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। তদবস্থায় উহাকে গলিত প্রস্ফুরক বা এসিড ফস্‌ফেট (Acid phosphate) বলে। অস্থির মধ্যে একভাগ ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত তিন ভাগ চূণ মিশ্রিত থাকে। মৃত্তিকাতে হিউমাসের বা গলিত উদ্ভিদ্-সারের অংশ বেশী থাকিলে একদিকে যেমন নাইট্রোজেনের অংশ বৃদ্ধি পায় তেমন মৃত্তিকানিহিত ফস্‌ফরাসকেও উদ্ভিদের আহারোপযোগী করিয়া দেয়।

(৬) পত্রক বা পটাসিয়াম (Potassium)।—ইহা একটি কোমল ধাতব পদার্থ। ইহার বর্ণ শুভ্র এবং উজ্জ্বল। অম্লজানের সহিত ইহার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অম্লজানের সহিত মিলিত হইবার স্বতঃপ্রবৃত্তি-বশতঃ ইহাকে বিশুদ্ধ অবস্থাতে প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা কঠিন। ইহা জল ও বায়ু হইতে অতি সহজে অম্লজান গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং ইহাতে এত তাপ উৎপন্ন হয় যে, বায়ুতে রাখিলে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠে।

পটাসিয়াম জলে নিক্ষেপ করিলে জল হইতে অম্লজান গ্রহণ করিয়া জলজান বিমুক্ত করিয়া দেয়। এই ক্রিয়ার ফলে জলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। পর্বত এবং সমুদ্রজলে ইহা যৌগিকভাবে দেখিতে

পাওয়া যায়। পর্ব্বত হইতে বৃষ্টি-বারির সহিত ইহা কৃষিক্ষেত্রে নামিয়া আসে। কোন কোন শুষ্ক উদ্ভিদ্ পোড়াইলে তাহার ছাইয়ের ভিতর শতকরা পঁচিশ ভাগ পত্রক দেখিতে পাওয়া যায়। পত্রক উদ্ভিদ্-দেহ হইতে খাদ্যরূপে প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

পত্রস্থ শ্বেতসার এবং উদ্ভিদের কঠিন অণুকোষসকলের গঠন-কার্য্যে পটাস একান্ত প্রয়োজনীয়। ফল ও মূলের জন্য যে সকল শস্যের চাষ হয় তাহাতে পটাসের সার দিলে বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। সাধারণতঃ সকল জমিতেই পটাস বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বেলে মাটিতে উহার পরিমাণ অল্প থাকে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে মৃত্তিকা-নিহিত পটাস বিশেষ গ্রহণোপযোগী হয় এবং গলিত উদ্ভিজ্জ-সার ব্যবহার করিলে পটাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পটাসের যৌগিক পদার্থগুলি উদ্ভিদ্-জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পটাস উদ্ভিদ্-দেহে নাইট্রিক, সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক (Hydrochloric), অক্সেলিক (Oxalic), মেলিক (Malic), সাইট্রিক (Citric) ও টার্টারিক (Tartaric) এসিডের সহিত যৌগিক অবস্থায় থাকে।

গাছ পোড়াইলে যে পটাস পাওয়া যায় উহা ঐ গাছের মৃত্তিকা হইতে গৃহীত পটাস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কোন কোন স্থানের মাটিতে বিশেষতঃ গোশালার নিকট পটাস-যুক্ত সোরা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট (Potassium Nitrate) কৃষিকার্য্যে অতিশয় প্রয়োজনীয়। পটাসিয়াম ও নাইট্রোজেন উভয়ই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট আদর হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ সোরাতে শতকরা ১৪ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৩৯ ভাগ পটাসিয়াম বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু বাজারে চলিত সোরাতে সাধারণতঃ ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩০ ভাগ হইতে ৩৫ ভাগ পটাসিয়াম থাকে।

বিহারে "নুনিয়া" নামক একশ্রেণীর লোক মৃত্তিকাজাত সোরা সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যবসায় করিয়া থাকে।

(৭) খটিক বা ক্যালসিয়াম (Calcium)।— ক্যালসিয়াম একটি ধাতব পদার্থ। ইহাকে একক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ্-খাদ্যরূপে খটিক একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইলে সদ্যঃ চুণে (Calcium Oxide) পরিণত হয়। এই অবস্থায় উহা মৃত্তিকাতে থাকিয়া মৃত্তিকার দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণ চুণসংযোগে এঁটেল মাটি লঘু ও সচ্ছিদ্র হয় এবং বেলে মাটি অপেক্ষাকৃত এঁটেল অর্থাৎ দো-আঁশে পরিণত হয়। উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষতঃ সিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ্, ঘাস, এবং আমন ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের পক্ষে চুণ বিশেষ উপকারী। কিন্তু ভুট্টার পক্ষে ইহা তত উপযোগী নহে, গোল-আলু এবং চিনা, কাউন প্রভৃতির পক্ষে বরং ইহা উপকারী। চুণের প্রভাবে মৃত্তিকানিহিত জৈব উপাদানগুলি সহজে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয় এবং জমিতে উদ্ভিজ্জ-সার প্রদান করিলে উহা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পচাইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। কার্ব্বনিক এসিডের (Carbonic acid) সহিত মিলিত হইয়া ক্যাল্‌সিয়াম কার্‌বনেট (Calcium carbonate) রূপে ইহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাল, মুক্তা, খড়িমাটি এবং হুটিং পাথর প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা উদ্ভিদের চুণজাতীয় খাদ্যের প্রধান উপাদান। ক্যাল্‌সিয়ামের বর্ণ পিত্তলের ন্যায় পীত। গাছের পুরাণো অংশ অপেক্ষা নূতন অংশেই বিশেষতঃ সবুজ অংশে ইহা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড (Calcium Oxide) বা চুণ বায়ুমণ্ডল হইতে জলীয় বাষ্প এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্রহণ করিতে সমর্থ।

চুণ মৃত্তিকার একটি উৎকর্ষ-সাধক পদার্থ। মৃত্তিকা অম্লযুক্ত হইলে অনেক সময়ে উদ্ভিদের জীবনধারণপক্ষে অযোগ্য হইয়া থাকে; কারণ ঐরূপ মাটিতে উদ্ভিদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন নাইট্রেটরূপে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত কীটাণু নাইট্রিফিকেশনের (Nitrification) কার্য্য করে তাহারা অম্লযুক্ত জমিতে উত্তমরূপে সেই

কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড-রূপে চূণ জমিতে প্রয়োগ করিলে উহার অম্লতাদোষ দূর হইয়া যায়।

(৮) গন্ধক বা সাল্‌ফার (Sulphur)।—ইহা পীত-বর্ণ, ভঙ্গপ্রবণ এবং দানাদার একপ্রকার খনিজ পদার্থ। অগ্নিসংযোগে গন্ধক জ্বলিয়া ফিকা নালবর্ণ আভা ধারণ করে এবং তখন উহা হইতে একপ্রকার তীব্র গন্ধ নির্গত হয়। গন্ধক জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড দ্বারা ইহাকে সহজে দ্রব করা যায়।

গন্ধক পোড়াইলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহার সহিত অক্সিজেন গ্যাস ও জলের মিশ্রণে সাল্‌ফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। সাল্‌ফিউরিক এসিড অমিশ্রিত অবস্থায় অত্যন্ত তীব্র। ধাতব পদার্থের সহিত সংমিশ্রণে এই এসিড সাল্‌ফেটে (Sulphate) পরিণত হয়। সাধারণতঃ সাল্‌ফার মাটিতে সাল্‌ফেট অবস্থাতে বিশেষতঃ ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফেট, সাল্‌ফেট অব পটাস, সালফেট অব লাইম অবস্থায় উদ্ভিদ্ জীবনের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্-দেহে সাল্‌ফারের পরিমাণ অতি সামান্য মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিদ্-জীবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য্য।

রসুন, পিঁয়াজ, সর্ষপ, এবং কোনো কোনো বিলাতী সব্‌জীতে গন্ধকের অস্তিত্ব সহজেই অনুমিত হয়। জীবজন্তুর চুল ও রেশমে অধিক মাত্রায় গন্ধক বিদ্যমান আছে।

(৯) মগ্নক বা ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Magnesium)।—ইহা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। ডোলোমাইট (Dolomite) নামক চূণাপাথরে ম্যাগ্‌নেসিয়াম নামক মৌলিক ধাতব পদার্থ বিদ্যমান আছে। ইহার বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র। ম্যাগনেসিয়াম, কার্ব্বন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে ম্যাগনেসিয়াম কার্ব্বনেট (Magnesium Carbonate) উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে ঠিক ময়দার ন্যায় কিন্তু স্বাদহীন। ঐ জিনিষটি উদ্ভিদের একটি খাদ্য। উদ্ভিদ্-দেহের সকল অংশেই ম্যাগ্‌নেসিয়াম বর্ত্তমান আছে, কিন্তু বীজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান

থাকে। প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই উদ্ভিদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ম্যাগ্‌নেসিয়াম বর্ত্তমান আছে। সুতরাং শস্যের জন্য কখনও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সাররূপে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না।

(১০) লৌহ বা আয়রন (Iron)।—ইহা সাধারণতঃ অক্সাইডরূপে বা সিলিকেট (Silicate) রূপে থাকে। ইহা কর্ষিত ভূমিতে "ফেরিক অক্সাইড" (Ferric Oxide) রূপে পাওয়া যায় কিন্তু ফেরাস অক্সাইড (Ferrous Oxide) রূপে নহে। কারণ যৌগিক ফেরাস অক্সাইড বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া যৌগিক ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়।

উদ্ভিদ্‌-খাদ্যহিসাবে অতি সামান্য পরিমাণে লৌহের প্রয়োজন হইলেও উদ্ভিদ্‌-জীবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য্য। অক্সিজেন, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের প্রভাবে লোহার জিনিষে মরিচা ধরিয়া থাকে। মরিচার রং লাল এবং লৌহের প্রভাবে মৃত্তিকার রংও লাল হইয়া থাকে। সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই অল্পাধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত আছে। এইজন্য লৌহ কখনও সাররূপে জমিতে প্রয়োগ করিতে হয় না।

(১১) লবণক বা সোডিয়াম (Sodium)।—লবণক পত্রকের মতই ক্ষারজাতীয় উগ্র পদার্থ। লবণক ও হরিণকের সংমিশ্রণে লবণের সৃষ্টি। লবণ হইতে তড়িতের সাহায্যে হরিণক দূর করিয়া দিলেই লবণক অবশিষ্ট থাকে। নাইট্রিক এসিডের সহিত সোডিয়াম মিশ্রিত হইয়া সোডিয়াম নাইট্রেট (Sodium Nitrate) বা চিলীয়ান নাইট্রেট (Chillian Nitrate) উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। লবণক সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের সাহায্য করে না; কিন্তু যেখানে পত্রক, খটিক এবং মগ্নক প্রভৃতি পাওয়া কঠিন হয়, সেখানে লবণক-সংযুক্ত পদার্থ মাটি হইতে উক্ত অন্যান্য ক্ষারজাতীয় পদার্থকে আংশিকভাবে মুক্ত করিয়া সাররূপে কার্য্য করে এবং কোন কোন স্থানে প্রত্যক্ষভাবেও কার্য্য করে।

রাসায়নিক সম্পদে লবণক পত্রকসদৃশ এবং লবণকের যৌগিক-পদার্থসমূহ পত্রকের যৌগিক-পদার্থগুলিরই অনুরূপ। কিন্তু ঐগুলি মৃত্তিকাতে সাররূপে প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকার কর্দ্দমাংশ কিংবা জৈব অংশ ঐগুলিকে মৃত্তিকামধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। উহা চুয়াইয়া নীচের দিকে চলিয়া যায় এবং গলিয়া পয়ঃপ্রণালী-যোগে নদী ইত্যাদির স্রোতের জলে মিলিত হইয়া যায়।

(১২) মঙ্গলক বা ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)— ম্যাঙ্গানিজ একটি ধাতব পদার্থ। ইহার রংএর সহিত লৌহের রংএর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহা স্বভাবতঃই কঠিন এবং ভঙ্গপ্রবণ। উদ্ভিদ্-দেহ-বিশ্লেষণে ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উদ্ভিদ্-জীবনে ইহার কার্য্যকারিতা আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা উদ্ভিদ্-দেহের পোষণবিষয়ে কি কি কার্য্য সাধিত হয় তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় নাই। সম্প্রতি বিলেষ্টেটার সাহেব দেখাইয়াছেন যে, পত্র-হরিৎ নামক যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ উদ্ভিদ্-দেহে বিদ্যমান আছে ম্যাঙ্গানিজ তাহার একটি উপাদান।

(১৩) সিকতক বা সিলিকন (Silicon)— সিলিকন একক অবস্থায় পাওয়া যায় না। মাটিতে অক্সিজেনের পরেই সিলিকনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিলিকন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে বালুকা উৎপন্ন হয়। ধান, গম, যব প্রভৃতি গাছের ভস্মে প্রায় অর্দ্ধাংশই সিলিকন পাওয়া যায়। অন্যান্য উদ্ভিদেও ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে সিলিকন ব্যতীতও ধান, গম প্রভৃতির গাছ উত্তমরূপে বর্দ্ধিত ও ফলবান্ হইতে পারে। সে যাহা হউক, সিলিকন এককভাবে উদ্ভিদ্-জীবনের কোন প্রকার হিতসাধন করিতে না পারিলেও মৌলিক অবস্থায় বালুকা-রূপে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া কৃষিকার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়া থাকে। মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা এবং গঠনের উপর সিলিকনের যথেষ্ট কার্য্যকারিতা আছে।

(১৪) হরিণক বা ক্লোরিন (Chlorine)—ক্লোরিন একটি বাষ্পীয় পদার্থ। ইহার বর্ণ পীতাভ। একক অবস্থায় বায়ুতে ইহা ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর ইহা খটিক ও লবণকের সহিত যৌগিক অবস্থায় থাকে। ৩৫ ভাগ হরিণক ও ২৩ ভাগ লবণকের সংমিশ্রণে লবণ উৎপন্ন হয়। লবণ হইতে তড়িৎসাহায্যে লবণকের অংশ পৃথক্ করিয়া ফেলিলে হরিণক এককভাবে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্-দেহ-বিশ্লেষণে বিশেষতঃ 'বীট'জাতীয় ফসলে, হরিণকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উদ্ভিদ্-জীবনে ইহার একটি কার্য্যকারিতা নিশ্চয়ই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার গুণাগুণ বিষয়ে কিছুই নির্ণীত হয় নাই।

উল্লিখিত যাবতীয় উপাদানই উদ্ভিদ্জাতির আহার্য্য। অবশ্য ইহার ভিতর সকলগুলি সমান প্রয়োজনীয় নহে। যেগুলির প্রয়োজনীয়তা অধিক সেইগুলি যে মৃত্তিকাতে বিদ্যমান নাই, তাহার উপর কিছুতেই উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে না। জমিতে যদি উদ্ভিদের আহারোপযোগী পদার্থ বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদ্ যদি সেই ক্ষেত্র হইতে তাহার আহার্য্য নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সেই মৃত্তিকাতে শস্যোৎপাদনের পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে না।

আর যে মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের আহার্য্য উপাদানের মধ্যে কোনো একটি সম্পূর্ণ বা আংশিক অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই মৃত্তিকাতে আশানুরূপ শস্য জন্মে না, স্থল বিশেষে আদৌ জন্মে না। অতএব ঐ স্থলে সার-প্রয়োগ দ্বারা ক্ষেত্রের অভাব পূরণ করিয়া দিতে হয়।

নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড, পটাস এবং লাইম এই চারিটি উপাদান উদ্ভিদ্-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ইহার মধ্যে যেটির, যে দুইটির, অথবা তিনটির অভাব থাকে, সেই জাতীয় সার মৃত্তিকাতে মিশ্রিত করিয়া দিলে ক্ষেত্র আপনা আপনিই উর্ব্বর হইয়া উঠিবে অর্থাৎ যে মৃত্তিকাতে ফস্ফরিক এসিড, পটাস এবং লাইমের অংশ অধিক এবং নাইট্রোজেনের অংশ কম তাহাতে নাইট্রোজেনের গুণবিশিষ্ট সার অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিতে

হইবে। পক্ষান্তরে যে মৃত্তিকাতে উক্ত চারিটি উপাদানের মধ্যে দুইটি উপাদানের আধিক্য এবং দুইটির অল্পতা লক্ষিত হয় অর্থাৎ নাইট্রোজেন ও পটাসের ভাগ বেশী এবং ফস্‌ফরিক এসিড এবং লাইমের অংশ কম, তাহাতে ফস্‌ফরিক এসিড ও চূণের গুণবিশিষ্ট সার সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিলেই ভূমি শস্যশালিনী হইয়া উঠিবে।

কোন্ জাতীয় সারে কি উপাদান বর্ত্তমান আছে তাহা "সার" নামক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

যাবতীয় মৃত্তিকাতেই উদ্ভিদের উল্লিখিত আহার্য্য পদার্থগুলি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কোন কোন মৃত্তিকাতে উহা ঠিক উপযুক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, আবার কোন কোন স্থানে মাত্রার বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়।

এমনও দেখা যায় যে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উদ্ভিদের আহার্য্যের যাবতীয় উপাদান বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহাতে উপযুক্ত শস্য উৎপাদন করা যাইতেছে না। ইহার দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে উপযুক্ত শস্যোৎপাদনের অনুকূল যাবতীয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও মৃত্তিকার ভিতর এমন কোন তীব্র ক্ষার অথবা বিষাক্ত জিনিষ মিশ্রিত থাকে, যাহার তীব্রতায় অপরাপর উপাদানগুলির ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া যায়। পক্ষান্তরে এই প্রকার অনেক ভূমি দৃষ্ট হয় যাহাতে শস্যোৎপাদনের অনুকূল যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে এবং উহাদের ক্ষতি-কারক কোন প্রকার তীব্র কিংবা বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান নাই অথচ সেই ভূমিতে বহু আয়াস সত্ত্বেও কোন প্রকার শস্য উৎপাদিত হইতেছে না। এইরূপ বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে উক্ত মৃত্তিকানিহিত উপাদান নিশ্চয় এমন দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে যে উদ্ভিদ্ তাহা হইতে কোন প্রকারেই আপনার প্রয়োজনীয় আহার্য্য মূলদ্বারা শোষণ করিয়া লইতে সমর্থ হয় না। উক্ত সুদৃঢ় উপাদানগুলিকে ভূমিকর্ষণদ্বারা রৌদ্রোত্তাপে এবং শৈত্যের প্রভাবে দ্রবশীল করিয়া লইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী

করিয়া দিতে হইবে, নতুবা এই প্রকার ভূমিতে শস্যোৎপাদন করা একপ্রকার অসম্ভব। ইহা ছাড়া মৃত্তিকাতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সেগুলি পরস্পর এমন রাসায়নিক সংযোগে (Chemical Compound) আবদ্ধ থাকে যে উদ্ভিদ্ সেই যুক্তভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া ঐ উপাদানগুলিকে নিজের আহার্য্যরূপে পরিণত করিতে পারে না। সেজন্য রাসায়নিকগণ মৃত্তিকা দুই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন; যথা—সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক উপাদান-বিশ্লেষণ (Percentage of Total Elements), এবং গ্রহণীয় উপাদান-বিশ্লেষণ (Available Elements)।

মাটির ভিতর উদ্ভিদের আহার্য্য যে পরিমাণ দৃষ্ট হয় বাস্তবিক উদ্ভিদের জীবনধারণ করিতে তাহার অতি সামান্যমাত্র ব্যয়িত হইয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে একখণ্ড উর্ব্বরা ভূমিতে হাজারে এক ভাগ নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড উহার সমপরিমাণ এবং পটাস পাঁচ হইতে দশ ভাগ বর্ত্তমান থাকে। এক 'একর' পরিমিত (৩$\frac{1}{80}$ বিঘা ৩/॥) একখণ্ড উর্ব্বরা ভূমিতে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ প্রথম স্তর হইতে যদি উহার আভ্যন্তরীণ জলীয়ভাগ সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয় তবে উহার ওজন ২০,০০০ বিশ হাজার মণ হইবে এবং উক্ত মৃত্তিকাখণ্ডে উল্লিখিত অনুপাতানুযায়ী উদ্ভিদের আহার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। উল্লিখিত অনুপাতানুসারে গণনা করিলে এই বিশ হাজার মণ মাটির মধ্যে চল্লিশ মণ নাইট্রোজেন, চল্লিশ মণ ফস্ফরিক এসিড এবং একশত মণ পটাস বর্ত্তমান থাকিবে যদি এক 'একর' জমিতে বিশ মণ গম এবং ত্রিশ মণ খড় জন্মায় তাহা হইলে উহার জন্য মাত্র আধ মণ নাইট্রোজেন, দশ সের ফস্ফরিক এসিড এবং তের সের পটাসের আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই এতগুলি শস্য তাহাদের জীবনধারণ করিবার জন্য কত সামান্য পরিমাণ উপাদান মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে।

মাটির ওজন সর্ব্বত্র সমান নহে। এক কিউবিক্ ফুট (এক ঘন ফুট) মাটির ওজন এক হইতে আড়াই মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মাটির

আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৫ হইতে ২·৭ গুণ। সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬" ইঞ্চি নিম্ন পর্য্যন্ত মাটি পৃষ্ঠস্তর (Surface Soil) নামে খ্যাত। যে স্থলে আরও নীচ পর্য্যন্ত মাটির অবস্থা ভাল এবং সাধারণতঃ যে স্থানে অপেক্ষাকৃত ভারী লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় সেখানে এই স্তর ৮" ইঞ্চি গণ্য হয়। মোটের উপর এই পৃষ্ঠস্তরের ওজন প্রতি 'একরে' পঁচিশ হাজার মণ হইয়া থাকে।

বাংলা দেশের মাটিতে পটাসের ভাগ 'একর' প্রতি—বরিশালে ৬৫০/ মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়ায় ৬৫/ মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় পলিমাটিতে এই অংশ বেশী থাকে। নাওগাঁ, রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে ৩৭৫ হইতে ৬২৫ মণ পর্য্যন্ত থাকে। ফস্‌ফরিক এসিড গড়ে ২০/ মণ হইতে ২৫/ মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাশিমগঞ্জে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৫০/ মণ পাওয়া গিয়াছে ও বোলপুরের কোন কোন স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা কম ৩/ মণ পাওয়া গিয়াছে। এই উপাদানটি বঙ্গের মাটিতে বেশী নাই। নাইট্রোজেন বাংলার মাটিতে 'একর'প্রতি ২০/ মণ হইতে ২৫/ মণ পাওয়া যায়।

এক 'একর' জমিতে গড়ের উপর ১১/ মণ ধান্য জন্মে; ইহার শিকড় এবং গোড়া (Stubble) বাদ দিলে প্রতিবৎসরের শস্যের সহিত 'একর'প্রতি ।৫ পনের সের নাইট্রোজেন, /৫ পাঁচ সের ফস্‌ফরিক এসিড এবং ॥৫ পঁচিশ সের পটাস জমি হইতে বাহির হইয়া যায়।

এক 'একর' জমিতে ১৫/ মণ পাট জন্মিলে 'একর'প্রতি ।৫ পনের সের নাইট্রোজেন, ॥৪ চব্বিশ সের ফস্‌ফরিক এসিড এবং দেড় মণ পটাস জমি হইতে বাহির হইয়া যায়।

এই স্থলে ইহা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, শুধু রাসায়নিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই কোনো ভূমি কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত কি না সে বিষয়ে সন্দেহশূন্য হওয়া যাইতে পারে না, কারণ রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা

এই পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে যে মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের আহার্য্য বিদ্যমান আছে কি না এবং থাকিলে কি পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। কৃষি-রসায়ন এখনও এতদূর উন্নত হয় নাই যে তদ্দ্বারা মৃত্তিকানিহিত উদ্ভিদের আহার্য্য উপাদানগুলি উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় বর্ত্তমান আছে কি না তাহা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইয়া যাইবে, সুতরাং কেবল রাসায়নিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই কোনও কৃষিক্ষেত্র শস্যোপযোগী হইবে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত নহে। তথাপি কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা যে নানা বিষয়ে অত্যাবশ্যক তাহা অস্বীকার করা যায় না, কারণ মৃত্তিকাতে শস্যের অনিষ্টকারক কোনও লবণাক্ত পদার্থ * অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভূমিতে শস্যের আহার্য্যের কোন উপাদানের অভাব আছে কি না এবং ভূমির কোন স্বভাবজাত স্বাতন্ত্র্য আছে কি না—এই সকল বিষয় অবগত হইতেও মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু মৃত্তিকা-পরীক্ষা-কার্য্য যথাবিধি পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টিও বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক—

(১) মৃত্তিকার প্রাকৃতিক উৎপত্তি।

(২) মৃত্তিকার নিম্নস্তরের (অন্ততঃ ৪ ফুট পর্য্যন্তের) অবস্থা।

(৩) ইতঃপূর্ব্বে এই ভূমিতে কি শস্য জন্মিয়াছিল এবং তাহাতে সার প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, কি সার দেওয়া হইয়াছিল।

(৪) পূর্ব্বে এই ভূমি কি পরিমাণ উর্ব্বরা ছিল।

উল্লিখিত তত্ত্বসকল রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত হইলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে উক্ত ক্ষেত্রের প্রকৃত অভাব কি এবং তাহার জন্য কি কি প্রতীকার আবশ্যক। ভূতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান

* যথা সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাল্‌ফেট, ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্‌ফেট এবং ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড।

থাকিলেও মৃত্তিকাসম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অতি সহজে জানা যায়।

সাধারণতঃ চূর্ণবহুল মৃত্তিকাতে (Calcareous soil) ফস্‌ফরিক এসিডের অংশ অধিক এবং গলিত উদ্ভিজ্জযুক্ত মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের অংশ অধিক থাকে। যে সকল মৃত্তিকা গ্রেনাইট (Granite) এবং নাইস (Gneiss) প্রস্তর হইতে উৎপন্ন তাহাতে পটাসের ভাগ অধিক। কিন্তু এই শ্রেণীর মৃত্তিকাতে ফস্‌ফরিক এসিডের অংশ অত্যন্ত অল্প।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাকৃতিক অবস্থা ও উদ্ভিদ্‌-জীবন

মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি কেবল উহার গঠন ও উহার মধ্যে যে সকল উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ আছে তাহার উপরই নির্ভর করে না। স্থানীয় 'আবহাওয়' এবং প্রাকৃতিক অবস্থাও মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা যে "আবহাওয়া" কথাটি ব্যবহার করিলাম, ইহা দ্বারা কোন স্থানের আলোক, বায়ু, তাপ এবং আর্দ্রতা প্রভৃতির কার্য্যকারিতা বুঝিতে হইবে। এই প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ শস্য উৎপন্ন হয়। জমি যতই উর্ব্বরা হউক না কেন, বায়ু, উত্তাপ, জল ও আলো উপযুক্ত পরিমাণে না পাইলে উদ্ভিদ্‌ সতেজ হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, যে বৎসর আকাশ অধিকাংশ সময় মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং সেজন্য জমি রীতিমত সূর্য্যোত্তাপ হইতে বঞ্চিত হয়, সে বৎসর ফসল স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে অনেক বিলম্বে পাকে। আবার যে বৎসর বর্ষাকালে সূর্য্য প্রায় অধিকাংশ সময়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং তজ্জন্য জমি রীতিমত সূর্য্যোত্তাপ হইতে বঞ্চিত থাকে এবং সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হয়, সে বৎসর ফসল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, কারণ উদ্ভিদের শরীরে কার্ব্বনের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, উদ্ভিদ্‌ ঐ কার্ব্বন বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে। আলোক ও উত্তাপের অল্পতা হইলে উদ্ভিদ্‌ তাহা বায়ুমণ্ডল হইতে আহরণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ পদার্থগুলিকে উদ্ভিদের আহার্য্য অবস্থায় পরিণত করিয়া লইবার জন্য বায়ু এবং বৃষ্টির সঙ্গে রৌদ্রের সাহায্যও বিশেষ আবশ্যক। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে বিভিন্ন

প্রকারের শস্য উত্তমরূপে ফলিতে দেখা যায়। সাগরপৃষ্ঠের ৫,০০০ পাঁচ হাজার ফুট উপরে ইক্ষু জন্মিতে পারে না। ইংলণ্ডে আট মাসে গম পাকে, ভারতবর্ষে সাড়ে চার মাসের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু আমেরিকাতে বীজবপনের সময় হইতে এক শত দিবসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। স্থানভেদে শস্যের পরিপূর্ণতা লাভ করার এইরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, আবহাওয়ার পার্থক্যই ইহার মূল কারণ। দেশভেদে আবহাওয়ার পার্থক্য কেন হয় তাহা আমাদিগকে দেখাইতে হইবে। পদার্থবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ স্থানভেদে আবহাওয়ার পার্থক্যের ৯টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) তাপ, (২) সাগরপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার তারতম্য, (৩) সাগরের সহিত দূরত্ব ও নৈকট্যসম্বন্ধ, (৪) প্রবণতা অর্থাৎ ঢালুভাব, (৫) পর্ব্বত, (৬) মৃত্তিকা, (৭) কৃষি-কার্য্য, (৮) বায়ুর গতি এবং (৯) বৃষ্টিপাত।

তাপ।—ভূপৃষ্ঠের তাপ-পরিমাণ গড়ে স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ এক দেশের ভূমির তাপ-পরিমাণ যত, অন্য দেশের ভূমির তাপ তাহা হইতে বেশী, কম অথবা সমানও হইতে পারে। ভূমির উপরিভাগের তাপ প্রধানতঃ তিনটি কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; যথা—সূর্য্যের উত্তাপ, ভূগর্ভের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ এবং রাসায়নিক উত্তাপ। এই তিনটি উত্তাপের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে রাসায়নিক উত্তাপ মৃত্তিকার মধ্যস্থিত উদ্ভিদ্‌ ও জীবদেহের ধ্বংসাবশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকার তাপের তীব্রতা অধিক। ভূমির সচ্ছিদ্রতার আধিক্যের উপর ইহারও আধিক্য নির্ভর করে, কিন্তু এই উত্তাপ অতি ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। সেই জন্য উদ্ভিদ্‌-জীবনে ইহার ক্রিয়া তত স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। দিবাভাগে মৃত্তিকা তাপ গ্রহণ করে এবং রাত্রিতে উহা বাহির করিয়া দেয়। এইজন্য দিবা ও রাত্রিতে মৃত্তিকার উষ্ণতার বিশেষ পার্থক্য হওয়ার কথা, কিন্তু মৃত্তিকার মধ্যস্থিত উত্তাপ আসিয়া ঐ নষ্ট উত্তাপের অভাব আংশিক পূরণ

করিয়া দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মৃত্তিকার উপর-স্তরের অন্ততঃ ৪ ফুট নিম্নে তাপের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

শীতপ্রধান দেশে ৫০।৫৫ হাত নীচে ভূগর্ভের তাপ দিবারাত্র সমপরিমাণ থাকে, অর্থাৎ রাত্রিকালে তাপ-বিকিরণের জন্য ঐ স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায় না অথবা সূর্য্যের উত্তাপের জন্যও উত্তাপ বৃদ্ধি পায় না।

পৃথিবীর উপরিভাগের তাপের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের তাপের পরিমাণ হইতে গড়ে কিছু বেশী। মৃত্তিকার মধ্যস্থ তাপই ইহার কারণ। কিন্তু ভিজা এঁটেল মৃত্তিকা তাহার উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে শীতল, কেন না এই মৃত্তিকা হইতে সর্ব্বদা যে বাষ্প বাহির হইতেছে তাহার জন্য মৃত্তিকার মধ্যে কতক উত্তাপ কার্য্যকারী অবস্থায় থাকে না। ঐ ভূমির জলীয় ভাগ যেমন বাষ্পাকারে উঠিয়া যায়, আবার কৈশিকাকর্ষণের বলে নিম্ন স্তরের জলীয় ভাগ উপরে উঠিয়া আসে। এই জন্যই ঐ ভূমি সম্পূর্ণ শীতল না হইলেও কতক পরিমাণে শীতল হয়।

(ক) বিশিষ্ট উত্তাপ।—সমান আয়তনবিশিষ্ট জল ও মৃত্তিকার তাপের বিষয়ে পরীক্ষা করিলে মৃত্তিকার বিশিষ্ট তাপ ·২ হইতে ·৫ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর সমান ওজনের জল ও মৃত্তিকার মধ্যে মৃত্তিকার আপেক্ষিক উত্তাপ ·১৬ হইতে ৩ পর্য্যন্ত হয়।

যে ভূমির তাপ যত কম, তাপসংযোগে সেই ভূমি তত উত্তপ্ত হয়। বালুকাময় ভূমি কর্দ্দমময় ভূমি অপেক্ষা অধিকতর তাপযুক্ত। এই জন্য সমপরিমাণ সূর্য্যোত্তাপে কর্দ্দমময় ভূমি বালুকাময় ভূমি অপেক্ষা সত্বর উত্তপ্ত হয়। আবার উত্তাপ-ধারণের ক্ষমতাও ভূমির প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সকল ভূমির জলধারণের ক্ষমতা সমান নহে। যে ভূমি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে সেই ভূমির তাপধারণের ক্ষমতাও অধিক। জলের তাপ মৃত্তিকার তাপ হইতে চারি পাঁচ গুণ বেশী; এই জন্যই যে ভূমি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে, সেই ভূমি অধিক

পরিমাণে তাপও ধারণ করিতে পারে। সূর্য্যোত্তাপে সকল মৃত্তিকাই অল্পাধিক উত্তপ্ত হয়; বালুকাময় মৃত্তিকা যে পরিমাণ উষ্ণ হয়, খড়িবহুল ও চূণময় মৃত্তিকা তদপেক্ষা অনেক কম উষ্ণ হয়। এইজন্য উষ্ণপ্রদেশে চূণময় ভূমি থাকিলে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যোত্তাপ কম, সেই জন্য সেই স্থানের মৃত্তিকা কর্দ্দমবহুল। ভিজা মৃত্তিকা স্বভাবতঃই অল্প তাপযুক্ত, সুতরাং সেখানে ঐ ভূমি শৈত্যযুক্ত বলিয়া কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযোগী নহে। আবার উষ্ণ দেশে বালুকাময় ভূমি অত্যন্ত তাপযুক্ত এবং তথায় সূর্য্যের তাপও বেশী। সুতরাং অধিক উষ্ণ বলিয়া কৃষিকার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কর্দ্দমময় ভূমিই কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তাপ-বিকিরণ।—দিবাভাগে মৃত্তিকা সূর্য্যের তাপ গ্রহণ করে। রাত্রিকালে আবার তাপ বিকিরণ করিয়া থাকে। এই তাপ-বিকিরণ কার্য্যটি ভূমির প্রকৃতি অনুসারে সকল স্থানেই অল্পাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সমতল পদার্থ অপেক্ষা অসমতল পদার্থে অল্প সময়েই অধিক তাপ বিকিরণ করে; ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এই জন্য ভিজা মৃত্তিকা অপেক্ষা বালুকাময় মৃত্তিকা সত্বর তাপ বিকিরণ করিয়া থাকে। তাপ-বিকিরণ-শক্তি অল্প বলিয়া ভিজা মাটি স্বভাবতঃই অধিক উত্তপ্ত থাকিবার কথা। কিন্তু প্রায়শঃই তাহা দেখা যায় না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ভূমি হইতেই দিবাভাগে সূর্য্যোত্তাপে জলীয় ভাগ বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠে। ভিজা মাটিতে অধিক পরিমাণে জল-কণা থাকে। অতএব অধিক পরিমাণে বাষ্পও বাহির হয়। এই ক্ষেত্রে ভিজা মাটি নীরস হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঐরূপ মৃত্তিকা যেমন দিবাভাগে নীরস হয়, রাত্রিকালে আবার বায়ুমণ্ডলস্থ জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লইয়া অনেক পরিমাণে আর্দ্রতা রক্ষা করে, তাহাতেই উক্ত ভূমি শীতল থাকিয়া যায়। মাটির কৈশিকাকর্ষণ-শক্তিও মাটিকে শীতল রাখিবার অন্যতম

কারণ। যে পদার্থের তাপ-বিকিরণ-শক্তি প্রবল, সেই পদার্থের তাপ-সংরক্ষণ-শক্তিও কম; কাজেই সেই পদার্থ অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যত উত্তমরূপে চূর্ণিত হয়, তাহা তত শীঘ্র তাপ বিকিরণ করে; সুতরাং অধিক জল সংরক্ষণ করিতে না পারিয়া অল্প সময়েই শীতল হইয়া যায়। আবার প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আবৃত ভূমি ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে; সুতরাং অধিক তাপ সংরক্ষণের জন্য তাহা বিলম্বে শীতল হয়। জলের তাপ-পরিচালন-শক্তি কম, এই জন্যই সূর্য্যোত্তাপে অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা জল বিলম্বে উত্তপ্ত হয়। আবার উহার তাপ-বিকিরণ-শক্তি কম থাকায় উত্তপ্ত হইলে শীতল হইতে অধিক সময় লাগে। সুতরাং জল অথবা জলযুক্ত আর্দ্র মৃত্তিকার তাপ দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে প্রায় সমান ভাবেই থাকে। জলের এই শক্তি থাকায় এদেশের ভূমিতে জলসেচনের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে দিবাভাগে ও রাত্রিকালে তাপের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে, এইরূপ তাপের সমতা থাকায় ঐ সময়ে অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই সতেজ হয়। আবার পৌষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত কয়েক মাসে দিবা ও রাত্রিতে তাপের বিশেষ বৈলক্ষণ্য অনুভব করা যায়, ঐ সময়ে অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই নিস্তেজ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, তাপের পরিমাণের সমতা উদ্ভিদ্‌-জীবনের বিশেষ উপযোগী। উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল হইতে যতই বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, উদ্ভিদ্‌ ততই সতেজ দৃষ্ট হয়। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থানের দিবা ও রাত্রির তাপের সমতা ইহার একমাত্র কারণ।

ভূমিতে সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হইলে তাহার তাপ অধিক এবং বক্রভাবে ভূমির সহিত সূক্ষ্মকোণ করিয়া পতিত হইলে তাহার তাপ অপেক্ষাকৃত কম হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে অর্থাৎ বিষুবরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়। তাহার পর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সূর্য্যকিরণ

ক্রমশঃই অধিক বক্রভাবে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং শেষোক্ত স্থানসমূহে সূর্য্যের উত্তাপ কম।

ভূপৃষ্ঠে কি অবস্থাতে সূর্য্যের উত্তাপ কি পরিমাণে পতিত হয়, ফরাসীদেশীয় বুগার নামক জনৈক পণ্ডিত তাহা নিম্নলিখিতরূপ ঠিক করিয়াছেন।

সাধারণতঃই সূর্য্যরশ্মি বক্রভাবে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। যখন মধ্যাহ্নে সূর্য্য মাথার উপরে থাকে তখন যদি ১০,০০০ রশ্মি পৃথিবীর দিকে আসিতে থাকে, তবে তাহার মধ্যে কেবল ৮,১২০টি রেখা আসিয়া পৃথিবীতে উপনীত হয়, অবশিষ্টগুলি বায়ুতে লুপ্ত হইয়া যায়। সূর্য্য মাথার উপরে না থাকিয়া ৫° ডিগ্রী পরিমাণ ঢালু অবস্থায় থাকিলে ৭,০২৪টি কিরণরেখা মাত্র পৃথিবীতে পৌছায়। ৭° ডিগ্রী ঢালু থাকিলে ২,৮৩১টি মাত্র ভূপৃষ্ঠে আগত হয়। ৯° ডিগ্রী অর্থাৎ চক্রবালের নিকট সূর্য্য থাকিলে অর্থাৎ উদয় এবং অস্তের সময়ে ৯,৯৯৫টি রশ্মি নষ্ট হইয়া মাত্র ৫টি রেখা ভূপৃষ্ঠে উপনীত হইয়া থাকে। উদয় এবং অস্তের সময়ে সূর্য্য এই কারণেই নিস্তেজ দেখায়। যে ভূমি আদ্র সেই ভূমিতে যদি সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় তাহা হইলে সূর্য্যোত্তাপে ঐ ভূমিতে অধিক শস্য উৎপাদিত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্যকিরণ বক্রভাবে পতিত হয়, সুতরাং জমি ঢালু না হইলে উহাতে লম্বভাবে সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর উত্তর অর্দ্ধাংশের ভূমি দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইলে সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হওয়া সম্ভবপর হয়। সুতরাং ঐ সকল স্থানের কৃষিক্ষেত্র তদনুযায়ী ঢালু হওয়া বিধেয়। কিন্তু আর একটি বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ভূমির প্রবণতা বা ঢালুভাব আমাদের দেশের উপযোগী নহে, কেন না—ক্রম-নিম্ন ভূমিতে জল-নিঃসরণের সুবিধা হইয়া থাকে, তাহাতে জমি সহজে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদেশে শস্যোৎপাদনের জন্য ভূমি সর্ব্বদা আর্দ্র থাকা প্রয়োজন। এই জন্যই ভারতবর্ষে সমতল ভূমি শস্যোৎপাদনের উপযোগী।

সাগরপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা।—যে দেশ সাগরপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চ, তাহার উষ্ণতা সেই অনুপাতে কম হইয়া থাকে। এমন কি গ্রীষ্মমণ্ডলে যেখানে সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর সেখানেও সাগরপৃষ্ঠ হইতে ১৫,০০০ পনের হাজার ফুট্ উপরে বার মাসই বরফ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই প্রকার স্থানে উচ্চতার তারতম্য অনুসারে উষ্ণতারও তারতম্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শস্যও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

সাগরপৃষ্ঠ হইতে দূরত্ব।—ভূমির উচ্চতা এবং নিম্নতার উপর কৃষি-কার্য্যের আরও দুই একটি বিষয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। নিম্ন স্থানে বৃষ্টিপাতজনিত প্রচুর পরিমাণে এমোনিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিন্তু নাইট্রিক এসিড অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে সঞ্চিত হয়। যদিও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বত্র বিরাজ করে তথাপি বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম প্রদেশে মেঘ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার জন্য উক্ত নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে নাইট্রেটে পরিণত হইয়া যায়। অপর পক্ষে সাগরপৃষ্ঠ হইতে দূরত্বের তারতম্য অনুসারে মৃত্তিকাগঠনেরও তারতম্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নদী পর্ব্বত হইতে বাহির হইবার সময়ে যে সকল প্রস্তরখণ্ড বহিয়া আনে, তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উহার বর্ষাপ্লাবিত উভয় তীরে ছড়াইয়া পড়ে। প্রস্তরের স্থূলভাগগুলি গুরুত্ব-নিবন্ধন নদীর উৎপত্তিস্থানের নিকটে রহিয়া যায় এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশসমূহ দূর হইতে দূরতর ভূভাগে পতিত হয়। এই নিমিত্তই সাগর-তীরস্থ ভূভাগের মৃত্তিকার দানাগুলি সূক্ষ্ম এবং যতই স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া যায় মৃত্তিকার দানা উহার অনুপাতে স্থূলতর হইতে দেখা যায়।

প্রবণতা।—সূর্য্যরশ্মি-পতনের যে প্রণালী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহা দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে, প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন দেশের উষ্ণতার পার্থক্য হইয়া থাকে। যে যে দেশ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ঢালু, সে সকল দেশে অধিক রৌদ্র পতিত হয়, সেই জন্যই ঐ সকল দেশ অধিক উষ্ণ। যে সকল দেশের পশ্চিম ও উত্তর দিক্ ঢালু, সেখানে সূর্য্যরশ্মি অতি অল্প পরিমাণে পতিত হয়। সেই কারণেই

ঐ সকল দেশ অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল। ঢালের তারতম্য অনুসারে স্থানের উষ্ণতার তারতম্যজনিত উৎপন্ন শস্যের বিশেষ পার্থক্য হইয়া থাকে।

পার্ব্বত্য ও সমতলভূমি।—বায়ুর সহিত যে বাষ্প মিশ্রিত থাকে তাহা পার্ব্বত্য প্রদেশে উচ্চ পর্ব্বতের সংস্পর্শে আসিয়া শৈত্যাধিক্য-হেতু জলে পরিণত হয় এবং এই জল বৃষ্টিরূপে পর্ব্বতের মূলদেশ প্লাবিত করিয়া দেয়। পর্ব্বতসকল বায়ুর গমনাগমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এই জন্য বায়ু-চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত নানা প্রতিবন্ধক-বশতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে ভাল শস্য জন্মিতে পারে না।

মৃত্তিকা।—পৃথিবীর সকল স্থানেই এক প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় না; কোথাও বা শুষ্ক বালুকাময় ভূমি, আবার কোথাও বা আর্দ্র কর্দ্দমময় ভূমি দৃষ্ট হয়। বালুকাময় ভূমিতে বৃষ্টিপাত হইলে তখনই তাহা মাটির ভিতরে চলিয়া যায় এবং সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা বালুকা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া বায়ুকেও উত্তপ্ত করিয়া ফেলে। আফ্রিকার ভীষণ বালুকাময় মরুভূমি তথাকার অত্যধিক উষ্ণতার প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে, আর্দ্র ও কর্দ্দমময় মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাত হইলে তাহা ঐ মৃত্তিকা সহজে শোষণ করিতে পারে না। মৃত্তিকার এইরূপ বিভিন্ন স্বভাব দ্বারা ঐ সকল মৃত্তিকাজাত ফসলেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য।—কৃষিকার্য্য দ্বারা দেশের নানা প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে বায়ু-চলাচলের সুবিধা হয়। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য নদীর তীর-ভূমিতে উচ্চ বাঁধ বাঁধিতে হয়, তাহার ফলে অতিরিক্ত জলপ্লাবন দ্বারা দেশের অকল্যাণ হইতে পারে না।

বায়ুর গতি।—বায়ুর গমনাগমন দ্বারা স্থানীয় আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ যেরূপ বায়ু যে প্রদেশের উপর

দিয়া গমনাগমন করে সেই সকল প্রদেশের আবহাওয়া ঐ প্রবাহিত বায়ুর ভাবাপন্ন হয়। যেমন সাগরীয় বায়ু নাতিশীতোষ্ণ; এই বায়ু যে প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় সে দেশে কখনও অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না। আবার মরুভূমি হইতে সঞ্চালিত বায়ু যে সকল প্রদেশের উপর দিয়া গমন করে সেইসকল প্রদেশে সর্ব্বদাই উষ্ণতার আধিক্য বর্ত্তমান থাকে। পার্ব্বত্য বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক এবং শীতল; এই বায়ু যে প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে সেই প্রদেশ সর্ব্বদাই শীতপ্রধান থাকিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে—যে ভাবাপন্ন বায়ু যে প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই প্রদেশ সেই বায়ুর ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং শীত এবং উষ্ণতার পার্থক্যভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ শস্য জন্মিবে।

বৃষ্টিপাত।—বৃষ্টিপাত দ্বারাও মৃত্তিকার গঠনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাত দ্বারা অনাবৃত ভূমির অর্থাৎ যে ভূমি তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত নহে, সে সকল স্থানের মাটির কাঠিন্য ধুইয়া বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে যে পরিমাণে এবং যেরূপ পর্য্যায়ে বৃষ্টিপাত হয় সেই স্থানের আবহাওয়া এবং শস্যাদি তদনুসারে নিয়মিত হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃষ্টিপাতের সাময়িকতা, অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টিপাত, এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর শস্যের শুভাশুভ নির্ভর করে। মালাবার উপকূল ও আসামের অনেক স্থলে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশী। সেই সকল স্থানে শস্যও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে, উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশস্থ স্থানসমূহে, পূর্ব্ব- ও পশ্চিম-ঘাট প্রভৃতি স্থানে অধিক বৃষ্টি হয়; ঐসকল প্রদেশ ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শস্যশালী। ইহা দ্বারা সহজেই প্রমাণ হয় যে, বৃষ্টিপাতের আধিক্য শস্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বৃষ্টিপাতসম্বন্ধে স্থলভেদে অনেক আশ্চর্য্যজনক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া

যায়। ভূবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী সে বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন নিম্নে তাহার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

যে স্থলে যত বাষ্প উত্থিত হয় বৃষ্টির আধিক্য সেই স্থলে তত অধিক। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে বৃষ্টিপাত তদপেক্ষা অল্প এবং হিমমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। নিম্নভূমি অপেক্ষা উচ্চভূমিতে বৃষ্টির পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে এবং পর্ব্বত-গাত্রে যে স্থল অত্যন্ত ঢালু সে স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে উপত্যকাপ্রদেশে বৃষ্টির পরিমাণ অল্প। পরস্পর-সন্নিহিত ইরান ও মাজেন্দ্রান দেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। ইরান দেশ উপত্যকাভূমি, সেখানে বৎসরে দুই এক দিন ব্যতীত আকাশে প্রায়ই মেঘ দৃষ্টিগোচর হয় না। শেষোক্ত মাজেন্দ্রান অধিত্যকা ভূমি, সেখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে স্বভাবতঃ গ্রীষ্ম এবং বর্ষাতেই বৃষ্টিপাত হয় এবং স্থলভেদে ইহার বৈলক্ষণ্য আছে। কোন স্থলে সমগ্র বর্ষব্যাপী অল্প পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং কোথাও বা বৎসরের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টিপতন শেষ হইয়া যায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলের নিরক্ষরবৃত্তের উত্তরাংশে উত্তরায়ণসময়ে এবং দক্ষিণাংশে দক্ষিণায়নসময়ে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল—এই তিন দেশের উত্তরভাগে, শিশিলী এবং মাদেরা দ্বীপের সর্ব্বত্র, আফ্রিকার উত্তরাংশে, সমগ্র গ্রীস্‌দেশে এবং এসিয়ার উত্তরাংশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার দক্ষিণভাগে বর্ষা এবং শীত এই উভয় কালেই বৃষ্টি হয়। কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দ্বাদশ বৎসর অন্তর ক্রমাগত তিন বৎসর তথায় মোটেই বৃষ্টিবারি পতিত হয় না। ফলে সেই স্থানে তখন ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু শীতমণ্ডলে

তাহার বিপরীত। হিমমণ্ডলস্থিত সিট্‌কা নামক দ্বীপে বৎসরে গড়পরতা ৪০ দিবস আকাশ নির্ম্মেঘ থাকে। অবশিষ্ট সময়ে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প যে, আমাদের দেশে ২৪ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে বৎসরে যত বৃষ্টি হয় ইহা তাহার $\frac{1}{8}$ অংশও হইবে না।

এই পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কোন কালেও বৃষ্টি হয় না, বা কদাচিৎ কোন বৎসর দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভৌগোলিক এই সকল স্থানকে "নির্বর্ষ দেশ" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাহারা মরুভূমি, গবী মরুভূমি, আরব দেশের মধ্যভাগ, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি ভূভাগ এই শ্রেণীভুক্ত।

দেশভেদে উল্লিখিতরূপে সাময়িক এবং পরিমাণগত বৃষ্টিপাতের বৈষম্যে সে স্থানীয় আবহাওয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শস্যেরও বৈলক্ষণ্য জন্মিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

এই বিশাল জগতে যে কত প্রকার উদ্ভিদ্ বর্ত্তমান আছে তাহার ইয়ত্তা করা একপ্রকার মানবশক্তির বহির্ভূত। অদ্যাপি উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার প্রকারের গাছগাছড়ার বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন—এতদ্ব্যতীত যে সকল গাছগাছড়া পর্ব্বত ও অরণ্যে মানবগণের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যাও সামান্য নহে,—এই দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার গাছ চিনিয়া রাখা বা এইগুলির নাম স্মরণ করিয়া রাখা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার, এমন কি যাহারা সর্ব্বদা উদ্ভিদ্-তত্ত্ব চর্চ্চা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই কার্য্য সম্ভবপর নহে। কাজেই এইগুলিকে আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে না পারিলে উদ্ভিদ্-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে নানাপ্রকার অসুবিধার কারণ হয়।

মানবগণের জাতি, বংশ, শ্রেণী ইত্যাদির মধ্যে যেরূপ পূর্ব্বপুরুষের রক্তের সংস্রব বর্ত্তমান রহিয়াছে উদ্ভিদ্গণের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধেও সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষের ধারা অনুসৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগানুযায়ী বংশগত নাম হইতে যে-কোন একটা গাছের আকৃতি ও প্রকৃতি সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায় এবং ইহাই উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা সচরাচর যে সকল বৃক্ষলতাদি দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সঙ্গে কতকগুলির আকৃতি ও প্রকৃতিগত এমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে, যদ্দ্বারা উহাদিগকে এক-বংশসম্ভূত বলিয়া মনে হয়।

উল্লিখিত একই আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট গাছগুলির সমষ্টির নাম জাতি (Genera)। লাটিন ভাষায় উপজাতি (Species)-গত নামের পূর্ব্বে জাতি (Genera)-গত নাম সংযোগ করিয়া গাছের পূর্ণ নামকরণ হয় ; যেমন বট ও অশ্বত্থের উপজাতি (Species)-গত নাম পৃথক্ হইলেও তাহাদের উভয়ের জাতিগত (Generic) ফাইকাস (Ficus) নামটি পূর্ব্বে সংযুক্ত করিয়া বটের নাম হইয়াছে ফাইকাস বেঙ্গলেন্‌সিস (Ficus Bengalensis), এবং অশ্বত্থ বা পিপুলগাছের নাম হইয়াছে ফাইকাস রিলিজিওসা (Ficus Religiosa)।

যে সকল জাতির (Genera) মধ্যে অল্পাধিক সামঞ্জস্য আছে সেইগুলিকে লইয়া বর্গ (Natural order) গঠিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি বর্গ লইয়া এক একটি উপশ্রেণী (Sub-class), এইরূপ কয়েকটি উপশ্রেণী (Sub-class) লইয়া একটি শ্রেণী (Class), কয়েকটি শ্রেণী লইয়া একটি গণ (Division) এবং কয়েকটি গণ (Division) লইয়া এক একটি মণ্ডলীর (Group) সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নলিখিত ক্রমিক তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগের ধারা সহজে উপলব্ধি হইবে :—

মণ্ডলী (Group)
|
গণ (Division)
|
শ্রেণী (Class)
|
উপশ্রেণী (Sub-class)
|
প্রাকৃতিক বর্গ (Natural order)
|
জাতি (Genera)
|
উপজাতি (Species)
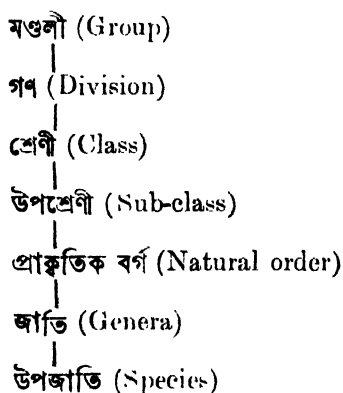
উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সমগ্র উদ্ভিদ্-জগৎকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) সপুষ্পক (Phanerogams) এবং

(২) অপুষ্পক (Cryptogams) ; অর্থাৎ যাহাদের ফুল আছে এবং যাহাদের ফুল নাই।

সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) গুপ্তডিম্বক (Angiosperms) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের বীজ মাতৃকোষের (Ovary) মধ্যে থাকে, যেমন—আম, জাম, নারিকেল ইত্যাদি ; এবং (২) ব্যক্তডিম্বক (Gymnosperms) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের বীজ মাতৃকোষের ভিতরে থাকে না, যেমন—পাইন গাছ (Pine), বিলাতী ঝাউ, চিড় ইত্যাদি।

গুপ্তডিম্বক (Angiosperms) উদ্ভিদ্ আবার একদল-বীজ (Monocotyledon) এবং দ্বিদল-বীজ (Dicotyledon) ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ধান, গুপারী, খেজুর ইত্যাদি একদল-বীজপর্য্যায়ের এবং আম, তেঁতুল, সিম ইত্যাদি দ্বিদল-বীজ-পর্য্যায়ভুক্ত। অপুষ্পক (Cryptogams) উদ্ভিদ্‌গুলিকে কি ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহা পরে পরিদৃষ্ট হইবে।

উল্লিখিত দ্বিদল-বীজ (Dicotyledon) উদ্ভিদ্‌কে প্রকৃতিভেদে চারিটি উপশ্রেণীতে (Sub-class) বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

(১) আধারপুষ্পী (Thalamiflorae) জলপদ্ম, চালিতা, নাগকেশর, জবা, কাপাশ, পাট ইত্যাদি এই জাতীয়।

(২) কুণ্ডাধারপুষ্পী (Calyciflorae)—কৃষ্ণচূড়া, হিমসাগর, ষ্ট্রবেরি, পানিলাজুক ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

(৩) যুক্তদলপুষ্পী (Gamopetalae)—ধুতুরা, বকুল, আকন্দ, নয়নতারা, মালতী ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

(৪) অপূর্ণজপুষ্পী (Incompletae) পুনর্নবা, আপাঙ্গ, মোরগফুল, ভেরেণ্ডা, মুক্তাঝুরী, পিটুলী প্রভৃতি এই জাতীয়।

এই চারিটি উপশ্রেণীর আবার প্রত্যেকটিরই বর্গ (Natural order), জাতি (Genera) এবং উপজাতি (Species) আছে, যেমন—প্রথম উপশ্রেণীর প্রধান ৪৪টি বর্গ, দ্বিতীয় উপশ্রেণীর প্রধান

২৪টি বর্গ, তৃতীয় উপশ্রেণীর প্রধান ৩২টী বর্গ এবং চতুর্থটির প্রধান ২১টি বর্গ। প্রথম উপশ্রেণীর অন্তর্গত ৪৪টি বর্গের মধ্যে কয়েকটির নাম করা হইল; যেমন—আতাবর্গ (Anonaceæ)—আতা, নোনা, কাঁটালীচাঁপা, দেবদারু ইত্যাদি লইয়া গঠিত; আফিংবর্গ (Papaveraceæ)—পোস্ত, শেয়ালকাঁটা ইত্যাদি লইয়া গঠিত; সর্ষপবর্গ (Cruciferæ)—সরিষা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, মূলা প্রভৃতি লইয়া গঠিত; জবাবর্গ (Malvaceæ)—জবা, ঢেঁড়স, স্থলপদ্ম, কাপাস, মেস্তাপাট, শিমূল ইত্যাদি লইয়া গঠিত; পাটবর্গ (Tiliaceæ)—পাট, রুদ্রাক্ষ, ফলশা প্রভৃতি লইয়া গঠিত; আমবর্গ (Anacardiaceæ)—আম, হিজলীবাদাম, আমড়া ইত্যাদি লইয়া গঠিত।

এইরূপ কুণ্ডাধারপুষ্প নামক উপশ্রেণীর ২৪টির ভিতর চারিটি প্রধান বর্গের নাম করা হইল, যথা—

(১) সিম্বিবর্গ (Leguminosæ)—ইহার ভিতর আবার তিনটি উপবর্গ আছে,

(ক) মটরজাতীয় (Papilionaceæ)—ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, মাসকলাই, খেসারী, মাখমসিম, বরবটি, চিনের বাদাম, শাঁখআলু, ধইঞ্চা ইত্যাদি এই উপবর্গাধীন।

(খ) কৃষ্ণচূড়াজাতীয় (Cæsalpiniea)—কৃষ্ণচূড়া, কালকাসন্দ, অশোক, তেঁতুল ইত্যাদি এই উপবর্গের অন্তর্গত।

(গ) লজ্জাবতীজাতীয় (Mimoseæ)—পানিলাজুক, লজ্জাবতী, বাবলা, শিরীষ, ইত্যাদি এই উপবর্গের অধীন।

(২) কুমড়াবর্গ (Cucurbitaceæ)—এই বৃহৎ বর্গাধীন নিম্নলিখিত কয়েকটি গাছের নাম করা যাইতে পারে, যথা—শশা, তরমুজ, লাউ, বিলাতীকুমড়া, চালকুমড়া, পটল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুঁধুল, কাঁকুড়, করলা ইত্যাদি।

(৩) পেয়ারাবর্গ (Myrtaceæ)—এই বর্গে নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্‌গুলি আছে—পেয়ারা, গোলাপজাম, জামরুল, লবঙ্গ ইত্যাদি।

(৪) ছত্রবর্গ (Umbelliferæ)—এই বর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্‌গুলির নাম করা যাইতে পারে, যথা—গাজর, যোয়ান, মৌরী, জিরা, হিং, ধনিয়া ইত্যাদি।

যুক্তদলপুষ্পী উপশ্রেণীর ৩২টি বর্গের ভিতর কেবল চারিটি বর্গের নাম উল্লিখিত হইল, যথা—

(১) মণ্ডলবর্গ (Compositæ)—হাতিচোখ, গাঁদা, সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, সরগুজা ইত্যাদি এই বর্গাধীন।

(২) আলুবর্গ (Solanaceæ)—এই বর্গের ভিতর উল্লেখযোগ্য আলু, বেগুন, বিলাতী বেগুন, টেপারী, তামাক, লঙ্কা ইত্যাদি।

(৩) তুলসীবর্গ (Labiatæ)—তুলসী, পুদিনা ইত্যাদি এই বর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(৪) কলমীবর্গ (Convolvulaceæ)—রাঙ্গা আলু কলমী শাক, চিনের আলু, ভুঁইকুমড়া এই বর্গাধীন।

অপূর্ণজপুষ্পী উপশ্রেণীর ২১টি বর্গের ভিতর ডাঁটাবর্গ (Amarantaceæ), পুঁইবর্গ (Chenopodiaceæ), রেড়ীবর্গ (Euphorbiaceæ), পানবর্গ (Piperaceæ), এবং ডুমুরবর্গ (Urticaceæ) প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ডাঁটাবর্গের অধীন—নটে শাক, আপাঙ্গ, ডেঙ্গোডাঁটা, মোরগফুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পুঁইবর্গের ভিতর—পুঁই শাক, পালং শাক, বিট পালঙ্গ, বেথো শাক ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

পানবর্গের ভিতর—পান, কাবাব চিনি, গোলমরিচ, চৈ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রেড়ীবর্গের অন্তর্গত—ভেরেণ্ডা, আমলকী, মনসা, আখরোট, বিছুটী ইত্যাদি।

ডুমুরবর্গের অধীন—ডুমুর, বট, অশ্বত্থ, কাঁটালগাছ, মাদার, গাঁজা, পাকুড়, শেওড়া ইত্যাদি।

দ্বিদল-বীজ (Dicotyledon) উদ্ভিদ্‌গুলিকে যেমন উল্লিখিত ৪টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, একদল-বীজ (Monocotyledon) উদ্ভিদ্‌গুলিকেও তেমন প্রকৃতিগত তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত পৃথক্ ৩টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—

(১) দলপুষ্পী (Petaloideæ)—রসুন শতমূলী, উলটচণ্ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই উপশ্রেণীর ভিতর কেবল একটি বর্গের নাম করা হইল, যথা—রসুনবর্গ (Liliaceæ)। ইহার উদাহরণ—রসুন, পেঁয়াজ, উলটচণ্ডাল, ঘৃতকুমারী, শতমূলী। এই উপশ্রেণীর মধ্যে কদলীবর্গ (Scitamineæ) অত্যন্ত বৃহৎ বর্গ বলিয়া উল্লেখযোগ্য; কলা, আদা, হলুদ, আমআদা ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত।

(২) মঞ্জরীপুষ্পী (Spadicifloræ)—গজপিপ্পলী, হোগলা, ক্ষুদেপানা, কচু, কেয়া, তাল, খেজুর, নারিকেল ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই উপশ্রেণীর অন্তর্গত বর্গের ভিতর কেবল দুইটি বর্গের নাম করা হইল, যথা—তালবর্গ (Palmaceæ), উদাহরণস্বরূপ নারিকেল, গুপারী, তাল, খেজুর প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে; এবং কচুবর্গ (Araceæ), ইহার অন্তর্ভুক্ত কচু, মানকচু, গজপিপ্পলী, ক্ষুদেপানা ইত্যাদি।

(৩) তুষচ্ছদপুষ্পী (Glumiferæ)—ধান, গম, ভুট্টা, চিনা, ভুরা, কাউন, উলু, মুথা, দূর্ব্বা, কুশ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই উপশ্রেণীর মধ্যে তৃণবর্গ (Graminaceæ) সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, যব, চিনা, কোদো, আখ, বাঁশ, উলুঘাস ইত্যাদি এই বর্গাধীন।

সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌গণের শ্রেণীবিভাগসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল; এই সকল বর্গই আবার জাতি (Genera) এবং উপজাতিতে (Species) বিভক্ত হইয়াছে। এখন অপুষ্পক উদ্ভিদসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌গুলি প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা :—(ক) সমাঙ্গ (Thalophyte) উদ্ভিদ্। এইসকল উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড পৃথক্ করা যায় না। (খ) শিলাবল্ক (Bryophyte) উদ্ভিদ্। (গ) পূর্ণাঙ্গ (Pterydophyte) উদ্ভিদ্।

(ক) সমাঙ্গ (Thalophyte) উদ্ভিদ্‌কে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) জীবাণুবর্গ (Schizomycetes) ; জীবাণুসকল (Bacteria) এই বর্গের অধীন (জীবাণু অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম সপত্রহরিৎবর্গ (Algae), অর্থাৎ যাহাদের গায়ে পত্রহরিৎ বর্ত্তমান থাকায় সাধারণতঃ সবুজবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন বিভিন্নজাতীয় শেওলা। (৩) অপর শ্রেণীর নাম ছত্রাকবর্গ (Fungi) বা ভূমিছত্র (বেঙ্গের ছাতা) জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহাদের শরীরে পত্রহরিৎ বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া ইহারা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ হয়। ইহারা কখনও সবুজবর্ণ হয় না।

(খ) শিলাবল্ক (Bryophyte) উদ্ভিদ্‌কে 'মস' (Moss) ও 'লিভারওয়ার্ট্‌স্' (Liverworts) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(গ) পূর্ণাঙ্গ (Pterydophyte) উদ্ভিদের উদাহরণ 'ফার্ন,' 'সেলাজিনেলা' প্রভৃতি।

এখন প্রত্যেক বিভাগ কি ভাবে করা হইয়াছে তাহা পরপৃষ্ঠার ক্রমিকলতাটি হইতেই বুঝা যাইবে।

মন্তব্য :— একদলবীজ- ও দ্বিদলবীজ-শ্রেণীভুক্ত প্রতি উপশ্রেণীর আবার বর্গ, জাতি ও উপজাতি হিসাবে বিভাগ করা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

উদ্ভিদ্‌-প্রজনন-প্রণালী

বিবিধ প্রকারে উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন করাই উদ্ভিদ্‌-প্রজননের (Plant Breeding) প্রধান উদ্দেশ্য। মানবগণ আহার, পরিধান এবং বাসগৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণের জন্য প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে; এই নিমিত্তই স্মরণাতীত কাল হইতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য মানবজাতি উদ্ভিদের চাষ করিয়া আসিতেছে এবং ইহারই ফলে মানবের প্রয়োজনীয় বিবিধ উদ্ভিদ্‌ উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইয়া যুগে যুগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশের লোক অধিকাংশই নিরামিষাশী এবং বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যই অধিক। এই সকল কারণ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের দিকে কৃষকগণের তেমন দৃষ্টি নাই। অবশ্য অধিক মূল্যের বীজ কিনিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। দারিদ্র্যই ইহার একমাত্র কারণ। এই হেতু এদেশে প্রতীচ্যের ন্যায় উন্নত প্রণালীর বীজ উৎপাদনের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ বাজারে যে সকল বীজ পাওয়া যায় তাঁহা অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ, এবং ঐ সকল বীজের ফলনও অধিক নয়। ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশের দ্রব্যের ন্যায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় না। এইপ্রকার নানাকারণে ভারতের কৃষি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাতে রহিয়াছে। ফসলের উন্নতির চেষ্টা করা দেশের উন্নতিকামী প্রত্যেক অধিবাসীরই অবশ্যকর্ত্তব্য। উদ্ভিদের উন্নতিকল্পে বর্ত্তমান যুগে যে সকল পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ঐ সকল পদ্ধতির মধ্যে যে সকল সত্য

নিহিত আছে এবং ঐসকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে সকল ফল লাভ করা গিয়াছে তদ্বিষয় নিম্নে আলোচিত হইল।

ফসলের উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত কয়েকটি মূল নীতি প্রচলিত আছে; ঐ নীতিগুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, যে-কোন প্রকার উদ্ভিদের উন্নতি-সাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া সহজসাধ্য হইবে। ঐ মূল নীতিগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত:—(১) নির্ব্বাচন (Selection), (২) সঙ্কর-উৎপাদন (Hybridisation)।

নির্ব্বাচন (Selection)

উদ্ভিদ্‌জাতির মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য (Variation) বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ উহারা একটি হইতে অপরটি অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র, এবং এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই ইহাদিগকে মণ্ডলী (Group or Family), গণ (Natural order), শ্রেণী (Genus), উপশ্রেণী (Species) প্রভৃতি নানাবিধ বিভাগে বিভক্ত করা যায়। পাট এবং ধানের গাছ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেই নিমিত্তই উহাদিগকে দুইটি পৃথক্ গণের (Natural order) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সকল পাটের গাছ এবং সকল প্রকার ধানের গাছ ঠিক একরূপ নহে, তথাপি যে-কোন প্রকার ধানের গাছকে এবং যে-কোন প্রকার পাটের গাছকে চিনিয়া লওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই এই প্রভেদ অতি সামান্য কিন্তু উহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই পুরুষানুক্রমে প্রবর্ত্তিত স্থায়ী প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকাতে একই জাতির বহু প্রকার ভেদ চিনিয়া লওয়া যায়। উহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রভেদ তত্ত্বানুসন্ধান-কারীদিগের দৃষ্টিপথ এড়াইতে পারে না। কোন বিশেষ জাতীয় পাট অথবা ধান্যের ক্ষেত্র পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্ষেত্রের সমস্ত পাটের গাছ কিংবা সমস্ত ধানের গাছ ঠিক একরূপ নহে। কোনও অবিমিশ্র কার্ত্তিক শাইল ধানের ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তজ্জাত ধানের গাছগুলির মধ্যে কোনটির ঝাড়

বড় এবং কোনটির বা ছোট, আবার কোনটির শীষে ধানের সংখ্যা অধিক এবং কোনটিতে বা ধানের সংখ্যা কম। এইরূপ আরও অনেক অল্প-বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

একই জাতীয় ধানের গাছের মধ্যে এই যে পরস্পর পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, উদ্ভিদের উৎকর্ষসাধক বৈজ্ঞানিকগণের নিকট ইহা অতিশয় মূল্যবান্। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিভিন্ন জাতীয় ধানের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা পুরুষানুক্রমে স্থায়িভাবে প্রবর্ত্তিত; কিন্তু এই একই জাতীয় ধানের গাছের মধ্যে যে পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হয় ইহা স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই প্রকারেরই হইতে পারে। যদি এই পার্থক্য অস্থায়ী বা পরিবর্ত্তনশীল হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষে সে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু যদি তাহা স্থায়ী ও প্রকৃতিগত হয়, তাহা হইলে পুরুষানুক্রমে তাহা প্রবর্ত্তিত হইতেই থাকিবে। এই একই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্য হইতে পরস্পর পুরুষানুক্রমে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে প্রবর্ত্তনক্ষম গাছগুলিকে পৃথক্ করিয়া লওয়ার নামই নির্ব্বাচন।

নির্ব্বাচন বিভিন্ন প্রকারে করা যাইতে পারে; যথা—(১) সঙ্ঘ-নির্ব্বাচন (Mass Selection), (২) একক-নির্ব্বাচন (Single Plant Selection), (৩) অযৌন-নির্ব্বাচন (Vegetative Selection), (৪) মুকুল-নির্ব্বাচন (Bud Selection)।

(১) সঙ্ঘ-নির্ব্বাচন

কোন এক বিশিষ্ট জাতীয় শস্যের ক্ষেত্র হইতে উল্লিখিত প্রথা অনুসারে এমন কতকগুলি গাছ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে যাহাদের পার্থক্য ক্ষেত্রের অন্যান্য গাছ হইতে স্পষ্টতর, অথচ ঐ পার্থক্য ঐ শস্যের উৎকর্ষসাধন-পক্ষে অনুকূল। এইরূপে নির্ব্বাচিত গাছগুলির বীজ একত্র করিয়া ক্ষেত্রে বপন করিলে তজ্জাত শস্য প্রথম পুরুষে নির্ব্বাচিত শস্যের তুল্য-গুণবিশিষ্ট হওয়াই সম্ভব। এইরূপ নির্ব্বাচন-প্রথা পুরুষানুক্রমে অবলম্বন করিলে অর্থাৎ প্রথম পুরুষের শস্য হইতে ঐ প্রথা অনুযায়ী

নির্ব্বাচন করিয়া দ্বিতীয় পুরুষের জন্য বীজ-বপন এবং দ্বিতীয় পুরুষ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া তৃতীয় পুরুষের জন্য বীজ-বপন, এইভাবে বংশপরম্পরা নির্ব্বাচন-প্রথা অবলম্বন করিয়া চাষ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়; কিন্তু এই নির্ব্বাচন-প্রথা কিছুকাল বন্ধ করিয়া দিলে আর সুফল পাওয়া যায় না। কারণ, প্রথম হইতেই নির্ব্বাচিত গাছগুলির মধ্যে যেগুলিতে অস্থায়ী পার্থক্য ছিল তাহা পুরুষানুক্রমে প্রবর্ত্তিত না হইয়া অপকৃষ্ট ফল প্রদান করিবে এবং যেগুলিতে স্থায়ী পার্থক্য বর্ত্তমান ছিল তাহা বংশানুক্রমে প্রবর্ত্তিত হইলেও অস্থায়ী ফলপ্রদগুলির সহিত মিশ্রণের ফলে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে সঙ্ঘ-নির্ব্বাচন (Mass Selection) প্রথা অনুসরণ না করিয়া একক-নির্ব্বাচন (Single Plant Selection) দ্বারা উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন করা হয়।

(২) একক-নির্ব্বাচন

এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমতঃ সঙ্ঘনির্ব্বাচন-প্রথার নিয়মানুযায়ী কতকগুলি গাছ বাছিয়া লইতে হইবে এবং ঐ সকল গাছের প্রত্যেকটির শীর্ষস্থিত ফলের অথবা কোন একটি গুচ্ছের ফলের বীজ পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বপন করিতে হইবে, অর্থাৎ যতগুলি গাছ লইয়া পরীক্ষা চলিবে তাহাদিগের প্রত্যেকটির ফলের বীজ পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বপন করিতে হইবে। গাছের সমস্ত বীজ বপন না করিয়া গাছের গুণাগুণ পরীক্ষার উপযোগী কতকগুলি বীজ বপন করিলেই চলে। এক সারিতে ১০০ বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট। এই প্রক্রিয়াতে বিশেষ সুবিধা এই যে—যতগুলি গাছ, ঠিক ততগুলি বিশুদ্ধ সারি পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেক সারির গাছগুলি এক একটি স্বতন্ত্র গাছ হইতে উদ্ভূত। এই প্রথার আরও একটি বিশেষ সুবিধা এই যে কোন সারির গাছগুলিতে তাহাদের জনকগাছের লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তিত হইল কিনা তাহা প্রথম হইতেই সহজে ধরিতে পারা যায়। প্রথম নির্ব্বাচিত গাছের উৎকর্ষসাধক গুণগুলি যদি

প্রকৃতিগত হইয়া থাকে, তবে তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেও ঐ সকল গুণ সমভাবে পরিলক্ষিত হইবে এবং পুরুষানুক্রমে উহা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। এইরূপে কতকগুলি স্থায়ী ও প্রকৃতিগত গুণসম্পন্ন বংশ পৃথক্ করিয়া লইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় না এবং ঐ সকল নির্ব্বাচিত বীজ-দ্বারা বিস্তৃতভাবে চাষের কাজ চলিতে পারে। এই বিশুদ্ধ একক-নির্ব্বাচন-প্রথা (Pure Line Culture) জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রণালী অবলম্বনের জন্য নির্ব্বাচিত প্রথম গাছগুলি ঐ জাতীয় শস্য বা ফল হিসাবে বিশুদ্ধ-গুণযুক্ত এবং আত্মনিষেকী (Self-fertilised) হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সাঙ্কর্য্য দ্বারা উৎপন্ন হইলে চলিবে না। কারণ সঙ্করোৎপন্ন গাছ হইতে কোন কালেও একপ্রকার ফল পাওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা সমগুণবিশিষ্ট ফল পাওয়াই উন্নতিলাভের মূল ভিত্তি।

আত্মনিষেকী এবং অযৌনপ্রথায় বংশবৃদ্ধিশীল উদ্ভিদের পক্ষে একক-নির্ব্বাচন সহজেই চলিতে পারে; কিন্তু যে সকল উদ্ভিদ্ পরনিষেকী (Cross-fertilised) তাহাদের মধ্যে এই প্রথা প্রয়োগ করিতে হইলে বিভিন্ন সারির গাছের পরস্পরের মধ্যে যৌনসম্বন্ধ রহিত করা আবশ্যক।

(৩) অযৌন-নির্ব্বাচন

গাছের কাটিং বা শাখাকলম এবং ডগা প্রভৃতি দ্বারা অযৌন উপায়ে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং সংযোগ ভিন্ন যে সকল উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করা যায় ঐ সকলের মধ্যে নির্ব্বাচনের নাম অযৌন-নির্ব্বাচন। অযৌনপ্রথায় উৎপাদিত হইলেও কোন একটি ফসলে নানা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ থাকিতে পারে। উদ্ভিদের উৎকর্ষকারিগণ ঐ সকল ফসল হইতে উৎকর্ষ-সাধক বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছ বাছিয়া লইয়া তাহার শাখা অথবা ডগা দ্বারা ফসলের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। ইক্ষু, আলু, আনারস প্রভৃতির নির্ব্বাচন এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৪) মুকুল-নির্ব্বাচন

ইহাও অনেকটা অযৌন-নির্ব্বাচনের অনুরূপ। ফলকর গাছের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রধানতঃ এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। গাছের মুকুল বা শাখার মধ্যেও পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ গাছের বিভিন্ন শাখা বা মুকুলের ফলের মধ্যে কখনও কখনও বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন গাছের শাখাবিশেষের ফলের উৎকৃষ্টতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ শাখার কলম দ্বারা এই নির্ব্বাচন সংঘটিত হইয়া থাকে। মার্কিনের নেভেল কমলালেবু, বীজশূন্য কাল জাম, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সরকারী ইক্ষু-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বার্বার পরীক্ষা-দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, একটি আখের চোখ হইতে নানা বর্ণের নূতন জাতির আখ পাওয়া যাইতে পারে, এবং এই প্রকারের নির্ব্বাচনে তিনি সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন। বেলী সাহেবেরও মত এই যে একই বৃক্ষের কোন কোন মুকুল হইতে সেই আদি বৃক্ষের সহিত সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন বর্ণ- বা গুণ-বিশিষ্ট জাতির উদ্ভব হইতে পারে।

সঙ্করোৎপাদন

সঙ্করোৎপাদন-দ্বারা সাধারণতঃ তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে; যথা—(১) অধিক পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীলতা আনয়ন; (২) কতকগুলি বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ করা; (৩) কোন উদ্ভিদে অধিকতর বল সঞ্চার করা।

সঙ্করোৎপাদন করিতে হইলে উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সন্নিবেশ (Sexual arrangement) এবং পরাগপাতন বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

উদ্ভিদের লৈঙ্গিক সন্নিবেশ তিন প্রকার হইয়া থাকে—(ক) ভিন্নাবাস-পুষ্পী (Dioecious) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী- ও পুং-পুষ্প স্বতন্ত্র গাছে থাকে; যথা—তাল, পেঁপে প্রভৃতি। (খ) দ্বিলিঙ্গভাক্ (Monoecious)

অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী- এবং পুং-পুষ্প একই গাছে থাকে ; যথা—লাউ, কুমড়া প্রভৃতি। (গ) উভলিঙ্গ-পুষ্পী (Bisexual বা Hermaphrodite) অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের স্ত্রী- ও পুং-কেশর একই ফুলে থাকে ; অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কোন ফুলের মাতৃ-কেশরস্থ বীজাধারে সেই ফুলেরই পুং-কেশরস্থ পরাগপাতন দ্বারা গর্ভাধানক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাহাকে স্বনিষেক বা আত্মনিষেক বলে। আর কোন ফুলের মাতৃ-কেশরস্থ বীজাধারে ঐ জাতীয় ভিন্নগুণসম্পন্ন কোন গাছের ফুলের পুং কেশরস্থ পরাগপাতন দ্বারা গর্ভাধানক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাহাকে পর-নিষেক বলে এবং এই পর-নিষেকোৎপন্ন সন্তান সঙ্কর নামে অভিহিত হয়। এই সঙ্কর বা মিশ্র সন্ততি পিতৃ- ও মাতৃ-কুলের অনেকগুলি গুণাগুণের অধিকারী হয় এবং ঐ সকল সঙ্কর হইতে স্বনিষেকভাবে বংশ বিস্তার করিলে পরবর্ত্তী বংশে ঐ সকল গুণাগুণ বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐ সকল গুণাগুণ কি প্রণালীতে পরবর্ত্তী বংশে বিভক্ত হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সুধীসমাজে তাহা অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অষ্ট্রীয়া-দেশস্থ ব্রান নামক স্থানের আশ্রমের ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মা জর্জ গ্রিগর জোহান মেণ্ডেল এই বিষয়ে বহু গবেষণার দ্বারা প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে ঐ তথ্য, পুনরাবিষ্কৃত হইয়া, লোকসমাজে প্রচারিত হয়।

মেণ্ডেল সর্ব্বপ্রথম বিবিধ জাতীয় মটর (Pisum Sativum) লইয়া তাহা হইতে উৎপন্ন গাছের ফুলে বিভিন্নভাবে পরনিষেক দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল পরীক্ষার ফল যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহাই এখন "মেণ্ডেল-বিধি" (Mendel's Law) নামে পরিচিত হইয়াছে। পরনিষেক হইতে কি প্রণালীতে পৈতৃক গুণসমূহ পরবর্ত্তী পুরুষে প্রবর্ত্তিত হয় উক্ত বিধি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। মেণ্ডেলের বিধি অনুসারে বংশ-পরম্পরায় পিতৃপুরুষের গুণাগুণ পরবর্ত্তী বংশে যে কয়েক প্রকারে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পরপৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

(ক) প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ উভয়েই মাতাপিতার গুণাগুণের অধিকারী হইবে। মাতাপিতার গুণ সন্তানে প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল কিন্তু কোন কোন কারণে তাহা নাও হইতে পারে।

(খ) যে সকল গুণ তিন পুরুষ যাবৎ মাতাপিতার বংশে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসে তাহা সন্তানে নিশ্চিতরূপে বর্ত্তিয়া থাকে।

(গ) পূর্ব্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক গুণগুলি সাধারণতঃ পৃথক্ ভাবে সন্তানে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই কারণেই বাহ্য দৃশ্য হইতে মানসিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার কখনও কখনও উহা যুক্ত-ভাবেও প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(ঘ) মেণ্ডেলের বিধি অনুসারে ভাল ও মন্দ গুণকে পৃথক্ করিয়া তাহার উৎকর্ষসাধন করা যায়।

(ঙ) কোন গুণ কোন বংশপরম্পরা স্থায়ী হইয়া গেলেও ভিন্ন বংশের সংস্রবে আসিয়া তাহা লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

মেণ্ডেল সর্ব্বপ্রথমে স্বনিষেক ভাবে উৎপন্ন কতকগুলি মটর লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ মটরগুলি খাঁটি স্বনিষেক ভাবে উৎপন্ন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে অবগত হওয়ার জন্য তিনি ক্রমাগত দুই বৎসর কাল একক প্রথা অবলম্বনে পৃথক্ ভাবে উৎপাদন করেন। ঐ প্রকার পৃথক্ ভাবে উৎপাদিত অবিমিশ্র মটর দ্বারাই মেণ্ডেল সঙ্করোৎপাদন-বিষয়ে মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মেণ্ডেল একটি অবিমিশ্র লম্বা-জাতীয় মটর গাছের ফুলের পুংকেশরস্থ পরাগ অপর একটি বেঁটে-জাতীয় অবিমিশ্র মটর গাছের ফুলের স্ত্রী-কেশরস্থ বীজাধারে কৃত্রিম উপায়ে পরনিষেক করিয়া সঙ্কর-বীজ উৎপাদন করেন। তদনন্তর ঐ সঙ্কর-বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া দেখিতে পান যে প্রথম প্রজননে এই সঙ্করোৎপন্ন মটর গাছগুলি লম্বা-জাতীয় মটরের গাছের অনুরূপ হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে গাছের কাণ্ডের লম্বা হওয়ার সংস্কারটি বেঁটে হওয়ার সংস্কার হইতে প্রবল। লম্বা ও বেঁটে জাতীয় মটরের সঙ্কর করিয়া প্রথম প্রজননে যে কেবল লম্বা-জাতীয়

মটর গাছই পাওয়া গেল ঐগুলি দৃশ্যতঃ লম্বা হইলেও বেঁটে হওয়ার সংস্কারটি উহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া যায়। উক্ত সঙ্কর গাছের বীজ হইতে একক ভাবে চারা উৎপাদন করিয়া মেণ্ডেল দেখিলেন দ্বিতীয় জননে শতকরা ৭৫টি গাছ লম্বা-জাতীয় এবং শতকরা ২৫টি গাছ বেঁটে-জাতীয় হইয়াছে সুতরাং ইহার অনুপাত হইতেছে ৩ : ১ অর্থাৎ ৩টি লম্বা হইলে ১টি বেঁটে। উক্ত ২৫টি বেঁটে মটর গাছের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে উহার প্রত্যেক গাছই পুরুষানুক্রমে বেঁটে জাতীয় হইবে। কিন্তু কতকগুলি লম্বা মটরের বীজ হইতে লম্বা ও বেঁটে দুই জাতীয় এবং কতকগুলি হইতে কেবল লম্বা-জাতীয় গাছই হইবে। মোটের উপর ঐ সঙ্কর গাছ হইতে যতগুলি বীজ পাওয়া যায় তাহার এক-চতুর্থাংশ হইতে অবিমিশ্র বেঁটে, এক-চতুর্থাংশ হইতে অবিমিশ্র লম্বা এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ হইতে লম্বা ও বেঁটে উভয় গুণ-মিশ্রিত গাছ পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা বীজগণিতের $(ক + খ)^২ = ক^২ + খ^২ + ২ কখ$ এই সঙ্কেতটির অনুরূপ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লম্বা মটরগাছ ও বেঁটে মটরগাছের সঙ্করোৎপন্ন বীজ হইতে প্রথম জননে যে চারা জন্মে তাহার সকলগুলিই দৃশ্যতঃ লম্বা হইলেও উহাদের মধ্যে বেটে হওয়ার সংস্কারটি প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়। সুতরাং তাহার যান্ত্রিক (organic) গঠন কতকটা লম্বা এবং কতকটা বেঁটের সংমিশ্রণে হয়। যদি লম্বা মটরকে "T" বলিয়া ধরা যায় এবং বেঁটে মটরকে "t" বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে উহাদের উভয়ের সঙ্করোৎপন্ন গাছের যান্ত্রিক গঠন হইবে "Tt"। এইরূপ দুইটি পরস্পর অসমঞ্জস সঙ্কর বীজ হইতে দ্বিতীয় জননে যে গাছ উৎপন্ন হইবে তাহার গঠন (১) TT, (২) Tt এবং (৩) tt—এই তিন প্রকার হইবে। কোঠা অঙ্কিত করিয়া নিম্নে ইহার জনন-প্রণালী দেখান হইল।

	T লম্বা	t বেঁটে
লম্বা T	(১) TT	(২) Tt
বেটে t	(৩) T t	(৪) t t

৩ : ১ (দৃশ্যতঃ একপ্রকার)

(১) কোঠা—T × T = T T, ¼ লম্বা।
(২) কোঠা—T × t = Tt } ½ লম্বা ও
(৩) কোঠা—t × T = Tt } বেঁটে মিশ্র।

(৪) কোঠা—t × t = tt, ¼ বেঁটে

অন্য প্রকারে

৩ : ১

(১) × (২) = T × T = TT ¼ লম্বা।
(১) × (৪) = T × t = Tt } ½ লম্বা ও বেঁটে।
(২) × (৩) = T × t = Tt }

(৩) × (৪) = t × t = tt ¼ বেঁটে

ইহার মধ্যে যেগুলি ১নং কোঠার (TT) গাছের ন্যায় হইবে সেগুলির বীজ বপন করিলে লম্বা গাছ হইবে। যে গুলি ২ এবং ৩ নং কোঠার গাছের (Tt) ন্যায় হইবে সেগুলির বীজ বপন করিলে (১) লম্বা (TT), (২) লম্বা-বেঁটে (Tt) এবং (৩) বেঁটে (t)—এই তিন রকমের গাছই উৎপন্ন হইবে। আর ৪ নং কোঠার (tt) বীজ বপন করিলে উহা হইতে বেঁটে গাছ হইবে। ১ম ও ৪র্থ কোঠার প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বেঁটে ও লম্বা মটর গাছের সঙ্কর হইতে দ্বিতীয় জননে পুনরায় বেঁটে ও লম্বা মটর গাছ পৃথক্ হইয়া গেল।

এখানে কেবল মটর গাছের উচ্চতা এই স্বভাবটি লইয়া সঙ্কর উৎপাদন করা হইল; এইরূপে একাধিক গুণ লইয়াও সঙ্কর উৎপাদন করা যাইতে পারে, যেমন—(১) উচ্চতা এবং রং, (২) উচ্চতা, রং এবং স্বাদ, (৩) উচ্চতা, রং, স্বাদ এবং ফলের সংখ্যা। ১ নম্বরে ২টি, ২ নম্বরে ৩টি এবং ৩ নম্বরে ৪টি স্বভাবের তারতম্য বা যোগ-বিয়োগের জন্য সঙ্কর উৎপাদন করিতে হয়।

একটি স্বভাবের জন্য দুই জাতির সঙ্কর উৎপাদন করিলে দ্বিতীয় জননে বিভিন্ন তিন প্রকার গাছের উদ্ভব হইলেও বাহ্যতঃ দুই রকমের গাছই দেখা যাইবে; কারণ T এবং Tt এতদুভয়ের মধ্যে যান্ত্রিক পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলেও বাহ্যিক পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপে এই দুই জাতির স্বভাবের মধ্যে দুই প্রকার পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলে দ্বিতীয় জননে ৪ জাতির, তিনটি পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলে ৮ জাতির, চারিটি স্বভাবের পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলে ১৬ জাতির উদ্ভব হইবে।

দুইটি গাছের মধ্যে দুইটি স্বভাবের পার্থক্য বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের সঙ্করোৎপন্ন গাছের বীজ হইতে দ্বিতীয় জননে যে উল্লিখিত প্রণালী অনুযায়ী জননের ফল পাওয়া যাইবে তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বপরীক্ষিত লম্বা ও বেঁটে মটর গাছের সঙ্করোৎপাদিত বীজ দ্বারা ঐ দুই গাছের উচ্চতা, অর্থাৎ একটিমাত্র স্বভাবের যোগ-বিয়োগ লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু ঐ লম্বা ও বেঁটে মটর গাছের মধ্যে যদি একটি লাল এবং একটি সবুজ থাকে তাহা হইলে উহাদের মধ্যে উচ্চতা এবং রং এই দুইটি স্বভাবের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। এখন এই দুইটি স্বভাবের পার্থক্য-বিশিষ্ট দুই গাছের সঙ্করোৎপাদন করিয়া যদি প্রথম জননে সমস্তগুলি গাছই লাল ও লম্বা হয়, তাহা হইলে সেই বীজ দ্বারা দ্বিতীয় জননে যে সকল গাছ হইবে তাহার মধ্যে (১) লাল ও লম্বা (RT), (২)

লাল ও বেঁটে (Rt), (৩) সবুজ ও লম্বা (rT) এবং (৪) সবুজ ও বেঁটে (rt)* এই চারি প্রকার উৎপাদক (factor) পাওয়া যাইবে। ইহাদের অনুপাত হইবে—৩×৩ : ১=৯ : ৩ : ৩ : ১। এই অনুপাতের সত্যতা নিম্নে কোঠা অঙ্কিত করিয়া দেখান হইল।

	RT	Rt	tT	rt
RT লাল ও লম্বা	(১) RT / RT লাল ও লম্বা	(২) Rt / RT লাল ও লম্বা	(৩) rT / RT লাল ও লম্বা	(৪) rt / RT লাল ও লম্বা
Rt লাল ও বেঁটে	(৫) RT / Rt লাল ও লম্বা	(৬) Rt / Rt লাল ও বেঁটে	(৭) Rt / rT লাল ও লম্বা	(৮) rt / Rt লাল ও বেঁটে
rt সবুজ ও লম্বা	(৯) RT / rT লাল ও লম্বা	(১০) Rt / rT লাল ও বেঁটে	(১১) rT / rT সবুজ ও লম্বা	(১২) rt / rT সবুজ ও লম্বা
rt সবুজ ও বেঁটে	(১৩) RT / rt লাল ও লম্বা	(১৪) Rt / rt লাল ও বেঁটে	(১৫) rT / rt সবুজ ও লম্বা	(১৬) rt / rt সবুজ ও বেঁটে

১	২	৩	৪
লাল ও লম্বা	লাল ও বেঁটে	সবুজ ও লম্বা	সবুজ ও বেঁটে
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১৩ নং কোঠা একুন	৬, ৮, ১৪ নং কোঠা একুন	১১, ১২, ১৫ নং কোঠা একুন	১৬নং কোঠা
৯ :	৩ :	৩ :	১

---

* লাল=R ; লাল কিন্তু যান্ত্রিক সবুজ=r ; লম্বা=T ; লম্বা কিন্তু যান্ত্রিক বেঁটে=t।

উল্লিখিত কোঠা চিত্র দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দুইটি বিভিন্ন স্বভাব-বিশিষ্ট. দুই গাছের সঙ্করোৎপন্ন বীজ হইতে দ্বিতীয় জননে যে সকল চারা উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে ৪টি উৎপাদক (factor) পাওয়া যায় এবং ঐ ৪টি উৎপাদকের অনুপাত হইতেছে ৯ : ৩ : ৩ : ১। আর এই ৪টি উৎপাদকের বিভিন্ন প্রকার গাছের মধ্যে ১, ৬, ১১ ও ১৬ নং কোঠাতে ৪টি বিশুদ্ধ গাছ পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ্‌-প্রজনন দ্বারা যে সকল বিশুদ্ধ জাতির উদ্ভব হয় তাহাদের মধ্যে যেগুলি বাঞ্ছনীয় গুণবিশিষ্ট হইবে, স্বনিষেকভাবে তাহার চাষ দ্বারা আদর্শ বীজের সৃষ্টি করিতে হয় এবং ঐ বীজ কৃষকসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দেশে সুশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

উদ্ভিদ্‌-প্রজনন-ক্রিয়াটি নিতান্ত জটিল হওয়ার দরুণ সাধারণ কৃষকের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং শিক্ষিত লোক বীজোদ্যান স্থাপন করিয়া বীজের ব্যবসায় করিলে একদিকে যেমন দেশে সুশস্য-প্রচারের সহায়তা হয়, অপর দিকে ব্যবসায় হিসাবেও ইহা বিশেষ লাভজনক হইতে পারে। ইউরোপে এবং আমেরিকাতে এই প্রণালীতে বীজের ব্যবসায় প্রচলিত আছে এবং তথাকার কৃষকগণ আপন আপন ক্ষেত্রে বপনের জন্য সাধারণতঃ ঐ সকল প্রতিষ্ঠান-জাত বীজই ব্যবহার করিয়া থাকে। এই কার্য্যটি বিশেষ অধ্যবসায় এবং সাধুতা-সাপেক্ষ। কৃষকগণকে একবার ঐ সকল ব্যবসায়িবর্গের সাধুতা এবং বীজের কার্য্য-কারিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিলে এই প্রথা দেশে প্রচারিত হইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। সরকারী কৃষিবিভাগ দ্বারা এই কার্য্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সহজে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ঐ বিভাগ এতদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব হিসাবে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর।

নবম অধ্যায়

কৃষিকার্য্যে জীবাণু

জীবাণুর আকৃতি এত সূক্ষ্ম যে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই জীবাণু পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবদেহ, উদ্ভিদ্‌দেহ, মৃত্তিকা, জল ও বায়ুমণ্ডল, ইহার সর্ব্বত্রই জীবাণুর আধিপত্য সমভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে এবং সর্ব্বদাই ইহাদের দ্বারা জীবজগতের অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। ইহারা একদিকে যেমন জগতের অশেষ অকল্যাণের হেতু, পক্ষান্তরে ইহাদের কার্য্যকারিতা দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণও সাধিত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে অসংখ্য জীবাণুর অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আকৃতিভেদে তাহারা বিভিন্ন প্রকার। আমরা মৃতপ্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌-দেহের পচনক্রিয়ার ভিতর যে সকল পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই উহার মূলে জীবাণুর কার্য্যকারিতা নিহিত আছে। অনেক সময়ে আমাদের নাসিকাতে যে পচা জিনিসের দুর্গন্ধ প্রবেশ করে, তাহা মৃতজীব ও উদ্ভিদ্‌দেহে জীবাণুর ক্রিয়াজনিত।

জীবাণুসকল উদ্ভিদ্‌জাতীয় কি প্রাণিজাতীয় সে বিষয়ে অদ্যাপি মতভেদ চলিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদের কতকগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি অনেকটা উদ্ভিদের অনুরূপ; এবং কতকগুলি আকারে ও আচারে প্রাণিগণের সদৃশ। সুতরাং জীবাণুগুলিকে উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর মধ্যবর্ত্তী একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আকৃতিভেদে জীবাণুগুলিকে পরপৃষ্ঠায় লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) স্ফেরয়ডেল বা অঙ্গুরীয় আকৃতি (ক, ১৯ নং চিত্র)। (২) ব্যাসিলাস্ অর্থাৎ সূত্রবৎ (খ, ১৯ নং চিত্র)। (৩) স্পাইরলিস্ বা প্যাচের মত (গ, ১৯ নং চিত্র)।

১৯ নং চিত্র—বিভিন্ন আকৃতির জীবাণু।

ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন আকার-বিশিষ্ট জীবাণুও পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

প্রকৃতিভেদে জীবাণুগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উহার মধ্যে এক শ্রেণী বায়বীয় ও অপর শ্রেণী অবায়বীয়। বায়বীয় জীবাণুগুলি বয়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান গ্রহণ করিতে না পারিলে জীবনধারণ করিতে পারে না এবং অম্লজান ব্যতীত উহাদের দেহের গঠনও পরিবর্দ্ধিত হয় না। আর অবায়বীয় জীবাণুগুলির জীবনধারণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য বায়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যে সকল স্থানে অবাধ বায়ু-সঞ্চালন নাই সে স্থানেই উহারা সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়বীয় জীবাণু-অপেক্ষা অবায়বীয় জীবাণুর সংখ্যা অল্প, তথাপি ঐগুলির দ্বারাই পৃথিবীর অশেষ প্রকার অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। ঐগুলিই জীব-জগতের যাবতীয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ। জীবদেহে জীবাণু সমূহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা উদ্ভিদের উপর জীবাণুর প্রভাব বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

মৃত্তিকাতে জীবাণুর অস্তিত্ব বর্ত্তমান না থাকিলে উদ্ভিদ্গণ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। উদ্ভিদের অধিকাংশ আহার্য্য-পদার্থ জীবাণু সকলের কার্য্যকারিতা দ্বারা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইতেছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ বিবিধপ্রকার জীবাণুর সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ

নহে। পরীক্ষাগারে নানাবিধ উপায়ে জীবাণুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয় সত্য, কিন্তু কোন্ শ্রেণীর কত জীবাণু উহাতে বর্ত্তমান আছে তাহার সংখ্যা সঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না। এক 'গ্রাম' (এক সেরের ৯০০ ভাগের এক ভাগ) মৃত্তিকাতে কয়েকহাজার হইতে বহুলক্ষ জীবাণু বর্ত্তমান থাকে। পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রাণিসমূহের মধ্যে জীবাণুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মৃত্তিকার প্রকৃতি ও স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যের উপরে জীবাণুর সংখ্যার ন্যূনাধিক্য বিশেষরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মৃত্তিকার উপরিস্তরে ইহাদের সংখ্যা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যতই নিম্নস্তরে যাওয়া যায় ততই উহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকে।

জীবাণুসকল নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারে বলিয়াই কৃষিকার্য্যের জন্য মৃত্তিকাতে ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার মৃত্তিকাতে বহুপরিমাণ জল ও জৈবিক পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়াই জীবাণুসকল মৃত্তিকামধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া বংশবিস্তারের সুবিধা পাইয়া থাকে। জটিল যৌগিক পদার্থগুলিকে সরল যৌগিক পদার্থে পরিণত করা এবং সরল যৌগিক পদার্থকে জটিল যৌগিক পদার্থে পরিণত করা, ইহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব।

যবক্ষারজানযুক্ত সরল যৌগিক পদার্থগুলি উদ্ভিদ্‌গণ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া জটিল পদার্থে পরিণত করে। উদ্ভিদের মৃত্যুর পরে ঐ পদার্থগুলি মৃত্তিকার সংস্রবে থাকিলে পুনরায় সরল যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। যবক্ষারজানের জটিল যৌগিক পদার্থ অন্নসার। এক শ্রেণীর জীবাণুর কার্য্যকারিতার ফলে ঐ অন্নসারের যবক্ষারজান বিশ্লেষিত হইয়া এমোনিয়ার সৃষ্টি হয়। আবার অন্যজাতীয় জীবাণুর প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ এমোনিয়া হইতে নাইট্রাইট প্রস্তুত হয়। পুনরায় ভিন্ন জাতীয় জীবাণুর কার্য্যকারিতার ফলেই নাইট্রাইট নাইট্রেটে পরিণত হইলে উদ্ভিদ্‌গণ উহা গ্রহণ করিয়া জটিল হইতে জটিলতর পদার্থের সৃষ্টি করে।

অবস্থাভেদে নাইট্রেট-ও ভিন্ন জাতীয় জীবাণুবিশেষের প্রক্রিয়ার ফলে পুনরায় নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং ঐ নাইট্রাইটের উপর স্বতন্ত্র আর একজাতীয় জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা যবক্ষারজান উদ্ভূত হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। সুতরাং উহা উদ্ভিদ্‌জীবনের কোন প্রকার প্রয়োজনে আসে না। ইহাকে ডিনাইট্রিফিকেশন (Denitrification) বলে

কোন কোন জাতীয় জীবাণু বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া আপন পোষণ-কার্য্যে নিয়োজিত করে অথবা সিম্বীজাতীয় শস্যসমূহের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। ইহাকে যবক্ষারজান সংবদ্ধ করা (Nitrogen fixation) বলে। জীবাণুকর্ত্তৃক এই সকল অবস্থান্তরের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অন্নসার যবক্ষারজানের জটিল যৌগিক পদার্থ। এই যৌগিক পদার্থ অঙ্গার, জলজান, অম্লজান এবং যবক্ষারজান সংযোগে গঠিত। কখনও কখনও ইহাতে প্রস্ফুরক, লৌহ এবং গন্ধকও পাওয়া যায়। জীবাণুর প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ অন্নসার প্রথমতঃ দুইটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। ঐ দুইটি যৌগিক পদার্থ জটিল হইলেও উহাদের জটিলতা অপেক্ষাকৃত সহজ। যে সকল জীবাণু ঐ সকল কার্য্যে সহায়তা করে তাহাদের মধ্যে ব্যাসিলাস্ সাব্‌টাইলিস্ (Bacillus Subtilis), ব্যাসিলাস্ মাইকয়ডিস্ (Bacillus Mycoides) উল্লেখযোগ্য। এই সকল কার্য্য ককাই (Cocci) জাতীয় কতকগুলি জীবাণু এবং একটিনোমাইসিস্ (Actino-myces) এর কয়েকজাতীয় জীবাণু দ্বারাও সম্পাদিত হয়। উপরে যে দুইটি সহজ যোগিক পদার্থের বিষয় লিখিত হইয়াছে উহাদের একটির নাম প্রোটিওসেস্ (Proteoses) এবং অপরটির নাম পেপ্‌টোন (Peptone)। এই দুইটি যৌগিক পদার্থ অন্য একপ্রকার জীবাণুর প্রক্রিয়া দ্বারা আল্‌ফা-এমাইনো এসিড (α-amino-acid)এ পরিবর্ত্তিত হয়। আবার অন্য কয়েক প্রকার ণুজীবা ঐ এসিড হইতে এমোনিয়া

বিশ্লেষণ করে। কেবলমাত্র যবক্ষারজানের যৌগিক পদার্থগুলি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া অম্লসাররূপে মৃত্তিকাতে প্রবেশ করে এমন নহে। গোময়সারের অধিকাংশ যবক্ষারজান ইউরিয়া (Urea) এবং হিপিউরিক এসিড (Hippuric acid) রূপে মৃত্তিকাতে মিশ্রিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকাতে যবক্ষারজানের অংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য কালশিয়াম সায়ানামাইড (Calcium Cyanamide) প্রভৃতি পদার্থ প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত পদার্থগুলি এবং জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বকথিত অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। ইহা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে যবক্ষারজান ঘটিত যে কোনও জৈবিক পদার্থ জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা এমোনিয়াতে পরিণত হয়।

যে মৃত্তিকাতে সহজে বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহাতে অধিক এমোনিয়া জমা হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ এমোনিয়ার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা উহা নাইট্রেটে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় উদ্ভিদ্ উহা গ্রহণ করিয়া ফেলে। পুকুরের তলায় পাঁকে, অথবা জলা ভূমিতে অবাধ বায়ুপ্রবেশের সুবিধা নাই বলিয়া এমোনিয়া নইট্রেটে পরিণত হইতে পারে না এবং সেজন্য উহা এমোনিয়ারূপেই থাকিয়া যায়। এইজন্যই যে সকল উদ্ভিদ্ কর্দ্দম এবং জলাভূমিতে জন্মে উহারা যবক্ষারজান নাইট্রেটরূপে গ্রহণ না করিয়া এমোনিয়া রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে। সিউডোমোনাস্ (Pseudomonas) জাতীয় জীবাণু দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়।

জীবাণু সকল মৃত্তিকাতে বহুল পরিমাণে এমোনিয়া প্রস্তুত করে এবং ইহার কিয়দংশ উহারা আপন শরীর পোষণের জন্য গ্রহণ করে। সুতরাং কিয়ৎপরিমাণ যবক্ষারজান ইহাদের আপন আপন কোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই নিমিত্তই মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষার সময়ে অল্প পরিমাণ এমোনিয়া জৈবিক অবস্থায় মৃত্তিকা মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবাণু-কোষের মৃত্যু ও ধ্বংসের পরে পুনরায় ঐ এমোনিয়া মৃত্তিকাতে আসে।

নাইট্রিফিকেশন (Nitrification)

এমোনিয়ার নাইট্রাস এসিড অথবা নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তন এবং নাইট্রাইটের নাইট্রেটে অবস্থান্তরিত হওয়ার নাম নাইট্রিফিকেশন। প্রথমোক্ত কার্য্য অর্থাৎ এমোনিয়ার নাইট্রাস এসিড অথবা নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তন নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas) জাতীয় জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য এমোনিয়া এবং বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজানের প্রয়োজন হয়। এমোনিয়ার অবস্থান্তর ঘটাইয়া ইহারা আপনাদের বৃদ্ধি এবং খাদ্য-সংগ্রহের শক্তি সঞ্চয় করে, কিন্তু এমোনিয়া হইতে যে নাইট্রাইটের উদ্ভব হয় ইহারা তাহা নিজ ব্যবহারে নিয়োজিত করে না। যে সকল অবস্থা এই জাতীয় জীবাণুসকলের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে সেই সকল অবস্থাই আবার নাইট্রাইট হইতে নাইট্রেটপ্রস্তুতকারী জীবাণুদের পক্ষে অনুকূল ভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। শেষোক্ত অর্থাৎ নাইট্রাইট হইতে নাইট্রেট প্রস্তুতকারী জীবাণুগুলি নাইট্রোব্যাক্টার (Nitrobacter) জাতীয়। উর্ব্বর ও আবাদী জমিতে এই জাতীয় জীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas) জাতীয় জীবাণুর ন্যায় ইহাদের পুষ্টিসাধন এবং বৃদ্ধির জন্য জৈবিক পদার্থের প্রয়োজন হয় না।

নাইট্রেট মৃত্তিকাতে জমা হয়। অবস্থাবিশেষে মৃত্তিকাতে ইহা অধিক পরিমাণে জমা হইতে পারে। চিলী হইতে সারের জন্য এদেশে যে নাইট্রেটের আমদানী হয় ঐ নাইট্রেটও উল্লিখিত নাইট্রোব্যাক্টার (Nitrobacter) জাতীয় জীবাণুর কার্য্যকারিতার ফল বলিয়া মনে হয়।

ঈষ্ট্‌স্ (Yeasts), মোল্ডস্ (Moulds), ফাঙ্গাস্, মস্ ও ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌সম্বন্ধীয় জীবাণুগুলির প্রত্যেকেরই বৃদ্ধির জন্য যবক্ষারজানের প্রয়োজন হয়। জীবাণুসকলের দ্বারা যে প্রণালীতে যবক্ষারজান গৃহীত এবং উহা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া প্রাণপদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে যবক্ষারজান সমীকরণ (Nitrogen assimilation) বলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিবিধজাতীয় জীবাণু বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন উপায়ে

যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন কোন জীবাণু বাতাস হইতে, আবার কোন কোন জীবাণু এমোনিয়া ও নাইট্রেট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এমোনিয়া হইতে গ্রহণ করার দরুন উর্ব্বর মৃত্তিকাতে যে পরিমাণ এমোনিয়া বিদ্যমান থাকে তাহার কতক অংশ ঈষ্টস্, মোল্ডস্ প্রভৃতি জীবাণুর কোষে পাওয়া যায়।

ডি-নাইট্রিফিকেশন (Denitrification)

জীবাণু সকলের ক্রিয়া দ্বারা নাইট্রেটের নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তন এবং নাইট্রেট ও নাইট্রাইট হইতে যবক্ষারজানের উদ্ভব হওয়াকে ডি-নাইট্রি-ফিকেশন (Denitrification) বলে। কোন কোন জাতীয় জীবাণু বাতাসের সহায়তা ভিন্ন নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। মৃত্তিকাতে জৈবিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে অথচ অম্লজানের অভাব থাকিলে কোন জীবাণু নাইট্রেটের অণু হইতে অম্লজান নিজ ব্যবহারে ব্যয় করিয়া ঐ নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তন করে। যে শক্তি দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় ঐ শক্তিই আবার ঐ সকল জীবাণুর বৃদ্ধির এবং পুষ্টির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে।

যে মৃত্তিকাতে সহজে বাতাস চলাচল করিতে পারে ঐরূপ মৃত্তিকাতে নাইট্রিফিকেশন বিষয়ে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু যে মৃত্তিকাতে নাইট্রেট বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে তাহাতে জল জমা হইয়া থাকিলে অম্লজানের অভাব হয়। ঐ অবস্থায় জীবাণু-সকলের ক্রিয়া দ্বারা নাইট্রেট নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তিত হয়। কোন কোন স্থানে এইরূপ নাইট্রেট এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে যে উহা উদ্ভিদের পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করে। এই নিমিত্ত যে সকল শস্যের পুষ্টির জন্য গোড়াতে জল দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় তাহাতে নাইট্রেট সাররূপে ব্যবহার করা উচিত নহে।

যবক্ষরজান সংবদ্ধ করণ (Nitrogen fixation)

কতকগুলি জীবাণু বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে

সমর্থ হয়। ঐগুলি সাধারণতঃ উদ্ভিদের শিকড়ের মধ্যে বাস করে। ঐ জীবাণুগুলিকে রাইজোবিয়াম (Rhizobium) জীবাণু বলে। এই জাতীয় জীবাণুগুলি মৃত্তিকা মধ্যে বৃদ্ধি ও বিস্তারলাভ করিতে পারে কি না তাহা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। ইহারা যাবতীয় শিম্বাজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে সংলগ্ন হইয়াই উহার মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ অবস্থায় জীবাণুগুলি সংখ্যায় অতি দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উদ্ভিদ্‌-শিকড়ের যে সকল কোষের বৃদ্ধি হেতু ঐ শিকড়গুলি আয়তনে বর্দ্ধিত হয় জীবাণুগুলির পরিত্যক্ত জিনিষের উত্তেজনায় ঐ কোষগুলি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া শিকড়ের গায়ে উল্লিখিত গুটিগুলির সৃষ্ট হইয়া থাকে। শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ্‌গুলি আপন দেহ-পোষণের জন্য মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে না। জীবাণুর সাহায্যে বায়ুমণ্ডলস্থ যবক্ষারজান নিজ ব্যবহারে নিয়োজিত করে। কি উপায় দ্বারা এই ক্রিয়া সংঘটিত হয় অদ্যাপি তাহা নিশ্চিতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন জীবাণুগুলি যবক্ষারজান সংবদ্ধ করিয়া উহা প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত কার্য্যে নিয়োগ করে এবং জীবাণু-কোষের মৃত্যু এবং ধ্বংসের পর শিকড়ের কোষনিঃসৃত অজৈব অন্তরুৎসেক (Enzyme) দ্বারা ঐ সকল কোষের পরিবর্ত্তনের ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা উদ্ভিদ্‌ গ্রহণ করে। আবার কেহ কেহ বলেন—জীবাণুসকল সংবদ্ধীকৃত যবক্ষারজানের কতক অংশ পরিত্যাগ করে এবং এই পরিত্যক্ত পদার্থ কোষ-রসে সহজে দ্রব হয় এবং ঐরূপ দ্রব অবস্থায় উদ্ভিদ্‌ উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

জীবাণু-বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ্‌ অঙ্গারোদক নামক এক প্রকার শর্করা জাতীয় পদার্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উদ্ভিদ্‌ এবং জীবাণু পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত।

সিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ্‌গুলির শিকড়ে যে সকল জীবাণু গুটি প্রস্তুত দ্বারা বিস্তার লাভ করে ঐ জাতীয় জীবাণু সচরাচর প্রায় সকল

মৃত্তিকাতেই দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন মৃত্তিকাজাত সকল প্রকার সিম্বীজাতীয় শস্যের শিকড়েই ঐরূপ গুটির উদ্ভব হয় না। ইহার কারণ—সকল রকম সিম্বীজাতীয় শস্যের শিকড়েই একই জাতীয় জীবাণু দ্বারা গুটির সৃষ্টি হয় না। যে মাটিতে যে প্রকার সিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ্-শিকড়ের গুটি উৎপাদক জীবাণুর অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই, সে মাটিতে জাত ঐ উদ্ভিদের শিকড়ে গুটির অবির্ভাব হইতে পারে না। কাজেই কোন্ প্রকার সিম্বীজাতীয় শস্য কোন্ জমিতে ভাল জন্মে তাহা জানা আবশ্যক।

কোন কোন প্রকার বিশিষ্ট জাতীয় জীবাণুর বীজ কৃত্রিম উপায়ে জমিতে প্রয়োগ করা যায় এবং ঐরূপ কৃত্রিম উপায়ে জীবাণুর বীজ প্রয়োগ দ্বারা অনেক সময় বিশেষ ফল লাভ করা গিয়াছে।

রাইজোবিয়াম (Rhizobium) জাতীয় জীবাণু ছাড়া অন্য এক প্রকার জীবাণু আছে, উহা মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া যবক্ষারজান সংবদ্ধ করে এবং ঐ যবক্ষারজান নিজ ব্যবহারে নিয়োজিত করিয়া থাকে। উহারা আপন বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য কোনও উদ্ভিদের সহায়তা গ্রহণ করে না। ঐ জীবাণুগুলি এজোটো-ব্যাকৃটার (Azoto-bacter) নামে পরিচিত। এই জাতীয় জীবাণু নির্ব্বাত স্থানে বাচিয়া থাকিতে পারে না। ইহারা অঙ্গারোদক জাতীয় পদার্থের ধ্বংস করিয়া আপনাদের বর্দ্ধনশক্তি লাভ করে এবং বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। এই জাতীয় জীবাণু কৃষকবর্গের পক্ষে আশু ফলপ্রদ না হইলেও ইহারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে যবক্ষারজান সঞ্চয় করিয়া রাখে তদ্দারা ভবিষ্যতে কৃষকগণের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

অঙ্গারের অবস্থান্তর

অঙ্গার জাতীয় যে সকল পদার্থ সাররূপে মৃত্তিকাতে প্রয়োগ করা হয় উহা সাধারণতঃ কাষ্ঠসার অথবা তজ্জাতীয় পদার্থ। উহা সহজে জীবাণুসকলের ক্রিয়াধীন হয় না। একৃটিনোমাইসিস (Actino-myces) জাতীয় এক প্রকার বিশিষ্ট জীবাণু ঐ সকল পদার্থ ধ্বংস

করিয়া সকল দ্রবণীয় অঙ্গারোদক এবং অবস্থা ভেদে জৈবিক এসিডে পরিণত করে। ইহা আবার বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা বিবিধ পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপে পরিবর্ত্তনশীল জৈবিক পদার্থ যাহা মৃত্তিকাতে থাকে তাহাকে 'সয়েল হিউমাস' (Soil humus) বলে। জীবাণুসকল আঙ্গারযুক্ত পদার্থ ধ্বংস করিয়া যে প্রকার রংএর সৃষ্টি করে হিউমাসেরও সেই রং দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রস্ফুরকের অবস্থান্তর

উদ্ভিদ্ জীবনে ফস্‌ফেট অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ট্রাইক্যাল্‌সিয়াম-ফস্‌ফেট (Tricalcium-phosphate) রূপে উহা মৃত্তিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা সহজে দ্রব হয় না। দ্রবণীয় ফস্‌ফেটে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ উহা শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না। অদ্রবণীয় ফস্‌ফেটের অধিকাংশই জৈবিক এসিড কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড-এর ক্রিয়া দ্বারা দ্রবণীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। জৈবিক এসিড এবং কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড জীবাণুসকলের ক্রিয়া দ্বারাই মৃত্তিকাতে প্রস্তুত হয়। এমোনিয়া হইতে যে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হয় তাহাও এই কার্য্যে সহায়তা করে। কোন কোন জাতীয় জীবাণু ফস্‌ফেটের সংস্পর্শে আসিলে দ্রুত কার্য্যকরী হয়। ফস্‌ফেট ঐ সকল জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

গন্ধকের রূপান্তর

সাল্‌ফেট, সাল্‌ফাইড এবং নানারূপ যৌগিক জৈবিক পদার্থে, বিশেষতঃ অন্নসার এবং সরিষার তৈলে গন্ধকের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। জীবাণুর কার্য্যকারিতা দ্বারা গন্ধকের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। অন্নসার এমাইনো এসিডে, বিশেষতঃ সিস্‌টিনে (Cystin) পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহা হইতে হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড (Hydrogen sulphide) উদ্ভূত হয়। হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড হইতে সাল্‌ফেট প্রস্তুত হইলে উহা উদ্ভিদ্‌গণ

শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিজ দেহে অম্লসার প্রস্তুত করিবার কার্য্যে নিয়োগ করে। বেগ্‌গিয়াটোস (Beiggiatose) এবং থায়োথ্রিক্‌স্‌ (Thiothrix) জাতীয় জীবাণুগুলি সাধারণতঃ এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। ভিব্রিও (Vibrio) জাতীয় জীবাণু নির্ব্বাত অবস্থায় জৈবিক পদার্থের বর্ত্তমানে সাল্‌ফেটকে সাল্‌ফাইডে পরিণত করে। বহুপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষে সাল্‌ফাইড বিষবৎ অনিষ্টজনক। তথাপি এই জাতীয় জীবাণুর কার্য্যকারিতা কৃষিকার্য্যে নিতান্ত সামান্য নহে।

লৌহের অবস্থান্তর

জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা লৌহ হইতে দুইটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে একটির নাম ফেরিক (ferric) এবং অপরটির নাম ফেরাস (ferrou-)। ফেরাস অবস্থায় লৌহ উদ্ভিদ্-শিকড়ের পক্ষে অনিষ্টকারী। এক জাতীয় জীবাণু লৌহকে ফেরাস্‌ অবস্থা হইতে ফেরিকে পরিণত করে। লৌহের গায়ে যে মর্‌চে ধরে তাহা এই জীবাণুর কার্য্য।

গোময়-সারের উপর জীবাণুর কার্য্য

এ দেশের সাধারণ কৃষকগণের পক্ষে গোময়-সার সহজলভ্য। সাধারণতঃ তাহারা সার বলিতে গোময়-সারকেই বুঝিয়া থাকে এবং শস্যোৎপাদনের জন্য প্রতিবৎসর আপন আপন ক্ষেত্রে ঐ সার প্রয়োগ করিয়া থাকে। গোময়-সার যথারীতি রক্ষা না করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে অনেক সময় উহা দ্বারা শস্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধন হয়। এই নিমিত্ত কি প্রণালীতে গোময়-সার রক্ষা করিলে উহা ক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা উত্তম ফসল লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে বহুদিন গবেষণা চলিতেছে। কিন্তু দেশকালভেদে গোময়-সার রক্ষা বিষয়ে কতটুকু পার্থক্যের প্রয়োজন তাহা অদ্যাপি কৃষিতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলী নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জীবাণুসকল দ্বারা গোময়-সারস্থিত অন্নসার প্রভৃতি যবক্ষারজানমূলক পদার্থ সকলকে নাইট্রেট নামক উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী আহার্য্যে পরিণত

করে। জীবাণুসমূহের ক্রিয়া দ্বারা গোময়-সারস্থিত উপাদান-সমূহের যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবর এবং তৎসংশ্লিষ্ট পচা খড়, পাতা প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় তন্মধ্যে কাষ্ঠসার (Cellulose) নামক একপ্রকার আঁশযুক্ত অঙ্গারাত্মক পদার্থ, অন্নসার নামক একপ্রকার যবক্ষারজানমূলক পদার্থ, প্রস্ফুরক, লবণক, চূণ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ অত্যন্ত জটিল অবস্থায় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উল্লিখিত সমস্ত পদার্থ-গুলিই উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে পরম হিতকর। তথাপি উহারা গোময়-সারের মধ্যে যে অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে উদ্ভিদ্ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জীবাণুসকল প্রধানতঃ বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল পদার্থকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়।

কোন গর্ত্তে গোময় রক্ষা করিবার পর তাহা হইতে সেলুলোস্ নামক আঁশযুক্ত পদার্থগুলি সর্ব্বপ্রথম ধ্বংস হয়। জীবাণু ও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। কাষ্ঠসারের ভিতরে সাধারণতঃ অঙ্গার, জলজান ও অম্লজান বর্ত্তমান থাকে। উল্লিখিত দ্বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা এই পদার্থগুলি কার্ব্বনিক এসিড, জল ও অন্যান্য জটিল পদার্থে পরিণত হয়। যে সকল জীবাণু কাষ্ঠসারে এই পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহারা অবায়বীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নির্ব্বাত স্থান ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র। সুতরাং গোময়-সার প্রথমে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিবার অবস্থায় যাহাতে উহার মধ্যে অধিক বায়ুপ্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কাষ্ঠসারগুলি যখন মোটা-মুটি ভাবে ধ্বংস হইয়া যায় তখন অন্নসার এবং যবক্ষারজানমূলক পদার্থগুলির উপর জীবাণুসকলের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে গোবর গাদার চাপ ভাঙ্গিয়া উহা আল্‌গা করিয়া দিতে হয় কারণ কাষ্ঠসার ধ্বংস হওয়ার পরে স্তূপীকৃত সারের গর্ত্তে এত অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে উহা বাহির হইয়া না গেলে যে সকল জীবাণু অন্নসারের উপর কার্য্য আরম্ভ করে তাহারা স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে

সকল জীবাণু দ্বারা অন্নসার বিশ্লেষিত হয় ঐগুলি বায়বীয় শ্রেণীভুক্ত। বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন গ্রহণ ভিন্ন তাহারা আপন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। অন্নসার প্রথমতঃ একপ্রকার জীবাণুর কার্য্য দ্বারা এমাইড বা এমাইডো এসিডে, তৎপরে অন্যপ্রকার জীবাণুর কার্য্য দ্বারা এমোনিয়াতে পরিণত হয়। এই এমোনিয়া আবার অন্যপ্রকার জীবাণুর সাহায্যে নাইট্রাইটে এবং উহা আবার অন্য আর একপ্রকার জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা নাইট্রিক এসিডে রূপান্তরিত হয়। এই নাইট্রিক এসিড পটাশ, সোডা, চূণ অথবা এমোনিয়াতে মিশ্রিত হইয়া নাইট্রেটে পরিণত হইয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গণ এই নাট্রেট শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। উল্লিখিত এমোনিয়া অনেক সময় গন্ধক প্রভৃতির সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে এমোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন করে। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ শিকড় দ্বারা এমোনিয়াম সাল্‌ফেট বা দ্রবীভূত যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অন্নসার বিশ্লেষণের সময় বায়ুপ্রবেশের জন্য সারের গোময়স্তূপকে আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু অত্যধিক শিথিল বা শুষ্ক হইয়া গেলে উহা হইতে এমোনিয়া নামক যবক্ষারজানমূলক পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় সঞ্চিত গোময় সারের উপরিভাগে গোমূত্র অথবা জল সেচন করিতে হয়। এমোনিয়া দ্রবণীল; সুতরাং জল অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ সেচন করিলে উহা গলিয়া সারের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। আবার অতিরিক্ত জল সেচন করিলে এমোনিয়া এবং নাইট্রেট উহার প্রবাহে গলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় গোময় অসার হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং পরিমিত ভাবে জল সেচন করিতে হইবে। যেখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় সেখানে গোময়-সার স্তূপাকারে রক্ষা না করিয়া গর্ত্তমধ্যে রক্ষা করিয়া তদুপরি একখানি চালার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐ গর্ত্তের চারিপাশ এবং তলদেশ দিয়া যাহাতে গর্ত্তমধ্যে জলপ্রবেশ করিতে না

পারে তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। সম্ভব হইলে এই কার্য্যের জন্য পাকা চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল।

কেহ কেহ গোময়-সারের সহিত গাছের পাতা এবং বিচালি ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া দিতে পরামর্শ দেন। গোময়ের সহিত গোয়ালের আবর্জ্জনা মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই ভাল। আমাদের মতে অত্যধিক শুষ্ক খড় বা বিচালি উহার সঙ্গে মিশ্রিত করা সঙ্গত নহে। অল্প পরিমাণ গোয়ালের আবর্জ্জনা মিশ্রণ দ্বারা একদিকে যেমন সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অপরদিকে উহা আবার বায়ুচলাচলেরও সুবিধা করিয়া দেয়। অত্যধিক শুষ্ক বিচালি মিশ্রিত করিলে যখন গোময়ের কাষ্ঠসার ধ্বংস হইয়া অন্নসার-বিশ্লেষণ-কার্য্য আরম্ভ হয় তখনও বিচালিস্থিত কাষ্ঠসারের ধ্বংস ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঐ ক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহার প্রভাবে নাইট্রেট উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না, বিশেষতঃ ঐ বিচালিগুলিকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার অনিষ্টকারী জীবাণু নাইট্রেট-প্রভৃতি সারবান্ পদার্থ হইতে যবাক্ষারজান নামক গ্যাস নিষ্কাশন করিয়া বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।

গোময় সঞ্চয় করিবার সময় তাহার সহিত ছাই, চূণ, সাল্‌ফেট-অব-লাইম প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া দিলে উহার পচন-কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।

মৃত্তিকা ও বীজাণু

জীবাণুসকল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া উহার অশেষ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। আমরা 'লেটারাইট' নামক যে লাল অনুর্ব্বর মৃত্তিকা দেখিতে পাই উহা পূর্ব্বে ঐরূপ বর্ণবিশিষ্ট ছিল না। সাধারণ মৃত্তিকাই জীবাণুসকলের প্রভাব দ্বারা পচিয়া ঐরূপ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং আপন স্বাভাবিক উর্ব্বরতাশক্তি হারাইয়া অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে।

সিম্বীজাতীয় অসংখ্য বন্য উদ্ভিদ্ তাহাদের শিকড়স্থিত জীবাণু-সকলের সাহায্যে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি

করিতেছে। কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন সিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়স্থিত জীবাণু ব্যতীত আরও অনেক প্রকার জীবাণু বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। এই সকল যবক্ষারজান-সংগ্রাহক জীবাণুর অভাব-বশতঃ কোন কোন দেশের ভূমি একেবারে অনুর্ব্বর হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। ভিন্ন স্থান হইতে যবক্ষারজান-সংগ্রাহক জীবাণুর আমদানী করিয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধনের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়।

সোরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকার প্রাচীন মৃত্তিকা হইতে জীবাণুর প্রভাব দ্বারা সোরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থিত নুনিয়া জাতি মৃত্তিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সোরা সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করিত। বর্ত্তমান সময়ে চিলি দেশ হইতে নাইট্রেটের আমদানী হওয়াতে ঐ ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ মন্দা পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে জীবাণু সম্বন্ধে সামান্য যাহা আলোচনা করা হইল তাহা দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে মৃত্তিকাতে জীবাণুর প্রভাব কি পরিমাণ বিস্ময়কর। জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্যক্ তথ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে জীবাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন। বিষয়টি অতীব রহস্যময় এবং অত্যন্ত জটিল। তথাপি এ বিষয়ে সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। জীবাণুগণ অদ্ভুত উপায়ে মৃত্তিকাস্থিত নানারূপ সরল যৌগিক পদার্থগুলিকে জটিল হইতে জটিলতর যৌগিকপদার্থে, এবং জটিলতর যৌগিক পদার্থকে সরল যৌগিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তর যেন একটি বিশাল রসায়নাগার। তন্মধ্যে জীবাণুগণ দক্ষ রসায়নতত্ত্ববিদের ন্যায় নানাপ্রকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং গঠন কার্য্য দ্বারা অহরহঃ উদ্ভিদসমূহের পোষণের সহায়তা করিতেছে।

দশম অধ্যায়

সার

ফসল উৎপাদন করিলে ভূমির মধ্যস্থিত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলি ক্রমে কমিয়া যায়। সুতরাং ঐগুলি পূরণ করিয়া না দিলে পুনরায় ঐ ক্ষেত্রে ভাল ফসল হইতে পারে না। যে সকল পদার্থ-দ্বারা ভূমির অভ্যন্তরস্থ ঐ উদ্ভিদের আহার্য্যগুলির অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া হয় তাহাকেই সার বলে।

সার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) বিশেষ সার ও (২) সাধারণ সার। উল্লিখিত যবক্ষারজান, প্রস্ফুরক, পটাশ এবং চূণ—এই চারিটি পদার্থের একটির বা দুইটির গুণবিশিষ্ট সার 'বিশেষ শ্রেণী'র মধ্যে পরিগণিত এবং যে সকল পদার্থের মধ্যে একাধারে ঐ চারিটি পদার্থের গুণ বিদ্যমান আছে তাহাকে 'সাধারণ সার' বলে। এই শ্রেণীর সার জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের দেহ হইতে পাওয়া যায়। সাধারণ শ্রেণীর সারের মধ্যেও বিশেষ শ্রেণী সারের সমস্তগুলি গুণই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

সাধারণ সার

দরিদ্র কৃষকগণ সকল সময় মূল্যবান্ সার ক্রয় করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিতে পারে না। এই জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আপন আপন গৃহজাত সারগুলি রক্ষা করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য। কৃষকগণের গোয়ালে প্রতিদিন যে পরিমাণ গোময়, গোমূত্র এবং অন্যান্য আবর্জ্জনা জমা হয় তাহাই গৃহজাত সার নামে অভিহিত। সাধারণ শ্রেণীর সারের মধ্যে গৃহজাত সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ঐ সকল জিনিষগুলি রীতিমত সারে পরিণত করিয়া লইতে হইলে গোশালার অনতিদূরে একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত গোশালার সংযোগ করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে গোশালাস্থ প্রতিদিনের মূত্র ঐ নালা দ্বারা আসিয়া চৌবাচ্চাতে জমা হইতে পারে। তারপর গোশালার যাবতীয় আবর্জ্জনা অর্থাৎ গরুর ভুক্তাবশিষ্ট পদার্থ এবং উহাদের শয়নের জন্য দেয় খড়ের অব্যবহার্য্য অংশ গোময়ের সহিত একত্র করিয়া প্রতিদিন ঐ চৌবাচ্চাতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই সংগৃহীত জিনিষগুলি যাহাতে পচিয়া সারে পরিণত হইতে পারে সেজন্য ঐগুলিকে মাঝে মাঝে কোদালী দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া তৎপরে কোদালীর পৃষ্ঠ দ্বারা পিটাইয়া একটু শক্ত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ঐ ভাবে মিশ্রিত না করিয়াও গৃহজাত সার জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু মিশ্রিত সার যেমন কার্য্যকরী হয়, উহা তেমন হয় না।

গৃহজাত সারের মধ্যে গোময় এবং অশ্ব, মেষ, ছাগ, শূকর, পক্ষী ও পতঙ্গের পুরীষ এবং মূত্র কৃষকগণের পক্ষে সহজলভ্য। ঐ পদার্থ-গুলির গুণাগুণ যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোময় বা গোবর সার

আমাদের দেশে শুষ্ক গোবর বা ঘুঁটেকে অনেক স্থানে সাধারণ কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে অগ্নি-উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে দেশের একটি সহজ লভ্য ও উপকারী সার বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত যাহাতে গোময়ের এই অপব্যয় নিবারিত হয়।

সাধারণ কৃষকের পক্ষে গোময়-সার যেমন সহজলভ্য এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু গোময়ের মধ্যে সারাংশ বেশী নাই বলিয়া উহা জমিতে অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রতি বিঘা জমিতে অবস্থাভেদে ৫০ মণ হইতে ১৫০ মণ গোময় প্রয়োগ হইলে সারের কার্য্য উত্তমরূপে হইতে পারে।

উল্লিখিতরূপে চৌবাচ্চাতে প্রস্তুতকরা গোময়-সার বীজবপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে জমিতে প্রয়োগ করিয়া জমিখানা লাঙ্গল-দিয়া চাষ করিয়া দিলেই চলে। কিন্তু তাজা সার প্রয়োগ করিতে হইলে উহা বীজবপনের অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব্বে জমিতে প্রয়োগ করিয়া কর্ষণ দ্বারা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিতে হইবে।

গোবর সার প্রয়োগ দ্বারা এঁটেল ও বেলে উভয় প্রকার মাটিরই নিজ নিজ গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া চাষের পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠে। বেলে মাটিতে গোবর সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য করে।

আলু প্রভৃতি শস্য যাহাদের গাছ অত্যন্ত দুর্ব্বল সেই শ্রেণীর শস্যে কখনও কাঁচা গোবর সার প্রয়োগ করিতে নাই। কারণ কাঁচা গোবর সাররূপে ব্যবহৃত হইলে নানা প্রকার কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হইয়া গাছগুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাঁচা গোবর প্রয়োগের ফলে জমিতে নানাপ্রকার আগাছাও জন্মিয়া থাকে; তরল অবস্থায় ইহাতে যবক্ষারজান শতকরা ১·০৫ ভাগ ও পটাশ ১·৩৬ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

অশ্ব-বিষ্ঠা

অশ্ব-বিষ্ঠা গোময় অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য হইলেও গোময় সার অপেক্ষা ইহার তেজ অনেক অধিক। ইহাতে যবক্ষারজান শতকরা ·৫২ হইতে·৫৬ ও ফস্‌ফরিক এসিড ·৩৫ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অণুগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা, কাজেই সহজে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, এবং সেই জন্য জমিতে প্রয়োগ করা সহজসাধ্য। অশ্বের বিষ্ঠা গোময়ের সহিত মিশ্রিত করিয়াও জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ছাগ, মেষ প্রভৃতির বিষ্ঠা

গোময় ও অশ্ব-বিষ্ঠা হইতে ইহারা অধিক শক্তিশালী। এই সকল পশুর বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অপেক্ষা কৃষিক্ষেত্রে এই সকল

পশু চড়াইয়া ক্ষেত্র যখন তাহাদের বিষ্ঠায় ভরিয়া যাইবে তখন লাঙ্গল দিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়াই সুবিধাজনক। তাজা মেষ-বিষ্ঠা বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে জলের ভাগ—শতকরা ৫৭·৭৫০, অন্যান্য জৈব পদার্থের ভাগ ১৫·৮৬০, যবক্ষারজানের ভাগ ·৮৪৮ এবং ফস্‌ফরিক এসিডের ভাগ ·০৫৯ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষ্ঠা শুষ্ক ও বিশুদ্ধ অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যবক্ষারজানের ভাগ শতকরা ১·৬ ও জলের ভাগ ৬·৫ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

পক্ষি-বিষ্ঠা

ইহা সংগ্রহ করা একটু কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে গৃহপালিত হাঁস, পায়রা, মুরগী প্রভৃতি পাখীর বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে অন্ততঃ ২।৩ বিঘা জমিতে উহাদ্বারা সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অতি উগ্র সার; সুতরাং জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়। যবক্ষারজান পায়রার বিষ্ঠায় শতকরা ১·৭৫ ভাগ ও হাঁসের বিষ্ঠায় ১·০০ ভাগ থাকে। মুরগীর বিষ্ঠায় যবক্ষারজান ১·৬৩ ভাগ ও এমোনিয়া ১·৯৮ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন দেশে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে সামুদ্রিক পক্ষিগণের বিষ্ঠা শুষ্ক হইয়া স্তূপাকার ধারণ করে। ইহাকে শুষ্ক সার বলে। এই সারে শতকরা ১২ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১২ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড পাওয়া যায়। সার-ব্যবসায়িগণ এই সার সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সার যত নূতন অবস্থায় পাওয়া যায় ইহাতে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস উভয়ই তত অধিক পরিমাণে থাকে, কিন্তু যতই পুরাতন হয়, ইহার নাইট্রোজেনের ভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া নষ্ট হইয়া অতি অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকে। ফলে ইহা ফস্‌ফরাস প্রধান সাররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। কার্য্যকারিতা হিসাবে এই সারটি একটি উৎকৃষ্ট সারের মধ্যে গণ্য।

পতঙ্গ-বিষ্ঠা

ইহা বিষ্ঠা শ্রেণীর সারের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পঙ্গপাল প্রভৃতি শস্য-ধ্বংসকারী পতঙ্গগণের বিষ্ঠা দ্বারা জমির বিশেষ উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ দেশের যে অঞ্চলে রেশমের চাষ করা হয়, তথায় তুঁত-বৃক্ষস্থিত রেশম-কীটের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রেশম-কীটের বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্ট সার; ইহাতে যবক্ষারজানের ভাগ শতকরা ১·৪৪ থাকে। কিন্তু তুঁতগাছ, যাহা হইতে রেশম-কীটের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়, তাহাতে ইহা ব্যবহার করায় একটু ভয় আছে; কোন কোন রেশম-কীটের ব্যাধি এই পুরীষ হইতে সুস্থ কীটকেও আক্রমণ করিতে পারে, সেই জন্য তুঁতগাছের বৃদ্ধি হইলেও এই সার-প্রয়োগে কীটের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। সেই জন্য এই সব বিষ্ঠা অন্য শস্যে ব্যবহৃত হইলে ফসল ভাল হয় এবং অনিষ্টের কোন সম্ভাবনাও থাকে না।

এতদ্ব্যতীত মনুষ্য-বিষ্ঠা দ্বারাও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু নানা কারণে এদেশের কৃষকগণ তাহা ব্যবহার করিতে চাহে না। কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহার বহুল প্রচলন আছে। বাংলা দেশের বাহিরে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মৃত্তিকায় বড় বড় চৌবাচ্চার মত গর্ত্ত করিয়া তাহাতে তরল বিষ্ঠা ও মাটি মিশাইয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (natural process) শুষ্কাকারে পরিবর্ত্তিত করা হয়; তখন ইহাতে দুর্গন্ধ অতি অল্পই থাকে বা থাকে না বলিলেও চলে। এই অবস্থায় ইহা অনেক মূল্যবান্ শস্যে ব্যবহৃত হয়। বাংলা দেশেও কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি এক বিশেষ প্রকার অগভীর খাদ্ খনন করিয়া এই বিষ্ঠা জমিতে প্রয়োগ করেন; এবং কখন বা ইহা এক আধুনিক প্রক্রিয়ায় চূর্ণীভূত হইয়া নর্দ্দমার ধোয়ানী ময়লার (sewage) সহিত মিশ্রিত হইয়া সাররূপে ব্যবহৃত হয়। মানুষের বিষ্ঠা যে একটি উৎকৃষ্ট সার তাহা কলিকাতার ধাপার মাঠের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে

বোধগম্য হইবে। কিন্তু এই সারে নাইট্রোজেন বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকার দরুন ইহা অত্যধিক প্রয়োগ করিলে শস্যের উদ্ভিজ্জ অংশ নিতান্ত দ্রুত বাড়িয়া উঠে এবং ফুল-ফলের অংশ সেই অনুপাতে কম হয়।

মূত্র সার

মূত্র এদেশে সাররূপে ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। কৃষকগণের অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। পশুগণের মূত্র তাহাদের বিষ্ঠা হইতে অধিকতর সারবান্। গবাদি পশুর মূত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে তাহাতে জলের ভাগ শতকরা ৯৫, অন্যান্য জৈবাংশের ভাগ ৩·৫০, যবক্ষারজানের ভাগ ·৫৬, ফস্‌ফরিক এসিডের ভাগ ·০২, পটাশের ভাগ ১·১৩ ও চূণের ভাগ ·১২ পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশের কৃষকগণ কখন উহা ব্যবহার করে না। গোশালা হইতে গোমূত্র সংগ্রহ করিয়া উহা ২০ গুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে জমি উর্ব্বর হইয়া উঠে।

সবুজসার বা সজীসার

ধইঞ্চা, শণ প্রভৃতি সিম্বাদিজাতীয় শস্য বায়ুমণ্ডল হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, এই জন্য ঐ জাতীয় গাছ কাঁচা অবস্থায় চাষ করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিপায়; ঐ সারের নাম সবুজসার বা সজীসার। ডাক্তার লেদার কতকগুলি সিম্বাদি শস্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তিনি যবক্ষারজানের ভাগ মুগে শতকরা ·৩৯৬; মাসকলাইয়ে (১) ·৪০১ ও (২) ·৪৫২; কুলত্তীতে (কুলত্থ) ·৩৯১ ও নীলে (১) ·৭৪৫ ও (২) ·৮৭৩ দেখিতে পান। আমন ফসলের বীজ বপনের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে ঐ জমিতে সবুজসার চাষ করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়, যেন উহা পচিয়া উত্তমরূপে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। গাছগুলি অন্ততঃ ২।৩ মাস হইলেই সারের উপযুক্ত হয়। মটর, খেঁসারী ইত্যাদি গাছগুলি

কোমল, ঐগুলি লাঙ্গল-দিয়া চাষ করিয়া মইএর সাহায্যে সহজে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু ধইঞ্চা ইত্যাদির গাছ ২।৩ মাসে অত্যন্ত বড় হইয়া যায়। সুতরাং চাষের পূর্ব্বেই ঐগুলি কাটিয়া ছোট ছোট খণ্ড করিয়া দিতে হয়।

সবুজসার প্রয়োগের পর ছাই ২ মণ এবং চুণ ১ মণ একসঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে ঐ কাঁচা পাতা ও ডালগুলি সহজে পচিয়া সারে পরিণত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাই ও চুণের প্রভাবে শস্যের অনিষ্টকারী কীটসমূহও নষ্ট হইয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ সার

তরুলতা কিংবা তাহাদের শাখাপত্রাদি পচিয়া যে সার হয় তাহাকে উদ্ভিজ্জ সার কহে। গলিত উদ্ভিদের সার একটি অতি উৎকৃষ্ট সার বলিয়া পরিগণিত। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অতি সহজ। একটি গর্ত্তের মধ্যে বৃক্ষের পত্রাদি এবং লতা, গুল্ম ইত্যাদি বৎসর কাল ফেলিয়া রাখিলেই উহা পচিয়া সারে পরিণত হয়, পরে উহা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ছোট অথবা কোমল চারা গাছে উদ্ভিজ্জ সার প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ ঐ সারের মধ্যে প্রায়ই একপ্রকার কীট থাকে, উহা কোমল শস্যের কোমলতর শিকড়গুলি কাটিয়া দেয়। অতএব চারাগুলি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ সার প্রয়োগ করা উচিত নহে। টবে কোন প্রকার গাছ জন্মাইতে হইলে উহাতে অন্ততঃ অর্দ্ধ পরিমাণ সার দিতে হয় নতুবা গাছ সতেজ হইতে পারে না ।

বোঁদমাটি (Peat)

নানাপ্রকার গলিত উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ পদার্থ বৃষ্টির জলে চালিত হইয়া পুষ্করিণী এবং ডোবার তলাতে সঞ্চিত হইয়া যে মাটির স্তর প্রস্তুত করে উহাকে বোঁদমাটি বলে। এই মাটি উঠাইয়া জমিতে প্রয়োগ

করিলে উহা উত্তম সারের কার্য্য করে। পুষ্করিণীর শুষ্ক এবং পচা আগাছা বিশ্লেষণ করিয়া যবক্ষারজানের ভাগ শতকরা ১·৬৪, ফস্‌ফরিক এসিডের ভাগ ০·৪২, এবং পটাশের ভাগ ১·৭৭ পাওয়া গিয়াছে।

খৈল সার

সাধারণ সার-পর্য্যায়ের মধ্যে খৈল একটি প্রধান সার। ইহাদের মধ্যে সরিষা, তিল, মসিনা, রেড়ী, চীনেবাদাম, কার্পাস-বীজ, পোস্ত, নারিকেল, কুসুমফুল, মহুয়া প্রভৃতি হইতে খৈল উৎপন্ন হয়। চীনেবাদাম, রেড়ী, কুসুমফুল এবং পোস্তর খৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। খৈল সার চূর্ণ করিয়া বীজ বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে জমিতে প্রয়োগ করিতে হয়; অবস্থা বিশেষে পরে প্রয়োগ করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। খৈল সার সর্ব্বদাই মাটির উপরে প্রয়োগ করিতে হয়। মাটির নীচে বসিয়া গেলে কার্য্যকরী হয় না। যে জমিতে যতটা খৈল প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা একেবারে না করিয়া ২।৩ দিন পরে দুইবারে প্রয়োগ করা উচিত, কারণ, খৈল অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যায়।

ধান, পাট প্রভৃতি ফসলের জন্য প্রতি বিঘাতে ১ হইতে ২ মন এবং ইক্ষু, আলু, তামাক প্রভৃতি শস্যের জন্য প্রতি বিঘাতে ২ মণ খৈল সার প্রয়োগ করা উচিত।

সাধারণ সার-পর্য্যায়ে উল্লিখিত বিবিধ সার ব্যতীত মৎস্য, রক্ত, চর্ম্ম, শৃঙ্গ, ক্ষুর ও চুল ইত্যাদি পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু এই সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল না।

বিশেষ সার

বিশেষ সার প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। (১) যবক্ষারজান-প্রধান, (২) প্রস্ফুরক-প্রধান, (৩) পটাশ-প্রধান, (৪) এবং চুণ-প্রধান। উল্লিখিত চারিটি গুণ-বিশিষ্ট পদার্থ কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। একই জমিতে কোন একটি বিশেষ ফসল বারবার উৎপন্ন করার দরুন ঐ শস্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক বা তদধিক

উপাদান ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। উপযুক্তভাবে সার প্রয়োগ দ্বারা ঐ অভাব পূরণ করিয়া না দিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

যবক্ষারজান-প্রধান সার

পটাশিয়াম্ নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড বা লাইম নাইট্রোজেন (Calcium Cyanamide or Lime Nitrogen), এমোনিয়াম ক্লোরাইড, এমোনিয়াম সালফেট, পুষ্করিণীর তলার মাটি, ঘরের ঝুল, রক্ত, পশমের ছাঁট, শুঁটকী মাছ, চিঙ্গড়ী ইত্যাদি নাইট্রোজেন-প্রধান সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পটাশিয়াম নাইট্রেট বা সোরা কঠিন পদার্থ। কঠিন অবস্থায় উহা জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়। অবস্থা বিশেষে ইহা জলের সহিত মিশাইয়াও সেচন করা যায়। বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার সময় কদাচ সোরা সার প্রয়োগ করা উচিত নহে। গাছগুলি একটু বড় হইলে উহা জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়। সোরা সারের বিশেষ গুণ এই, উহা উদ্ভিদের পত্রোদ্গমের সহায়তা করে এবং পাতাগুলিকে খুব পুষ্ট ও সতেজ করিয়া তোলে। নানা জাতীয় ঘাস, শাক-সব্জী, তামাক ইত্যাদি অর্থাৎ যে সকল ফসলে কেবল পাতার প্রয়োজন, সে সকল ফসলের জমিতে সোরা সার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অবস্থা বিশেষে ইহা ধান, গম, যব ইত্যাদির জমিতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে দশ বার সের সোরা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ভূমি ভিন্ন সোরা সার প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রয়োগ করিলেও অস্থি-সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ মৃত্তিকা-নিহিত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলিকে সোরা অতি শীঘ্র দ্রবণীয় করিয়া দেয়। অনুর্ব্বর ভূমিতে স্বভাবতঃই উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ অল্প বিদ্যমান থাকে। তাহার উপর ঐ ভূমিতে সোরা সার প্রয়োগ করিলে ঐ অল্প পরিমাণ আহার্য্যগুলি দ্রবণীয় হইয়া সহজেই অপচয় হইতে পারে।

অড়হর, মটর, সিম প্রভৃতি সিম্বী জাতীয় ফসলের জন্য সোরা সার প্রয়োগ করিতে হয় না; কারণ এই জাতীয় গাছ নিজেই বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে পারে।

প্রস্ফুরক-প্রধান সার

অস্থিতে প্রস্ফুরকের ভাগ বেশী, এই নিমিত্ত অস্থি প্রস্ফুরক সার-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্থিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থায় পরিণত করিয়া সাররূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যথা—অস্থিচূর্ণ, অস্থিদ্রব, অস্থিভস্ম। বেসিক্ সুপারফস্ফেট, সুপারফস্ফেট অব লাইম, বেসিক্ স্লেগ্ (ইসপাতের কারখানার আবর্জ্জনা), ফ্লাওয়ার ও রক্ ফস্ফেট, মিনারেল সুপারফসফেট্, কচ্ছপের খোলার চূর্ণ, টেট্রা-ফস্ফেট ইত্যাদি এই জাতীয় সারের মধ্যে পরিগণিত।

অস্থিসার প্রয়োগে ফল, ফুল ও মূলের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, ফল এবং মূলের মিষ্টত্ব এবং শস্যগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উঠে। গম, ধান, যব, আলু, মূলা, সালগম, কপি, ইক্ষু প্রভৃতির জমিতে অস্থিসার প্রয়োগ করা সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়।

সর্ষপ, রেড়ী, কাপাস-বীজ, নারিকেল, চীনেবাদম, কুসুমফুল ইত্যাদি শস্যের খৈল অস্থি হইতে একেবারে স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও ঐগুলির মধ্যে অস্থির প্রায় যাবতীয় গুণই বিদ্যমান আছে। খৈল প্রয়োগের প্রণালী সাধারণ-সার পর্য্যায়ে বলা হইয়াছে।

পটাশ-প্রধান সার

এদেশে কোন প্রকার খনিজ পটাশ সারের প্রচলন নাই। ইউরোপে কাইনাইট্ ও মিউরিয়েট্ প্রভৃতি পত্রকের যৌগিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পটাশলবণ, সালফেট অব পটাশ, কাইনাইট্ প্রভৃতি পটাশ সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

পটাশ সার প্রয়োগে উদ্ভিদের পত্রোদ্গমের সুবিধা হয়, শস্যের শ্বেতসার বৃদ্ধি পায় এবং মূলেরও পুষ্টি সাধন করে।

সিম্বাদিজাতীয় শস্যে এই শ্রেণীর সার প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

গোবর, কলার বাস্‌না, তামাক গাছ, বিষকাটালী, কচুরী-পানা প্রভৃতির ছাইয়ে পটাশের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী। খৈলের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ পটাশের অংশ আছে, তাহা দ্বারাও পটাশ সারের কাজ চলিতে পারে; সাধারণতঃ মাটিতে পটাশ একটু বেশী থাকে, সুতরাং অনেক স্থানেই পটাশ সাররূপে প্রয়োগ না করিলেও চলে।

চূণ-প্রধান সার

চূণ, শম্বুক, ঝিনুক, ঘুটিং ইত্যাদি চূণ-সার শ্রেণীর অন্তর্গত। সদ্যো-জাত চূণ অত্যন্ত তীব্র। চূণ সাক্ষাৎভাবে কোনও ফসলে প্রয়োগ করা উচিত নহে, কেন না উহাতে শস্যের উপকার না হইয়া অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব চূণ প্রয়োগ করিতে হইলে জমি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে জমিতে উহা ছড়াইয়া ভালরূপে মিশাইয়া দিতে হয়। ইহার মাসাধিক কিংবা সুবিধা হইলে আরও বেশী দিন পরে বীজ বপন করিতে হয়। জমিতে ভিজা অবস্থায় চূণ সার প্রয়োগ করা উচিত নহে। ইহাতে চূণ মাটির সহিত মিলিত হইয়া কঠিন ডেলার আকার ধারণ করে।

চাষের পরে মাটি যখন শুকাইয়া যায় এবং বাতাস যখন কম থাকে, তখন জমির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটু সাবধানে সমান ভাবে চূণ ছড়াইয়া যাইতে হয়। বাতাস বেশী থাকিলে চূণ চারি দিকে উড়িয়া যায় এবং সমভাবে ছড়াইয়া যাইতে পারে না। সমভাবে চূণ ছড়ানো হইয়া গেলে লাঙ্গল দ্বারা কয়েকবার চূণ ও মাটি উত্তমরূপে মিলাইয়া দিতে হয়।

মাটির মধ্যে উদ্ভিদের অন্যান্য যে সকল খাদ্য আছে, চূণ সার প্রয়োগে তাহার কতকগুলি সত্বর দ্রবশীল হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয়। চূণ সার উদ্ভিদের ফুল ও ফল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। এই জন্যই যে সকল গাছ বহুপল্লবিত হইয়া ফুল ও ফলহীন হয়, তাহাতে চূণ সার প্রয়োগ দ্বারা সুফল পাওয়া যায়।

পরোক্ষ সার-প্রয়োগ

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিতে উল্লিখিত সারগুলি প্রয়োগ না করিয়াও উহার প্রতিপোষক নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষেত্রের কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।

(১) ভূমি কর্ষণ করিলে বৃষ্টি, উত্তাপ প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে (weathering process) মাটির অভ্যন্তরস্থ পদার্থগুলি ধীরে ধীরে শস্যের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে এবং মাটির এক প্রকার জীবাণু (Azoto-bacter) বায়ু-সংমিশ্রণের সুযোগে নিজের অবয়ব-বৃদ্ধির সুবিধা পায়; ফলে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন এই চক্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেনের অংশ বাড়াইয়া তোলে এবং মাটির উন্নতি সাধন করে।

(২) সাধারণতঃ কূপের জলের সহিত উদ্ভিদের নানা জাতীয় আহার্য্য মিশ্রিত থাকে। ঐ জল জমিতে সেচন করিলে ক্ষারজাতীয় সার প্রয়োগের ফল হয়।

(৩) অনেক সময়ে কৃষকগণ গবাদির খাদ্যের জন্য মটর, মাষকলাই, খেঁসারী প্রভৃতি সিম্বাদিজাতীয় শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। ঐ জাতীয় শস্য আপন প্রকৃতি-অনুসারে বায়ুমণ্ডল হইতে কতক পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে; সুতরাং পূর্ব্বে সিম্বাদিজাতীয় শস্য জন্মাইয়া ঐ জমিতে পরে অন্য ফসল করিলে সোরা জাতীয় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের কার্য্য কতক পরিমাণে সম্পাদিত হয়।

(৪) অকর্ষিত অবস্থায় জমিতে গরু চরাইলে অথবা জমির উপর দিনের বেলায় গবাদির থাকিবার স্থান করিয়া দিলে উহাদের পরিত্যক্ত মল-মূত্র দ্বারা জমির উর্ব্বরতা অধিক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে।

(৫) ক্ষেত্রজাত আগাছাগুলি কাটিয়া ক্ষেত্রেই পোড়াইয়া দিলে উহা দ্বারা মাটির অম্লত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং ছাইগুলি ক্ষার সারের কার্য্য করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অনিষ্টকারী কীটগুলিও অগ্নিতে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়

শস্যাবর্ত্তন বা শস্যের ক্রমপর্য্যায়

একই ভূমিতে একই শস্যের পুনঃ পুনঃ চাষ হইলে ঐ ভূমিস্থিত উপাদানগুলি অপরিমিতভাবে ব্যয় হওয়ার দরুন উহা অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে এক ভূমিতে বিভিন্ন শস্যের চাষ করিলে ঐ ভূমিস্থিত উদ্ভিদের আহার্য্য উপাদানগুলি পরিমিতভাবে ব্যয় হওয়ার দরুন উহার উর্ব্বরতা-শক্তির হ্রাস হইতে পারে না। অতএব একই ভূমিতে একই শস্যের পুনঃ পুনঃ চাষ না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ শস্যের চাষ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ এক ভূমিতে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ করাকে শস্যাবর্ত্তন (Rotation of crops) বা শস্যপর্য্যায় বলে।

এই শস্যাবর্ত্তন প্রণালী অবলম্বন দ্বারা জমির উর্ব্বরতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা কৃষকগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। যে সকল স্থান প্রতিবৎসর বর্ষাগমে নদীর জল দ্বারা প্লাবিত হইয়া নূতন পলিস্তরে আচ্ছাদিত হয়, সে সকল স্থানে শস্যোৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ কিংবা শস্যাবর্ত্তনের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না এবং তথায় প্রতিবৎসর একই ভূমিতে পুনঃ পুনঃ এক ফসল উৎপাদন করিলেও তজ্জনিত ঐ ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি অধিক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ সুবিধা সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

বিভিন্ন জাতীয় ফসল যেমন মৃত্তিকা-নিহিত আহার্য্য পদার্থগুলি বিভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করে, তেমন বিভিন্ন জাতীয় ফসল মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অড়হর, মটর, ছোলা, পাট প্রভৃতি দ্বিদল বীজজাত (Dicotyledon) শস্যগুলি কাণ্ডমূল (Tap root) বিশিষ্ট বলিয়া উহাদের মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্নে প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকাস্থিত আহার্য্য উপাদান গ্রহণ করে; আবার

ধান, গম, যব, প্রভৃতি একদল বীজজাত (Mono-cotyledon) শস্যগুলি গুচ্ছমূল (Fibrous roots) বিশিষ্ট বলিয়া উহাদের মূল মৃত্তিকার অধিক নিম্নে প্রবিষ্ট হয় না, সুতরাং উহারা উপরিস্তর হইতেই আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় কাণ্ডমূল-বিশিষ্ট শস্য উৎপাদনের পরেই গুচ্ছমূল-বিশিষ্ট শস্যের চাষ করিলে ঐ সময়ের জন্য নিম্নস্তরের মৃত্তিকা বিশ্রাম পায়।

শস্যের রোগোৎপাদক এবং শস্যধ্বংসকারী কীটসমূহের মধ্যে বহু প্রকার জাতি আছে। উহাদের বিভিন্ন জাতি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শস্যের অনিষ্ট সাধিত হয়। যে সকল পোকা ধানের অনিষ্ট সাধন করে, সে সকল পোকা আলুর অনিষ্ট করে না; আবার যে সকল পোকা আলুর অনিষ্ট সাধন করে, সে সকল পোকা পাটের অনিষ্ট সাধন করে না। শস্যের অনিষ্টকারী পোকাগুলি একবার শস্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষেত্র হইতে পরিপক্কাবস্থায় ঐ শস্য কাটিয়া লওয়ার পরেও উহারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বাস করিতে থাকে, পরবর্ত্তী বৎসর পুনরায় ক্ষেত্রে সেই শস্য উৎপাদন করিলে ঐ শস্যসকল ঐ কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এক ক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ করিলে ঐরূপ আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না।

সিম্বাদিজাতীয় শস্যের একটি প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ঐ শস্য ক্ষেত্রে উৎপাদন করিলে মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের অংশ বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষেত্রস্থিত আগাছা ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া যায়। সাধারণতঃ পূর্ব্ববৎসরের যে সকল আগাছার বীজ মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহা দ্বারাই পরবর্ত্তী বৎসর ক্ষেত্রে আগাছা জন্মে। সুতরাং শস্যের ক্রমপর্য্যায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সিম্বাদিজাতীয় শস্য, অর্থাৎ মটর, মুগ, কলাই, ধইঞ্চা এবং সরিষা প্রভৃতি উৎপাদন করিলে একাধারে ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের অংশ বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষেত্র আগাছা-শূন্য হওয়ায় পরবর্ত্তী শস্যে আগাছা উৎপাদনের আশঙ্কা রহিত হইতে পারে। সিম্বাদিজাতীয় শস্যের পরে ক্ষেত্রে ধান্য উৎপাদন করিলে উহার ফসল ভাল হয়।

সকল প্রকার মৃত্তিকাতে এক প্রণালীতে শস্যাবর্ত্তন করা চলে না। বেলে, এঁটেল, দো-আঁশ, উচ্চ এবং নীচ-ভেদে বিভিন্নরূপে পর্য্যায় নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। পর্য্যায়-নির্ণয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।—

(১) স্থানীয় জল-বায়ু।

(২) জমির যান্ত্রিক গঠন, অর্থাৎ উহা এঁটেল কি বেলে, উচ্চ কি নিম্ন ইত্যাদি।

(৩) কোন্ শস্য কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে গ্রহণ করে।

(৪) ফসলের শিকড়ের স্বভাব, অর্থাৎ উহা গুচ্ছমূল কি কাণ্ডমূল-বিশিষ্ট।

(৫) ক্ষেত্রজাত আগাছার অবস্থা।

(৬) পূর্ব্ববর্ত্তী শস্যের ব্যাধি ও পোকা ইত্যাদির অবস্থা।

বাংলার শস্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কার্য্যকরী ও ফলপ্রদ হওয়াতে পরবর্ত্তী তিনটি পৃষ্ঠায় সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

উর্ব্বর, উচ্চ, বালুকা-প্রধান অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকার উপযোগী বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়।—

(১) এক বৎসরে তিনটি ফসল।

১ম ফসল—কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত অধিক সার প্রয়োগে আলু।

২য় ফসল—আলুর পরেই চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করিবার জন্য ভুট্টা অথবা ধইঞ্চা।

৩য় ফসল—ভুট্টার একমাস পরে চাষ-আবাদ করিয়া এবং সার প্রয়োগ দ্বারা রোপা আশুধান্য। ভুট্টার পরিবর্ত্তে যদি ধইঞ্চার চাষ করিয়া উহা কাঁচা অবস্থায় চষিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিনা সারেই আশুধান্য রোপণ করা যাইতে পারে।

উচ্চ ও বালুকাপ্রধান অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকার উপযোগী—পাঁচ বৎসরের পর্য্যায়

	১ম খণ্ড ভূমি	২য় খণ্ড ভূমি	৩য় খণ্ড ভূমি	৪র্থ খণ্ড ভূমি	৫ম খণ্ড ভূমি
১ম বৎসর	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে ভাদ্র)। কলাই ও সর্ষপ। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। মুগ ও তিল। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। আলু। (কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন)।	ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ফাল্গুন)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।
২য় বৎসর	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। মুগ ও তিল। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। আলু। (কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন)।	ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ফাল্গুন)।
৩য় বৎসর	ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ফাল্গুন)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে ভাদ্র)। কলাই ও সর্ষপ। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। মুগ ও তিল। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। আলু। (কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন)।
৪র্থ বৎসর	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। আলু। (কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন)।	ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ফাল্গুন)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে ভাদ্র)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে ভাদ্র)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। মুগ ও তিল। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।
৫ম বৎসর	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। মুগ ও তিল। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। আলু। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ফাল্গুন)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। কলাই। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আশু ধান্য। (বৈশাখ হইতে ভাদ্র)। কলাই ও সর্ষপ। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।

নিম্ন ও কর্দ্দমপ্রধান মৃত্তিকার উপযোগী—ছয় বৎসরের পর্য্যায়

(১ম বর্ষ হইতে ৩য় বর্ষ পর্য্যন্ত)

	১ম খণ্ড ভূমি	২য় খণ্ড ভূমি	৩য় খণ্ড ভূমি	৪র্থ খণ্ড ভূমি	৫ম খণ্ড ভূমি	৬ষ্ঠ খণ্ড ভূমি
১ম বর্ষ	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। তরমুজ, ফুটি ও ঝিঙ্গা-(মাঘ হইতে বৈশাখ)।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পাট—(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। খেঁসারী ও মসূর—(কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ) অথবা জলী ইক্ষু—(ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী ফাল্গুন)।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পতিত।
২য় বর্ষ	পতিত।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। তরমুজ, ফুটি ও ঝিঙ্গা—(মাঘ হইতে বৈশাখ)।	আমন ধান্য—জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পাট—(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। গম, মসিনা—(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	মন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ) অথবা জলী ইক্ষু—(ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী ফাল্গুন)।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।,
৩য় বর্ষ	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পতিত।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। তরমুজ, উচ্ছে, ঝিঙ্গা—(মাঘ হইতে বৈশাখ)।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পাট—(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। গম, মসিনা, খেঁসারী বা মসূর—(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আমন ধান্য—(জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ) অথবা জলী ইক্ষু—(ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী ফাল্গুন)।

নিম্ন ও কর্দ্দমপ্রধান মৃত্তিকার উপযোগী—ছয় বৎসরের পর্য্যায়

(৪র্থ বর্ষ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যান্ত)

	১ম খণ্ড ভূমি	২য় খণ্ড ভূমি	৩য় খণ্ড ভূমি	৪র্থ খণ্ড ভূমি	৫ম খণ্ড ভূমি	৬ষ্ঠ খণ্ড ভূমি
৪র্থ বর্ষ	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। অথবা জলী ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী ফাল্গুন)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পতিত।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। তরমুজ, উচ্ছে, ইত্যাদি। (মাঘ হইতে বৈশাখ)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। গম, খেঁসারী, মসিনা ইত্যাদি। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।
৫ম বর্ষ	পাট। বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। গম, খেঁসারী, মসুর, মসিনা ইত্যাদি। (কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ) ; অথবা জলী ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী ফাল্গুন)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পতিত।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। তরমুজ ও তরিতরকারী (মাঘ হইতে বৈশাখ)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।
৬ষ্ঠ বর্ষ	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পাট। (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)। গম, মসুর, মসিনা। (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ) ; অথবা জলী ইক্ষু। (ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী ফাল্গুন)।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)।	পতিত।	আমন ধান্য। (জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ)। তরিতরকারী। (মাঘ হইতে বৈশাখ)।

[চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সকল স্থানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, সেই সকল স্থানে এই পর্য্যায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।]

(২) তিন বৎসরে ছয়টি ফসল।

১ম ফসল—কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত আলু।

২য় ফসল—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কাঁচা সংগ্রহ করিবার জন্য ভুট্টা।

৩য় ফসল—আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ধইঞ্চা।

৪র্থ ফসল—কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত আলু।

৫ম ফসল —ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী মাঘ ইক্ষু।

৬ষ্ঠ ফসল—চৈত্র হইতে আশ্বিন ধইঞ্চা।

[এই পর্য্যায় অবলম্বন করিতে হইলে ধইঞ্চার বীজ ভুট্টার গাছে মাটি চাপাইবার পরেই ছিটানো উচিত।]

(৩) দুই বৎসরে তিনটি ফসল।

১ম বৎসর—১ম ফসল—ধইঞ্চা—জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র।

১ম বৎসর—২য় ফসল—আলু বা কপি— কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন।

২য় বৎসর—৩য় ফসল—ইক্ষু—ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী মাঘ।

প্রতি বৎসর পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি পতিত রাখিয়াও জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করা যায়। ঐরূপ করিতে হইলে যে কৃষকের ৩০ বিঘা জমি আছে তাহাতে প্রতি বৎসর ৬ বিঘা হিসাবে জমি পতিত রাখিয়া এবং ঐ জমিতে সম্বৎসর ব্যাপিয়া গো, মহিষাদি পশু চরাইয়া উহাদের মলমূত্র দ্বারা সারবান্ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকারে প্রতি-বৎসর ৬ বিঘা হিসাবে জমি বিভিন্ন স্থানে পতিত রাখিয়া গো, মহিষাদি চরাইলে প্রতি ৫ বৎসরে সমস্ত জমি (৩০ বিঘা) সারবান্ হইতে পারে। প্রতি বৎসর $\frac{1}{5}$ জমি পতিত রাখিয়া জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করা কৃষকের পক্ষে বিশেষ লাভজনক মনে হয় না; ইহা অপেক্ষা শস্যাবর্ত্তন, অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন করিয়া জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করাই সমীচীন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি

সচরাচর যে সকল শস্য সার প্রয়োগ ব্যতীত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে না, ঐ সকল শস্য বিনা সার প্রয়োগেও যে মৃত্তিকাতে উত্তম উৎপাদিত হয়, সেই মৃত্তিকাই নিঃসংশয়িত ভাবে উর্ব্বরা ভূমি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

উপযুক্ত সময়ে পারমিত বৃষ্টিপাত হইলে বিনাসার প্রয়োগে যে ভূমিতে ইক্ষু, আলু, পাট, গোধূম এবং ভুট্টা প্রভৃতি প্রধান প্রধান শস্যগুলি উত্তমরূপে উৎপন্ন হয় ঐ ভূমিকে উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি বলা যাইতে পারে। যে সকল মৃত্তিকাতে ধান, জুয়ার, চিনা, কাওন, সর্ষপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য শস্য বিনাসারে কেবল বৃষ্টিবারির উপর নির্ভর করিয়া উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, কিন্তু উল্লিখিত প্রধান শস্যগুলি বিনাসারে উৎকৃষ্টরূপে উৎপাদিত হয় না উহা অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বর বলিয়া গণ্য হয়।

যে পতিত ভূভাগে নানা জাতীয় বন-জঙ্গল উচ্চ ও ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে জন্মিয়াছে লক্ষ্য করা যায়, তাহার উর্ব্বরতা সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয় থাকে না।

কোন পতিত ভূভাগে অন্যান্য আগাছার সহিত সিম্বীজাতীয় আগাছা, যেমন—কালকাসুন্দে, চুণাকালাই, হেক্‌টি, বাব্‌লা প্রভৃতি জন্মিলে তদ্দ্বারা ঐ ভূমির উর্ব্বরতা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

কোন পতিত ভূভাগের অধিবাসী জীবজন্তুর আকার ও সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ে ঐ ভূভাগের উর্ব্বরতা এবং অনুর্ব্বরতার বিষয় উপলব্ধি করা যায়। যে ভূভাগের মনুষ্য এবং গবাদি পশুর আকৃতি বলিষ্ঠ এবং স্থূল অস্থিবিশিষ্ট, অন্যান্য বনচর পশু ও পাখীগুলি স্বভাবতঃই হৃষ্টপুষ্ট, এবং ভেক, শম্বুক ও সরীসৃপগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও সংখ্যাবহুল, সে ভূভাগ উর্ব্বর বলিয়া গণ্য হয়। কোন

ভূভাগে কেঁচোর সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইলে ঐ ভূমি উর্ব্বরা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কেঁচোগুলি স্বভাবতঃই মৃত্তিকার গভীর স্তর হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া মৃত্তিকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার উর্ব্বরতা সাধন করিয়া থাকে।

মৃত্তিকার বর্ণ এবং যান্ত্রিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও উহার উর্ব্বরতা এবং অনুর্ব্বরতা নির্দ্দেশ করা যায়। কালো এবং পীত বর্ণের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বরা হইয়া থাকে ; এবং সাদা, ধূসর ও অধিক লাল বর্ণের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্ব্বর হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকা শীতকালে, অর্থাৎ নিতান্ত শুষ্ক দিনেও, লাঙ্গল দ্বারা অনায়াসে কর্ষণ করা যায় এইরূপ হাল্‌কা মৃত্তিকা স্বভাবতঃই উর্ব্বরা। বৃষ্টিপাত না হইলে যে মৃত্তিকা সহজে কর্ষণ করা যায় না এইরূপ দৃঢ় মৃত্তিকা অধিকাংশ স্থলেই উর্ব্বরা হয় না। বৃষ্টিবারি-পতন মাত্রই যে জমি হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় এবং যে জমিতে বৃষ্টিবারি অধিককাল দাঁড়াইয়া থাকে, এই উভয় প্রকার মৃত্তিকাই উর্ব্বরা হইলেও কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযোগী নহে। যে মৃত্তিকা বৃষ্টিবারি দ্বারা বিগলিত ও বিধৌত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায় তাহাও কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত নহে। কঠিন এবং হাল্‌কা—এই উভয় প্রকার মৃত্তিকাতে আপন আপন স্বভাবের উপযোগী ফসল জন্মিতে পারে ; যেমন কঠিন মৃত্তিকায় স্বভাবতঃই ধান, পাট এবং ইক্ষু ইত্যাদি ভাল জন্মে ; পক্ষান্তরে হাল্‌কা মৃত্তিকায় সর্ষপ, ফুটি, তরমুজ, চীনেবাদাম প্রভৃতি শস্য চাষের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু দো-আঁশ মৃত্তিকাতে প্রায় সকল প্রকার শস্যই উৎপাদিত হইতে পারে, এই নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের পক্ষে দো-আঁশ মৃত্তিকাই সবিশেষ উপযোগী।

নিম্নলিখিত কতকগুলি উপায় অবলম্বন দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা যায় :—

(১) সার-প্রয়োগ।

(২) কলাই, শণ, অড়হর, ধইঞ্চা, সিম্বীজাতীয় শস্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন।

(৩) বাব্‌লা, মাঁদার প্রভৃতি সিম্বীজাতীয় বৃক্ষ ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে রোপণ।

(৪) পুরাতন পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি শীত ঋতুতে জলশূন্য হইয়া গেলে ঐ সকলের তলার মাটি প্রতিবৎসর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জমির সঙ্গে চাষ করিয়া দেওয়া।

(৫) শীত ঋতুতে জমি চাষ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখা।

(৬) জমিতে পর্য্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন করা (শস্যাবর্ত্তন নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৭) প্রতিবৎসর পর্য্যায়ক্রমে সমগ্র চাষের ভূমির $\frac{১}{৫}$ অংশ পতিত রাখিয়া তাহাতে গবাদি পশু-চারণ।

নানাকারণে জমি অনুর্ব্বর হইতে পারে। যে সকল ভূমি সমতল নহে উহাতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত বীজ বৃষ্টির জলের সঙ্গে চলিয়া যায় এবং তজ্জন্য শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটে। এই নিমিত্ত পর্ব্বত-গাত্রের ঢালু জমিতে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে ঐ জমি কাটিয়া থাকে থাকে সমতল করিয়া লইতে হয়।

যে জমির পৃষ্ঠস্তর অত্যন্ত কঠিন এবং জমাট ঐ জমিতে তৃণাদি ভাল জন্মিতে পারে না। ঐরূপ জমিতে মাঝে মাঝে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া বৃক্ষের চাষ চলিতে পারে।

কোন কোন পতিত ভূভাগে, বিশেষতঃ বালুকাময় পতিত ভূমিতে, কোন একটি বিশেষ জাতীয় আগাছা, যেমন কেশে, কুশ, ঝাঁটি, হোগ্‌লা এবং বনঝাউ প্রভৃতি অমিশ্র ভাবে জন্মিতে দেখা যায়, ঐ সকল উদ্ভিদ্ নিতান্ত নিকৃষ্ট জমিতেও উত্তমরূপে জন্মিতে পারে, সুতরাং ঐ ভূমি অন্যান্য ফসল উৎপাদনের পক্ষে অনুর্ব্বর বলিয়াই গণ্য হয়। যে সকল নদীর চরের মৃত্তিকাতে বালুকার ভাগ অধিক তাহাই উল্লিখিত প্রকারের অনুর্ব্বর হইয়া থাকে। ঐরূপ চরের মৃত্তিকার জঙ্গলে আবাদ করিবার পর তাহাতে ধইঞ্চা, খেঁসারী এবং কলাই বপন করিলে যদি উহা রীতিমত উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে উহা ধান্য এবং অন্যান্য ফসল চাষের উপযোগী হইয়াছে

বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। চরের ভূমি পাটশস্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষকগণ কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে খেঁসারী, কলাই প্রভৃতি ছিটাইয়া বপন করে; ঐ বৎসর উহা রীতিমত উৎপাদিত হইলে, তৎপর বৎসর ঐ জমিতে নিশ্চিতরূপে পাটফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ঊষর মৃত্তিকাতে লবণের ভাগ অত্যন্ত অধিক বলিয়া উহাতে কোন প্রকার শস্য উৎপাদিত হইতে পারে না। ঐরূপ ঊষর জমিতে নালা কাটিয়া বৃষ্টিবারির সঙ্গে ঐ সকল লাবণিক পদার্থ বিধৌত হইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলে কালে শস্যোৎপাদন করা যাইতে পারে।

ফল কথা, এমন কোন প্রকার অনুর্ব্বর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে কোন-না-কোন প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা শস্যোৎপাদন করা যাইতে পারে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভূমিকর্ষণ

যে প্রক্রিয়া দ্বারা জমিকে আলোড়িত করিয়া শস্যের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে অনুকূল করিয়া তোলা হয়, তাহাকে কর্ষণ কার্য্য বলে। কর্ষণ কার্য্য দ্বারা জমির স্থূল অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। কর্ষণের ফলে শস্যের শিকড় বিস্তারের সুবিধা হয়।

কর্ষণ কার্য্য বিবিধ প্রকারের, যথা—

(১) বীজ বপনের উপযোগী করিয়া ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ কর্ষণ করা, (২) শস্য শ্রেণীর মধ্যের (ফাঁকের) জমিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া, (৩) জমি গভীর বা অগভীর ভাবে কর্ষণ করা ইত্যাদি। ৬" (ছয় ইঞ্চির) অধিক গভীর ভাবে কর্ষণ করিলে তাহাকে গভীর কর্ষণ এবং উহার কম হইলে তাহাকে অগভীর কর্ষণ বলে। নিতান্ত অল্প কর্ষণকে সাধারণ ভাষায় "ভাসাচাষ" কহে।

ভূমি কর্ষিত হইলে উহা গুঁড়া হইয়া শস্য সমূহের খাদ্য গ্রহণোপযোগী স্থলের আয়তন বৃদ্ধি করে। গভীর ভাবে কর্ষিত জমিতে শস্যের শিকড় অতি সহজে নীচের দিকে বিস্তৃত হইতে পারে এবং গভীর কর্ষণের ফলে সাধারণতঃ জমির তাপ এবং শৈত্যের সমতা রক্ষা হয়। স্থান-ভেদে গভীর চাষে অপকারও হইতে পারে; যে সকল স্থানে নিয়মিত সার প্রয়োগের ব্যবস্থা নাই সেখানে জমির উর্ব্বরতা সাধারণতঃ উপরেই থাকে। সেখানে গভীর চাষ করিলে নীচের অনুর্ব্বর মাটি উপরে আসিয়া শস্যের অপকার করিবার আশঙ্কা থাকে। বেলী (Baily) সাহেবের মতে—নিকৃষ্ট অধোভূমিতে (subsoil) ইহা দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা রঙ্গপুরের সরকারী গোশালাতেও (Dairy farm) লক্ষিত হইয়াছে।

জমিতে উদ্ভিদের শিকড়-বিস্তারের সুবিধার জন্যই জমি হাল্কা হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু জমি ততটুকু কঠিন রাখাও আবশ্যক যাহাতে উদ্ভিদ্ তাহার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কৃষকগণকে এতদুভয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ভূমি কর্ষণ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ও প্রণিধান-যোগ্য :—

(১) জমি যাহাতে উত্তমরূপে সচ্ছিদ্র (pervious) হয়।

(২) জমির জলধারণ শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়।

(৩) বৃষ্টির জল যাহাতে জমিতে দাঁড়াইয়া না থাকিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এক খণ্ড স্পঞ্জ (Sponge) লইয়া পরীক্ষা করিলে মৃত্তিকার জলধারণ ও জলশোষণ বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মাটি উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হইয়া যতই সচ্ছিদ্র হইবে তাহার জলশোষণ এবং জলধারণ শক্তি তদনুপাতে অধিক হইবে।

জমি কর্ষিত হইলে উহার জলধারণের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া জমির আর্দ্রতা রক্ষিত হয় এবং জমির নিম্নে জল সঞ্চিত থাকিয়া সর্ব্বদা শস্যের হিতসাধন করে।

কর্ষিত ভূমি বায়ু ও সূর্য্যোত্তাপের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলিকে সহজে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য করে। মৃত্তিকাস্থ নাইট্রেট প্রস্তুতকারী জীবাণু (Nitrifying Bacteria) গুলির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়া উদ্ভিদ্-দেহের পরিপোষক নাইট্রেট বৃদ্ধির সহায়তা করে। পক্ষান্তরে জমির অভ্যন্তরস্থ শস্যের অনিষ্টকারী কীটসমূহ কর্ষণের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে এবং ঐগুলি সূর্য্যোত্তাপে মরিয়া যায় বা কাক, শালিক প্রভৃতি পক্ষি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। জমিতে উত্তাপের ন্যূনতা থাকিলে, কর্ষণের ফলে তাহা পূরণ হইয়া যায়। কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকাস্থ জৈবিক পদার্থগুলি সহজে বিশ্লিষ্ট হইয়া মৃত্তিকাকে সারবান্ করিয়া তোলে। সবুজসার ইত্যাদি জমিতে মিশাইতে হইলে, কর্ষণ কার্য্যের দ্বারা উহা সহজে সম্পাদিত হয়। জমি গভীর ভাবে কর্ষিত হইলে উল্লিখিত যাবতীয় প্রক্রিয়াগুলি মৃত্তিকার গভীরতর স্থান পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হয়। বাস্তবিক পক্ষে মৃত্তিকা-কর্ষণ দ্বারা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকাতে সার প্রয়োগের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা পরিপাটি রূপে কর্ষিত হইলে উহার অভ্যন্তরে জল, বায়ু এবং সূর্য্যোত্তাপ অতি সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই জল, বায়ু এবং সূর্য্যোত্তাপের সাহায্যে মৃত্তিকানিহিত সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ দ্রব হইয়া শস্যের গ্রহণের উপযোগী হয়।

ভূমি কর্ষিত হইলে তদন্তর্নিহিত জৈবিকাংশের উপর বায়ুর প্রক্রিয়া-দ্বারা যে কার্ব্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা জলের দ্রবণশীলতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জল, বায়ু এবং উত্তাপের সাহায্যে আরও অনেক প্রকার উপকার সাধিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে মৃত্তিকাতে হিউমিক এসিড (Humic acid), সালফাইড অব আয়রন (Sulphide of Iron) প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ অক্সিজেনের (Oxygen) প্রভাবে সংশোধিত হইয়া উদ্ভিদের পরিপোষকরূপে পরিণত হয়।

জলধারণ এবং জলশোষণ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ বিষয়ে বেলে এবং এঁটেল মাটি * পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। বেলে মাটির জলশোষণশক্তি অধিক, কিন্তু জলধারণশক্তি অল্প। পক্ষান্তরে এঁটেল মাটির জলশোষণশক্তি অল্প, কিন্তু জলধারণশক্তি অধিক। এইজন্যই এঁটেল মাটির উপর জল দাঁড়াইয়া যায় এবং তজ্জন্যই ঐ মাটিতে উৎপন্ন শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বেলে মাটির শস্য তখন সতেজ হইয়া উঠে। বেলে মাটি পিশিয়া উহার শিথিলতা কমাইয়া দিলে

* বেলে মাটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বেলে মাটির দানাগুলি স্বভাবতঃই শিথিল ও পরস্পর অসংলগ্ন; ঐ কারণেই বেলে মাটি স্থূল-ছিদ্রাবশিষ্ট, সুতরাং উহার জলশোষণশক্তি অধিক, কিন্তু জলধারণশক্তি কম। পক্ষান্তরে এঁটেল মাটির দানাগুলি পরস্পর যোগসূত্রে আবদ্ধ বলিয়া সূক্ষ্ম-অন্তর-বিশিষ্ট, সুতরাং উহার জলশোষণশক্তি কম, কিন্তু জলধারণশক্তি অধিক।

জলধারণশক্তি অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং এঁটেল মাটির ঘন-সন্নিবিষ্ট দানাগুলি পুনঃপুনঃ কর্ষণ দ্বারা শিথিল করিয়া দিলে উহার জলশোষণশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া উঠে। এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল পেষণ ও কর্ষণ দ্বারাই বেলে ও এঁটেল মাটি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয় এইরূপ নহে।*

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে গভীর এবং অগভীর চাষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর উপযোগী, সে বিষয়ে অদ্যাপি মতভেদ আছে। এদেশে গভীর কর্ষণ ব্যতীতও অনেক কৃষক শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে, এই প্রমাণের বলে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন গভীর কর্ষণ না করিলেও ভারতবর্ষে শস্যোৎপাদন বিষয়ে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে উহা ভিত্তিহীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত, বর্ত্তমান সময়ে তথায় তদপেক্ষা অল্প শস্য উৎপন্ন হইতেছে। ফলতঃ অগভীর কর্ষণই ঈদৃশ অল্পতার প্রধান কারণ। পুনঃপুনঃ শস্যোৎপাদন দ্বারা ক্ষেত্রের পৃষ্ঠস্তরের মৃত্তিকা (surface soil) ক্রমশঃ অনুর্ব্বরা হইয়া যায়। কৃষকগণ প্রতি বৎসর গভীর কর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্রের নিম্নস্তরাস্থিত শস্যের আহার্য্য উপাদানগুলি পৃষ্ঠস্তরে আনিয়া শস্যের আহারোপযোগী করিয়া দিলে নিশ্চয়ই ক্ষেত্রে উত্তম শস্য উৎপাদিত হইতে পারে। সুতরাং প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে গভীর কর্ষণ করিলে জমির অবনতি ঘটিতে পারে না।

ভূমি গভীর ভাবে কর্ষণ করিলে উদ্ভিদের শিকড় অতি সহজে মৃত্তিকার গভীর তলে প্রবেশ করিতে পারে। নিম্নস্তরের মৃত্তিকা স্বভাবতঃই অধিকতর উর্ব্বরা, সুতরাং গভীরভাবে কর্ষিত ভূমির নিম্নস্তর

* উপরি উক্ত এই দুই জাতীয় মৃত্তিকার পরস্পর সাহায্য দ্বারাও উভয়ের উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে, অর্থাৎ এঁটেল মাটির সঙ্গে কিছু বেলে এবং বেলে মাটির সঙ্গে কিছু এঁটেল মাটি মিশ্রিত করিলে একে অন্যের অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত এই উভয় প্রকারের মৃত্তিকাতে গোময়-সার এবং উদ্ভিজ্জ সার মিশ্রণ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ হয়।

হইতে উদ্ভিদ্ আপন পোষণ উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করিয়া সহজে পরিপুষ্ট হইতে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে বর্ষাবারি সঞ্চিত থাকে; খরতাপের দিনে যখন মৃত্তিকার আর্দ্রতা হ্রাস হইয়া যায়, তখন কৈশিকাকর্ষণের প্রভাবে ঐ জল উদ্ভিদ্-শিকড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পোষণকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

একখণ্ড গভীরভাবে কর্ষিত মৃত্তিকা একখণ্ড অগভীরভাবে কর্ষিত মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে পরিপুষ্ট রাখিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রধান কারণ—গভীরভাবে কর্ষিত মৃত্তিকাতে উৎপন্ন শস্য মৃত্তিকার নিম্নস্তরে শিকড় বিস্তার করিয়া, উপযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অগভীরভাবে কর্ষিত মৃত্তিকা-জাত শস্যের শিকড় নীচের দিকে চলিয়া যাইবার সুযোগ না পাওয়াতে ঐগুলি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া জালের আকার ধারণ করে এবং পৃষ্ঠস্তরের স্বল্পায়তন মৃত্তিকা হইতে বহু শস্য অধিক পরিমাণে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া মাটিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে এবং নিজেরাও উপযুক্ত ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। মোটের উপর দেখিতে গেলে কৃষিকার্য্যে অধিকাংশ স্থলেই গভীর কর্ষণ বিশেষ উপযোগী।

গভর্নমেণ্ট বিবিধ প্রদেশের কৃষিক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গভীর কর্ষণই ভারতীয় ভূমির পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। অনেকে বলিয়া থাকেন মৃত্তিকার নিম্নস্তরে একপ্রকার বিষাক্ত ক্ষার দেখিতে পাওয়া যায়, গভীর কর্ষণের ফলে ঐগুলি উদ্ভিদের শিকড়ের সন্নিধানে আসিয়া, উহাদের হিতকর না হইয়া বরঞ্চ অহিতকর হইয়া দাঁড়ায়; ফলতঃ এদেশের মৃত্তিকার পক্ষে ঈদৃশ আশঙ্কা একপ্রকার অমূলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন স্থলে ঐরূপ মৃত্তিকা প্রকাশ পাইলে বীজ বপনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে জমি গভীরভাবে কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা উল্টাইয়া রাখিলে তদন্তর্নিহিত বিষাক্ত পদার্থ রৌদ্র ও বায়ুর প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ প্রক্রিয়া দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি পায়।

ফলতঃ গভীর কর্ষণের উপকারিতা এদেশের কৃষকগণ পরিজ্ঞাত আছে ; আলু, আক, তামাক প্রভৃতি কোনও একটি বিশেষ ফসলের আবাদ করিতে হইলে, তাহারা আপন আপন ভূমি গভীর কর্ষণ দ্বারা কিরূপ পরিপাটি করিয়া তুলে তাহা দেখিলেই এ বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

কৃষিকার্য্যের পক্ষে গভীর কর্ষণ সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত হইলেও জমির অবস্থাভেদে উহা দ্বারা বিপরীত ফলও হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে বর্ষাতে নদীর জল প্রবেশ করিয়া, পলিমাটির সৃষ্টি করে, ঐরূপ নদীর চর এবং নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগে গভীর চাষ সর্ব্বতোভাবে অকল্যাণকর। প্রতি বৎসর ঐ সকল ভূমির উপরে যে পলিমাটি জমা হয়, উহার স্তর বিশেষ পুরু নহে ; অথচ উহা এত সারবান্ যে, বিনা সার প্রয়োগে উহাতে উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ ঐ স্তরের অল্প নিম্নেই বালুকাময় স্তর দেখিতে পাওয়া যায় ; এরূপ অবস্থায় ঐ ভূমি এমনভাবে কর্ষণ করিতে হইবে যেন নিম্নস্তরের বালুকা উপরে উঠিয়া আসিয়া জমির উর্ব্বরতা নষ্ট করিয়া না দেয়।

স্থলবিশেষে নদীর চরের পৃষ্ঠস্তরের ৫″ বা ৬″ ইঞ্চি নীচে এঁটেল মাটি দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ অবস্থাতেও গভীর কর্ষণ দ্বারা তলস্থ এঁটেল মাটি উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। এতদ্ব্যতীত বীজ বপনের সময় অথবা বীজ বপনের পরে কদাচ জমি গভীরভাবে কর্ষণ করা উচিত নহে। এই প্রকারে জমির অবস্থা বিচার করিয়া জমিতে গভীর চাষ করা কর্ত্তব্য।

কর্ষণযন্ত্রাদি

কোদাল—ইহা একাধারে হস্তপরিচালিত খনন এবং কর্ষণ-যন্ত্র। ইহা কৃষিকার্য্যের জন্য অন্যতম কর্ষণ-যন্ত্ররূপে এবং কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি খননের জন্য খনন-যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশী এবং বিলাতী ভেদে এদেশে দুই প্রকার কোদাল ব্যবহার করা হয়। যে কাষ্ঠ বা বংশ-দণ্ডে কোদাল আবদ্ধ করিয়া মাটি কাটা হয় তাহার নাম

বাঁট; কোদালের যে অংশ দ্বারা মাটি কাটা হয় তাহার নাম ফলা। ফলার উপরের অঙ্গুরীয় আকার অংশ, অর্থাৎ যাহাতে বাঁট আবদ্ধ থাকে তাহার নাম ঘাড়া। বিলাতী কোদালের ফলা প্রশস্ত এবং সোজা কিন্তু দেশী কোদালের ফলা অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত এবং উপরের অংশ, অর্থাৎ ঘাড়ার দিক্ বাঁকা। বিলাতী কোদালের ফলা সোজা হওয়ার দরুন উহা বাঁটের সঙ্গে প্রায় সমকোণ ভাবে থাকে, সুতরাং জমি কোপাইবার সময় উহার ফলা মৃত্তিকার অধিক নিম্নে প্রবেশ করে; পক্ষান্তরে দেশী কোদালের ফলা বাঁকা হওয়ার জন্য, উহা বাঁটের দিকে হেলিয়া থাকে, সুতরাং উহা দ্বারা মৃত্তিকা গভীরভাবে কোপাইবার সুবিধা হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রের মাটি অগভীরভাবে আল্‌গা করিয়া দেওয়ার জন্য দেশী কোদালের উপযোগিতা অধিক। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই কোদালের বাঁট খর্ব্ব দেখিতে পাওয়া যায়; ঐরূপ কোদাল দ্বারা সোজা দাঁড়াইয়া জমি কোপান চলে না, সুতরাং নত হইয়া কোপাইতে হয়। ঐ অবস্থায় কার্য্য করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সোজা দাঁড়াইয়া কোপাইলে পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হয়, সুতরাং সোজাভাবে দাঁড়াইয়া কার্য্য করার উপযোগী কোদালে দীর্ঘ বাঁট সংযুক্ত করিয়া লওয়া উচিত।

জংলা জায়গা আবাদ করিয়া উহা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার পক্ষে কোদালের ব্যবহার অপরিহার্য্য। কোদালের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি এবং শিকড় তুলিয়া জমির উচ্চ ও নিম্ন স্থান কাটিয়া ও ভরিয়া 'চৌরস' করিতে না পারিলে উহাকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে না।

শস্যোৎপাদনের জন্য কোদাল দ্বারা কোপাইয়াও জমি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোদাল দ্বারা কোপাইয়া জমি প্রস্তুত করিবার সময়ে মাটি উল্‌টাইয়া দেওয়ার সুবিধা হয়, ইহাতে শস্যোৎপাদন-জনিত উপরের নিস্তেজ মাটি নীচে যায় এবং নীচের সারবান্ মাটি উপরে উঠিয়া ভাবী শস্যের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য-পরিচালিত যন্ত্র বলিয়া কোদাল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে অপেক্ষাকৃত ব্যয়-বাহুল্য হইয়া থাকে,

এই নিমিত্তই ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গলের ব্যবহার হয়। অল্পপরিসর জমিতে কোনপ্রকার বিশেষ শস্য করিতে হইলে এদেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া কোদাল দ্বারাই জমি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সাধারণ (দেশী) লাঙ্গলের চাষের গভীরতা সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু কোদাল দ্বারা প্রয়োজন হইলে ইচ্ছানুসারে গভীরভাবে ভূমি কর্ষণ করা যাইতে পারে। বহুবর্ষব্যাপী শস্যোৎপাদনের জন্য কোন কোন স্থানে ক্ষেত্রের উপরের স্তরের মৃত্তিকা এমন অসার হইয়া পড়ে যে সাধারণ কৃষকগণ তাহাদের সাধ্যমত সার প্রয়োগ করিয়াও তাহাতে আশানুরূপ শস্যোৎপাদন করিতে পারে না। তখন তাহারা কোদালের সাহায্যে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ১॥′ ফুট হইতে ২′ ফুট পর্য্যন্ত গভীর কর্ষণ করিয়া মাটি উল্টাইয়া ও পাল্টাইয়া লয় এবং ঐ ভূমিতে দীর্ঘকালযাবৎ উত্তমরূপে শস্যোৎপাদন করে।

প্রথমতঃ জমির একপার্শ্বের আইলের নিকট ৩ হাত প্রস্থ ও ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের সমান লম্বা এবং প্রয়োজনানুসারে ১॥′ কিম্বা ২′ ফুট একটি খাত (trench) খনন করিয়া খাতের মাটি আইলের উপরে সাজাইয়া রাখে। পরে ঐ খাতের ক্ষেত্রের দিকের পাড় হইতে কোদাল দ্বারা মাটি কাটিয়া ঐ মাটি দ্বারা খাতটি পূরণ করিয়া দেয়। এইরূপে ক্ষেত্রের মধ্যে পূর্ব্বলিখিত খাতের অনুরূপ দ্বিতীয় খাতের সৃষ্টি হয়; পুনরায় ঐ খাতের পাড় হইতে মাটি কাটিয়া দ্বিতীয় খাতটিকে পূর্ণ করিয়া দেয়, এইরূপে পর পর নূতন খাত কাটিয়া ও ভরিয়া দেওয়ার ফলে সমগ্র ক্ষেত্রের নীচের মাটি উপরে এবং উপরের মাটি নীচে চলিয়া যায়। প্রথম খাতের যে মাটি আইলের উপরে সাজানো থাকে, উহা প্রতিবৎসর অল্পে অল্পে ক্ষেত্রের মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইলে প্রতি বিঘায় ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা খরচ পড়ে। এক বিঘা জমি চিরকাল পতিত অবস্থায় থাকিলে কৃষকের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, তাহার তুলনায় ঐরূপ খরচে জমি আবাদযোগ্য করিয়া লওয়া যে বিশেষ লাভের বিষয় তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

লাঙ্গল

দেশী লাঙ্গল—দেশী লাঙ্গল (২০ নং চিত্র) সাধারণতঃ হাল, ফাল বা ফলা, ইস্, গুটি (হাতল), গোঁজ ও জোয়াল—এই কয়টি অঙ্গে বিভক্ত।
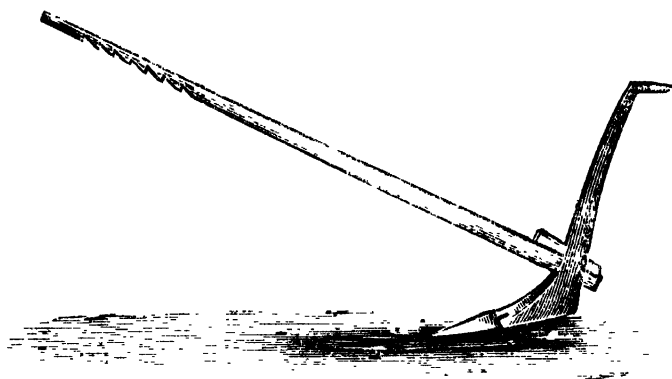
২০ নং চিত্র, দেশী লাঙ্গল।

হাল লাঙ্গলের প্রধান বা মূল অঙ্গ (main body)। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং বক্র বা কোণবিশিষ্ট। হালের এক প্রান্তে লৌহনির্ম্মিত ফাল সংযোজিত থাকে; অপর প্রান্ত ঈষৎ বক্র হইয়া গুটি বা হাতলরূপে ব্যবহৃত হয়। হালের মাঝখানের সম্মুখ দিকে একটি লম্বা কাষ্ঠফলক সংযুক্ত থাকে, উহার নাম ইস্। হালের গায়ে বিদ্ধ করিয়া এই ইস্ সংযুক্ত করা হয়, ঐ সংযোগস্থলে একটি কাঠের কীলক থাকে, ঐটির নাম গোঁজ। ইসের মাথার দিক্‌টাতে কতকগুলি খাঁজ কাটা থাকে, ঐ খাজ থাকার দরুন জোয়ালের সহিত উহা ছোট-বড় করিয়া বাঁধা যায়। হলচালন-কালে দুইটি গরুর স্কন্ধে যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ড আবদ্ধ থাকে তাহার নাম জোয়াল। জোয়ালের ঠিক মাঝখানে ইসের মাথা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

এদেশে যে সকল লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করা হয় তাহা ওজনে হাল্কা ও আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ঐগুলির ফাল হ্রস্ব ও অপ্রশস্ত হওয়ার

দরুন একবারে ৩"।৪" ইঞ্চির বেশী গভীর চাষ হইতে পারে না। দেশী লাঙ্গল দেশী বলদ দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষকগণকে বাধ্য হইয়া ঐ সকল বলদের শক্তির অনুযায়ী লাঙ্গল ব্যবহার করিতে হয় এবং ঐ সকল ক্ষুদ্র লাঙ্গলের সাহায্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে জমি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এদেশের মাটি স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও কোমল হওয়াতে উহা ঐ সকল ক্ষুদ্র লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণের পক্ষে প্রতিকূল-ভাবাপন্ন নহে। ঐ মাটি ঐ সকল ক্ষুদ্র লাঙ্গল দ্বারা পুনঃ পুনঃ কর্ষিত হইয়া রীতিমত গভীর চাষে পরিণত হয়। দেশী লাঙ্গল দ্বাবা জমি গভীরভাবে চাষ করিতে হইলে কৃষকগণ অনেক সময়ে এক লাঙ্গলের পশ্চাতে আর এক লাঙ্গল চালাইয়া যায় এবং ক্ষেত্রটি লম্বালম্বি এবং এড়োএড়ি ভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া সমস্ত ক্ষেত্রের মাটি গভীর ভাবে আলগা করিয়া ফেলে।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ যখন যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন তখন হরিণের শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করা হইত। লৌহ ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহারে ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত, হরিণের শৃঙ্গের আকার ও কার্য্যকারিতা উপলক্ষ করিয়া যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়া, লাঙ্গল বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষ একটি অতি বিস্তৃত দেশ। ইহার বিভিন্ন প্রদেশের মাটির প্রকৃতি এবং গো-জাতির দৈহিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের এবং এই কারণেই ভারতে নানা স্থানে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকারের লাঙ্গলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ির ২"।৩" ইঞ্চি কর্ষণকারী ক্ষুদ্র লাঙ্গলের সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের ১' ফুট গভীর কর্ষণকারী 'নাগর' লাঙ্গলের তুলনা করিলেই এ বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। ফলতঃ যাহারা অনুসন্ধিৎসু হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্তিকা ও তাহা কর্ষণোপযোগী লাঙ্গলের পার্থক্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, বিভিন্ন

প্রদেশের মৃত্তিকার কাঠিন্য ও কোমলতা, স্থানীয় আবহাওয়া এবং গো-জাতির দৈহিক অবস্থাই উহার মূলীভূত কারণ।

উন্নততর লাঙ্গল—বিলাতী লাঙ্গলের ধরনে নির্ম্মিত উন্নততর লাঙ্গলের কার্য্যকারিতা সাধারণ দেশী লাঙ্গলের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা ব্যবহার করা এদেশের কৃষকগণের পক্ষে নানা কারণে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এদেশের কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। অধিকাংশ কৃষকই ১০।১৫ বিঘার অতিরিক্ত জমি চাষ করে না; তাহাও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া চাষের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ঐ সামান্য জমি আবাদ করিয়া তাহারা কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সুতরাং অধিক মূল্যে ঐ সকল লাঙ্গল ও ঐ লাঙ্গল-চালনোপযোগী বলদ ক্রয় করিয়া চাষ-আবাদের কার্য্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না।

উন্নত প্রণালীর লাঙ্গলের ফালের এক পার্শ্বে পক্ষ (mould board) সংযোজিত থাকাতে উহা দ্বারা কর্ষিত ভূমি আপনা হইতেই উল্টাইয়া যায়, কিন্তু দেশী লাঙ্গলের চাষে তাহা হয় না। দেশী লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত মাটি আল্‌গা হইয়া দুই পার্শ্বে সরিয়া পড়ে। উন্নততর লাঙ্গল দ্বারা জমি একবার চাষ করিলেই উহাতে আর অকর্ষিত স্থান থাকিয়া যায় না, অর্থাৎ ক্ষেত্রের সকল স্থানের মৃত্তিকাই ফালির (Furrow-slice) আকারে পরপর উল্টাইয়া যায়, কিন্তু দেশী লাঙ্গল দ্বারা ভূমি প্রথমবার কর্ষণ করিলে কর্ষিত অংশগুলি 'জুলির' আকার ধারণ করে এবং প্রত্যেক দুই জুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান অকর্ষিত থাকিয়া যায়, সুতরাং পুনঃ পুনঃ লম্বালম্বি এবং এড়োএড়ি ভাবে কর্ষণ করিয়া ঐ অকর্ষিত স্থানগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। উন্নততর লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত ভূমি উল্টাইয়া যাওয়ার ফলে জমির উপরিস্থ ঘাস এবং আগাছা নীচে পড়িয়া পচিয়া সারের কার্য্য করে এবং মাটির "ঝাল" সহজে মজিয়া যাওয়ার সুবিধা পায়। কাজেই দেশী লাঙ্গল

অপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে নিৰ্ম্মিত লাঙ্গল-দ্বারা ভূমি কর্ষণ করা যে অধিকতর সুবিধাজনক তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল এবং যাহাদের একসঙ্গে অধিক পরিমাণ জমি চাষ করিবার সুবিধা আছে, তাহাদের পক্ষে দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা উন্নততর লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করাই সুবিধাজনক। উন্নততর লাঙ্গল-গুলি কর্ষণবিষয়ে নানা প্রকারে সুবিধাজনক হইলেও কাদায় চাষ বিষয়ে উহা মোটেই উপযোগী নহে। এদেশে রোয়া বা রোপা ধানের জন্য সচরাচর 'পেঁকী' চাষ করিতে হয়, এমন কি অনেক সময়ে জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলেও উহাতে চাষ দিয়া ধানের চারা রোপণ করিতে হয়। উন্নততর লাঙ্গল-দ্বারা ঐরূপ চাষ হইতে পারে না, সুতরাং এদেশে একমাত্র উন্নতপ্রণালীর লাঙ্গল-দ্বারা চাষের কার্য্য চলিতে পারে না, ঐ লাঙ্গলের সঙ্গে দেশী সাধারণ লাঙ্গলও রাখিতে হয়।

ভারতবর্ষে প্রচলিত কতকগুলি উন্নততর লাঙ্গলের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) মেষ্টন (Meston Plough) লাঙ্গল (২১ নং চিত্র)—এই লাঙ্গল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষিবিভাগ হইতে আবিষ্কৃত। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এমন সুন্দর যে কর্ষণ-সময়ে কৃষককে লাঙ্গলের উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিতে হয় না। এই লাঙ্গল-দ্বারা ইচ্ছানুরূপ গভীর অথবা অগভীর চাষ করা যাইতে পারে। এই লাঙ্গলের ফালে একটি পক্ষ (Mould board) সংযুক্ত আছে, উহার সাহায্যে কর্ষিত ভূমি উল্টাইয়া পড়ে। অত্যন্ত এঁটেল মাটি কর্ষণের পক্ষে এই লাঙ্গল তেমন উপযোগী নহে। এই লাঙ্গলের ওজন ১৭ সের এবং ইহার মূল্য ১২৲ টাকা। জেসপ কোম্পানী (Jessop & Co.) ইহার বিক্রেতা।

(২) ওয়াট সাহেবের (Watt's Plough) লাঙ্গল—ইহাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কৃষিবিভাগ হইতে আবিষ্কৃত। এঁটেল মাটি কর্ষণপক্ষে ইহা সমধিক উপযোগী। মেষ্টন লাঙ্গল অপেক্ষা ইহার ওজন অধিক।

২১ নং চিত্র, কয়েকটি উন্নততর লাঙ্গল
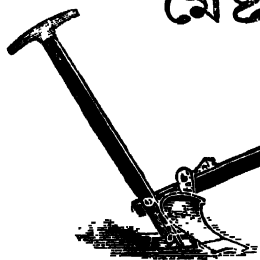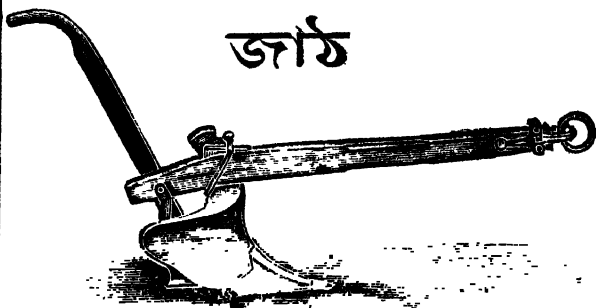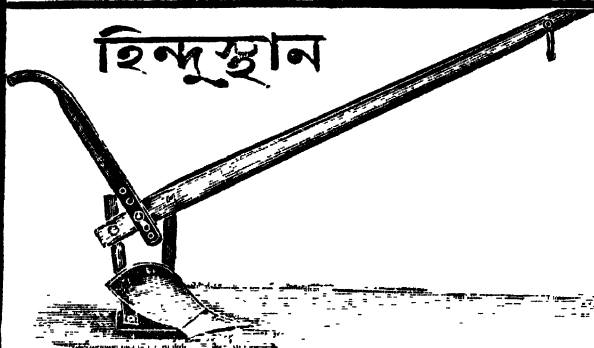
(৩) হিন্দুস্থান (Hindustan Plough) লাঙ্গল (২১ নং চিত্র)—কলিকাতার জেসপ কোম্পানী ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ইহা পক্ষবিশিষ্ট। ইহার মূল্য ১৫॥০ টাকা।

(৪) জাঠ (Jat Plough) লাঙ্গল (২১ নং চিত্র)—এই লাঙ্গল দ্বারা ৫" হইতে ৮" ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৩" হইতে ৬" ইঞ্চি গভীরভাবে জমি কর্ষণ করা চলে। এক জোড়া বলদ দ্বারা এই লাঙ্গল চালাইতে হয়। ইহার ওজন ২৪ সের এবং মূল্য ২৫৲ টাকা। জেসপ কোম্পানীর নিকট ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

(৫) মনসুন (Monsoon Plough) লাঙ্গল (২২ নং চিত্র)—এই লাঙ্গলের আকার ও কার্য্যকারিতা জাঠ লাঙ্গলেরই অনুরূপ। ইহার ওজন ২৪ সের; মূল্য ২৫৲ টাকা এবং ঐ কোম্পানীতেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

(৬) পাঞ্জাব (Punjab Plough) লাঙ্গল (২২ নং চিত্র)—এই লাঙ্গল দ্বারা ৩" ইঞ্চি হইতে ৬" ইঞ্চি গভীর এবং ৬" হইতে ৮" ইঞ্চি প্রশস্ত ভাবে কর্ষণ করা যায়। এই লাঙ্গল চালাইবার জন্য এক জোড়া বলদের প্রয়োজন হয়। ওজন ৩২ সের, মূল্য ৫৩৲ টাকা। ঐ কোম্পানীতেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

(৭) রাজেশ্বর (Rajeswar Plough) লাঙ্গল (২২ নং চিত্র)—এই লাঙ্গল বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আবিস্কৃত। ইহা ওজনে হাল্কা এবং উচ্চ ও নিম্ন উভয়প্রকার ভূমির পক্ষেই উপযোগী। ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে এই লাঙ্গলের পরীক্ষা হইয়াছে। ঢাকার শর্ম্মা কোম্পানীতে ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ১০৲ টাকা।

(৮) ভাগলপুর (Bhagalpur Plough) লাঙ্গল—এই লাঙ্গলের কেবল ফাল ছাড়া সমস্ত অংশই ঢালাই লোহা-দ্বারা গঠিত। এই লাঙ্গল গরুর উচ্চতা অনুসারে ছোট এবং বড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার আবিষ্কর্ত্তা সেখাএৎ হোসেন। মুঙ্গের অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রচলন আছে।

২২ নং চিত্র, কয়েকটি উন্নততর লাঙ্গল
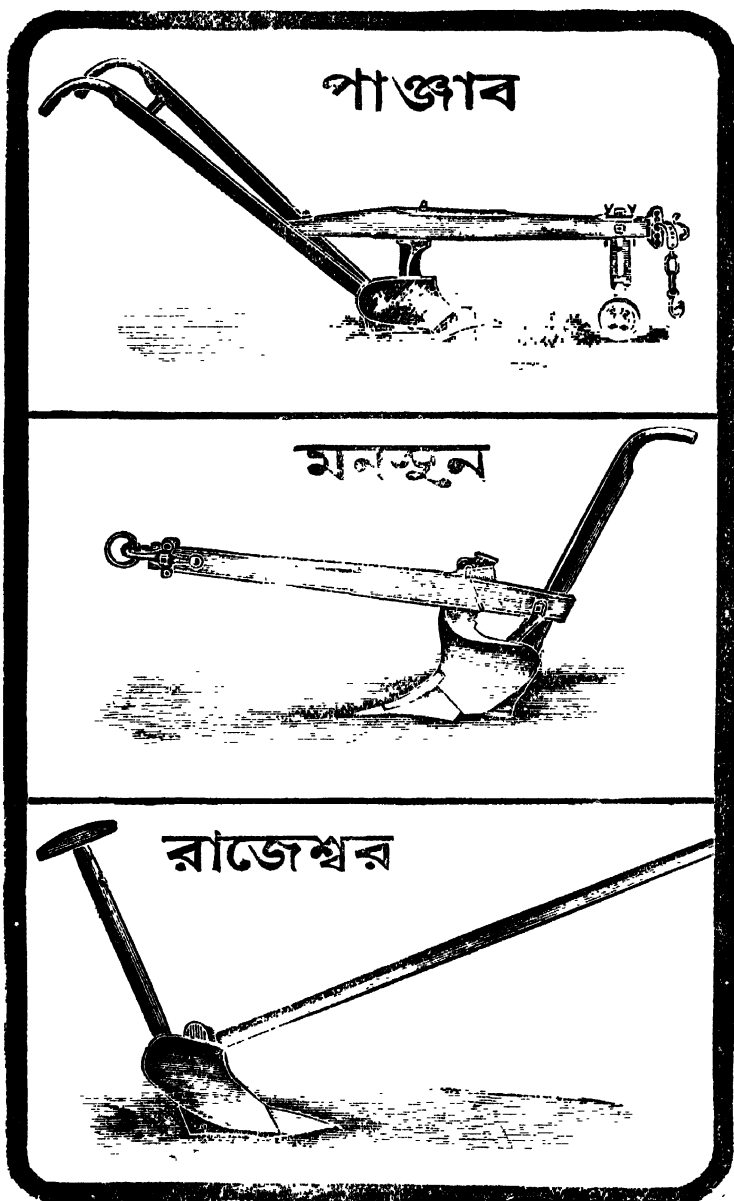
ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য ঘোটকের ব্যবহার হইয়া থাকে। এদেশে ঘোটক দ্বারা ভূমি-কর্ষণের ব্যবস্থা অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। ঐ সকল দেশে বলদ দ্বারা হল-চালনের ব্যবস্থাও না আছে এমন নহে, কিন্তু ঐ বলদ ভারতবর্ষীয় বলদ অপেক্ষা বহু পরিমাণে বলিষ্ঠ এবং ভার-বহন-ক্ষম। বিলাতী গুরুভার লাঙ্গলগুলি এদেশীয় বলদ দ্বারা চালনা করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই উহা অদ্যাপি ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে পারে নাই।

একটি বিলাতী লাঙ্গলের চিত্র (২৩ নং চিত্র) এবং তাহার বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ ও কার্য্যকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—
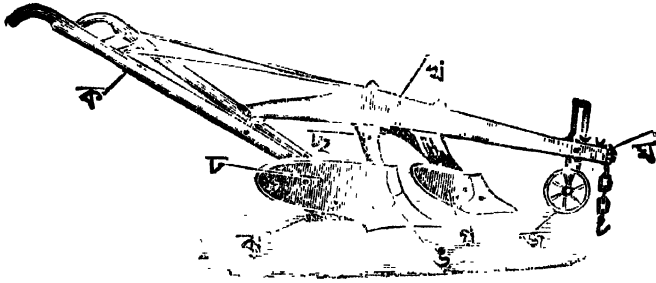
২৩ নং চিত্র। একটি বিলাতী লাঙ্গলের বিভিন্ন অঙ্গ :—ক—হেণ্ডল্‌স্‌; খ—বিম; গ—কল্‌টার; ঘ—ব্রিড্‌ল; ঙ—সেয়ার; চ—মোল্ড বোর্ড; ছ—বডি; জ—হুইল; ঝ—সোল।

হেণ্ডল্‌স্‌ (Handles) বা হাতল; বিম (Beam) বা ইস; কল্‌টার (Coulter) বা কাতারী; ব্রিড্‌ল্‌ (Bridle) বা বল্গাবন্ধ; সেয়ার (Share) বা ফাল; মোল্ড বোর্ড (Mould board) বা পক্ষ; বডি (Body) বা অঙ্গ; হুইল (Wheel) বা চক্র; এবং সোল (Sole)—এই কয়টি অঙ্গ আছে।

হেণ্ডল্‌স্‌ (Handles)—লাঙ্গলের পশ্চাদ্ভাগে দুইটি হাতল আছে, চালক দুই হস্তে ঐ দুইটি হাতল ধরিয়া হল চালনা করিয়া থাকে।

বিম (Beam)—ইহা দেশী লাঙ্গলের ইসের কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহা কাষ্ঠ অথবা লৌহ-নির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ, লাঙ্গলের বডি বা অঙ্গের সহিত সংলগ্ন থাকে। বিমের অগ্রভাগে অশ্ব অথবা বলদ, রজ্জু কিংবা শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

কল্টার (Coulter)—ইহা একখানা চেপ্টা লৌহফলক, ইহার নিম্নভাগ নরুনের ন্যায় ধারালো। ইহা কর্ষণ-সময়ে লাঙ্গলের ফালের সম্মুখে সংযোজিত থাকিয় মাটিকে সম্মুখদিকে চিরিয়া দেয়। ঘাসযুক্ত জমি কর্ষণ করিবার সময়ে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয়।

ব্রিড্‌ল্ (Bridle)—ইহা বিমের অগ্রভাগে অবস্থিত। ব্রিড্‌ল্‌এর সহিত অশ্বাদির বন্ধন-রজ্জু সংযোজিত থাকে। এই ব্রিড্‌ল্‌এর সঙ্গে অশ্বরজ্জু-বন্ধনের প্রকারভেদে জমিতে গভীর এবং অগভীর চাষ হয়।

সেয়ার—(Share)—ইহা লৌহ অথবা ইস্পাত নির্ম্মিত লাঙ্গলের ফাল। সেয়ারের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং দুই পার্শ্ব ধারালো। লাঙ্গল চালাইবার সময়ে সেয়ারের অগ্রভাগ সহজেই মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া দুই পাশের ধারাল অংশ-দ্বারা মাটি কাটিয়া দেয়। বিলাতী লাঙ্গলের সেয়ার বা ফাল প্রয়োজন অনুসারে খুলিয়া লাগানো যাইতে পারে।

মোল্ড্ বোর্ড (Mould board)—ইহা সেয়ার বা ফালের পশ্চাতে সংলগ্ন পক্ষাকৃতি লৌহফলক। কর্ষণের সময়ে সেয়ার-দ্বারা কর্ত্তিত মৃত্তিকাকে উল্টাইয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য।

বডি (Body)—লাঙ্গলের হেণ্ডেল, বিম, সেয়ার প্রভৃতি অঙ্গগুলি যে কাষ্ঠখণ্ডের সহিত আবদ্ধ থাকে তাহাকে লাঙ্গলের বডি বলে।

হুইল (Wheel)—ইহা একটি লৌহনির্ম্মিত চক্র। হুইলটি লাঙ্গলের সম্মুখে যুক্ত থাকিয়া উহার চলাচলের সুবিধা করিয়া দেয়। হুইল দ্বারা চাষের গভীরতাও নিয়মিত হইয়া থাকে। হুইল মাটি হইতে উপরের দিকে উঠিয়া গেলে লাঙ্গলের ফলা অধিক পরিমাণে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

সোল (Sole) লাঙ্গলের বডি সোলের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাঙ্গলের সোল জুতার তলার ন্যায় মাটির সহিত ঘর্ষণ করিয়া যায়।

লাঙ্গল ঠিকভাবে সংযুক্ত হইলে সোলটি মাটির উপর দিয়া সমানভাবে চলিতে থাকিবে,—কাঁপিবে না বা উচু নীচু হইবে না।

সাব্-সয়েল প্লাউ—কর্ষিত ভূমির নিম্নস্তর একই গভীরতায় পুনঃ পুনঃ কর্ষণের ফলে কঠিন হইয়া যায়। ঐরূপ কাঠিন্য হেতু ঐ স্তরের তলস্থ সঞ্চিত জল কর্ষিত অংশে রীতিমত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। কর্ষিত অংশে উৎপন্ন শস্যের শিকড় ঐ কঠিন স্তরে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়, এই জন্য ঐ কঠিন স্তরটিকে ভাঙ্গিয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য সাব্-সয়েল প্লাউ নামক
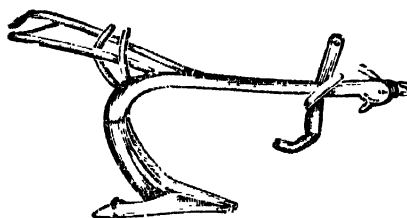
২৪নং চিত্র, সাব্-সয়েল প্লাউ।

এক প্রকার বিলাতী লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। এই লাঙ্গলের ফালে পক্ষ সংযুক্ত থাকে না, সুতরাং ইহার কার্য্যকারিতা আমাদের দেশীয় লাঙ্গলের ন্যায়। কর্ষণের পর সাব্-সয়েল প্লাউ চালাইয়া ভূমির কঠিন অন্তস্তর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন গভীর কর্ষণের নিমিত্তও এই লাঙ্গল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশে দেশী লাঙ্গল দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হয়।

লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষিত হইয়া গেলে ঢেলা ভাঙ্গিয়া উহাকে সমতল করিয়া লইতে হয়, এই কার্য্যের জন্য আমাদের দেশে সচরাচর মই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেহার অঞ্চলে 'চৌকি' নামক এক প্রকার কাষ্ঠফলক দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

অধুনা মোটর যন্ত্রের আবিষ্কারের সহিত প্রতীচ্যে ইঞ্জিন-চালিত নানাপ্রকার লাঙ্গল (Motor Tractors) আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং

ঐ সকল যন্ত্র দ্বারা কৃষি-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এদেশে চা-বাগান প্রভৃতি কৃষি-প্রতিষ্ঠান (যে স্থলে হাজার বা দুই হাজার বিঘা জমি লইয়া কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হয়) ব্যতীত সাধারণ কৃষিকার্য্যে ইহার ব্যবহার হওয়া আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ঐগুলির মধ্যে বিমেন ট্রেকৃটর (Beeman Tractor) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং অল্প মূল্যের। ফোর্ডসন (Fordson) ও ক্লেট্রক (Cletrac) প্রভৃতি বৃহৎ এঞ্জিন-চালিত যন্ত্রের মধ্যে প্রসিদ্ধ; ইহাদের মূল্যও অল্প।

মোটর-লাঙ্গলের সুবিধা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, (১) ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয় শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্র। ইহা-দ্বারা অতি অল্প সময়ে অধিকতর জমি কর্ষণ করা যায়। যে সকল দেশে জলবায়ুর অবস্থানুসারে কর্ষণোপযোগী সময় অতি অল্প, সেখানেই ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

(২) যে সকল প্রদেশে কৃষাণদের মজুরীর হার অতি উচ্চ সে সকল প্রদেশে ইহাতে ব্যয়ের অনেক সাশ্রয় হয়। যে সকল ম্যালেরিয়া-পীড়িত জেলায় এই ভয়াবহ ব্যাধির প্রকোপে লোকের কার্য্যকরী এবং দৈহিক শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং যেখানে সাঁওতাল কৃষাণ ব্যতীত বেশী জমি চাষ করা একপ্রকার অসম্ভব (যেমন হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায়) সেই সব স্থানে ইহার প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত কম নহে।

(৩) কর্ষণকার্য্য শেষ হইয়া গেলেও চালনাশক্তি-উৎপাদক কলটি (Engine) বেকার পড়িয়া থাকে না; ইহার দ্বারা সেচনের জন্য জল তোলা, শস্য ঝাড়া, আক মাড়াই, ধান ভানা, তেল পেষা প্রভৃতি কার্য্য করা যাইতে পারে।

মোটর-লাঙ্গলের এই সকল সুবিধা সত্ত্বেও ইহার বহুল অসুবিধা আছে, যথা :—

(১) ইহার মহার্ঘতাই কৃষকদের মধ্যে ইহার প্রচলনের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। যে প্রকার মোটর-লাঙ্গল অধুনা ভারতবর্ষে বিক্রীত হইতেছে তাহা অতিশয় দুর্ম্মূল্য, এবং সাধারণ কৃষকদের পক্ষে অত উচ্চ মল্য দিয়া ইহা ক্রয় করা অসম্ভব।

(২) বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ ভূমিখণ্ড গড় পরিমাণে ছয় কাঠার অধিক নয়—সে আয়তনের পক্ষে ইহা অতিশয় বৃহৎ। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একপ্রকার ছোট মোটর-লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়; একজোড়া ঘোড়া ফিরাইতে যতটা স্থানের প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষাও অল্প স্থানে ইহা ঘুরানো যায়। এই প্রকার লাঙ্গল সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছে, কিন্তু বিশেষ সুফল এখনও পাওয়া যায় নাই।

(৩) ইহার এঞ্জিন এদেশ হইতে অধিকতর শীতল প্রদেশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ দেশে ইহার উত্তাপ সহজে শীতল হয় না। তজ্জন্যই ইহা দ্বারা দীর্ঘকাল কার্য্য করা সম্ভব নহে।

(৪) বঙ্গদেশে কৃষকদের ক্ষেত্রের অতিক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডগুলি অসমকোণ এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। এইসব ক্ষেত্রের পক্ষে এই প্রকার কলের লাঙ্গল আদৌ উপযুক্ত নহে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহর ভিন্ন ইহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে মেরামত করা অসম্ভব, ইহাও লাঙ্গল ব্যবহারের একটি অন্তরায়।

(৫) বঙ্গদেশের কৃষিজাত শস্যের মধ্যে ধান্যই সর্ব্বপ্রধান। ইহার চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমিকে কর্দ্দমে পরিণত করিয়া নরম করিয়া লইতে হয়। ঐ কার্য্যের জন্য অধুনা-প্রচলিত মোটর-লাঙ্গল এদেশে বিশেষ কার্য্যকারী হয় নাই।

মই—পাঁচ হাত লম্বা তিন খণ্ড বংশদণ্ড এক হাত অন্তর সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করিয়া উহাদের গায়ে আধ হাত অন্তর ছিদ্র করা হয় এবং ঐ ছিদ্রে দুই আঙ্গুল পুরু বাঁশ অথবা সুপারী গাছের শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিয়া মই প্রস্তুত করা হয়। কোন কোন স্থানে মাঝের বংশ-দণ্ডটি সোজা রাখিয়া দুই পার্শ্বের দুইটি বংশদণ্ডের দুই মাথা ঈষৎ বক্র করিয়া আনিয়া মইটিকে মৃদঙ্গাকার করা হয়। মইএর দুই পার্শ্বের রজ্জুর সঙ্গে জোয়াল বাঁধিয়া দুইটি বলদ জুতিয়া দিতে হয়। চালক মইএর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলদ দ্বারা মই চালনা করে।

মই চলিবার সঙ্গে সঙ্গে জমির ঢেলা ভাঙ্গিয়া উচুনীচু স্থানগুলি সমতল হইয়া যায়। যে সমস্ত কঠিন ঢেলা মই এর চাপে ভাঙ্গিয়া না যায় সেগুলি মইএর ফাঁক দিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া পশ্চাদ্দিকে গড়াইয়া পড়িয়া যায়। ঐগুলি শেষে কাঠের বড় হাতুড়ি অথবা মুগুর দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

চৌকি—৪।৫ হাত দীর্ঘ ১০ অঙ্গুলি প্রশস্ত এবং ৮ অঙ্গুলি উচ্চ এক খণ্ড কাঠের এক পাশ ডোঙ্গার আকারে কুঁদিয়া ফেলিয়া ফাঁকা করিয়া লইতে হয়। চৌকির ঐ ফাঁকা অংশ মাটির দিকে রাখিয়া দুই পাশে রজ্জু দ্বারা বলদ জুতিয়া দিতে হয়; চৌকিতে বলদ জুতিবার কালে জোয়াল ব্যবহৃত হয় না। চালক চৌকির উপর দাঁড়াইয়া বলদ চালাইয়া থাকে। মইএর ন্যায় ইহাতেও ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি সমতল হয়। চৌকি চলিয়া যাইবার সময়ে জমি সমতল হইয়া উচ্চ স্থানের অতিরিক্ত মাটি চৌকির ঐ খোলা জায়গায় প্রবেশ করে এবং ঐ মাটি দ্বারা আপনা হইতেই নিম্নস্থান পূর্ণ হইয়া জমির সমতলত্ব রক্ষার সহায়তা করে। চৌকি ১০।১২ হাত লম্বা করিয়াও প্রস্তুত করা যায়। বড় চৌকিতে দুইটি বলদের স্থলে চারিটি বলদ জুতিতে হয় এবং দুইজন চালক চৌকির উপর দাঁড়াইয়া উহা চালনা করে।

স্ক্রেপার (Scraper)—মই ও চৌকি এই দুই যন্ত্র দ্বারাই জমি সমতল করা যায় বটে, কিন্তু ঐ দুই যন্ত্র অধিক দূর হইতে মাটি টানিয়া আনিয়া জমির নিম্নস্থান ভরাট করার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে। স্ক্রেপার নামক এক প্রকার যন্ত্র এই কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জমি সমতল করিতে হইলে অগ্রে সেই জমি চাষ করিয়া মাটি আল্‌গা করিয়া লইতে হয়, পরে স্ক্রেপার দ্বারা টানিয়া আনিয়া উহা নিম্নস্থানে ফেলিতে হয়। এই যন্ত্র একজনে একজোড়া বলদের সাহায্যে চালাইতে পারে।

ডিস্ক্ হ্যারো (Disc Harrow)—এদেশে মই অথবা চৌকি দ্বারাই জমির ঢেলা ভাঙ্গা হইয়া থাকে। ডিস্ক্ হ্যারো নামক একপ্রকার উন্নত প্রণালীর যন্ত্র আছে, তাহা এই কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

এই যন্ত্র ৬" ইঞ্চি গভীরভাবে মৃত্তিকার নিম্নে যাইয়া মাটিকে উল্টাইয়া দেয় ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। মাটির "জো" বাঁধিয়া রাখার ও জমির সার সমভাবে মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী।

বিঁদে—৪ হাত দীর্ঘ ৮ আঙ্গুল প্রশস্ত এবং ৬ আঙ্গুল পুরু এক খণ্ড কাষ্ঠফলকের নীচের দিকে চিরুনীর আকারে কতকগুলি সূক্ষ্মাগ্র লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া লইয়া বিঁদে প্রস্তুত করিতে হয়। বিঁদের উপরের দিকে ঠিক মধ্যস্থলে একটি কাষ্ঠদণ্ড হাতলরূপে সংযোজিত থাকে এবং এক পাশের ঠিক মধ্যস্থলে লাঙ্গলের ন্যায় ইস্ সংলগ্ন থাকে। জোয়ালে গরু জুতিয়া লাঙ্গলের ন্যায় হাতল ধরিয়া ইহা চালাইতে হয়। জোয়ালের দুই মাথা হইতে দুইটি রজ্জু বিঁদের দুই পাশে বাঁধা থাকে। চালাইবার সময়ে বিঁদের শলাকাগুলি কর্ষিত মৃত্তিকাতে বিদ্ধ হইয়া উহাকে উত্তমরূপে আলোড়িত এবং চূর্ণ করিয়া দেয়। বিঁদের শলাকাগুলির সঙ্গে মাটির ভিতর যে সকল শিকড় এবং আগাছা প্রভৃতি থাকে তাহা আট্‌কাইয়া যায়। চালককে উহা মাঝে মাঝে পাচনী দ্বারা ছাড়াইয়া দিতে হয়। জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার অব্যবহিত পরেই বিঁদে চালাইতে হয়, জমি অত্যন্ত ভিজা কিংবা অত্যন্ত নীরস অবস্থায় থাকিলে তাহাতে বিঁদে চালাইতে নাই। জমিতে "জো" থাকা অবস্থায় বিঁদে চালানো উচিত।

মান্দ্রাজ প্রদেশে সায়ডাপেড্ ফার্মে "গ্রাবার" (Grubber) নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার সাহায্যে কর্ষিত ভূমি উত্তমরূপে ভাঙ্গিয়া লওয়া যায় এবং ঐ যন্ত্র দ্বারা সাব্-সয়েল প্লাউএর ন্যায় জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া লওয়া যায়। এই যন্ত্রে পাঁচটি লৌহফলক "স্ক্রু" (Screw) দ্বারা সংলগ্ন থাকে। এই ফলক কয়টি ইচ্ছানুসারে নামাইয়া বা উঠাইয়া লওয়া যায়। এই যন্ত্রের দুই পার্শ্বে গো-শকটের ন্যায় চক্র যোজিত থাকাতে দুইটি বলদ দ্বারা ইহা অনায়াসে চালনা করা যায়।

যে সকল জমি নিবিড় ঘাসে আবৃত থাকে, তাহার উপর হইতে ঘাসগুলি কাটিয়া লইতে না পারিলে হল-চালনার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে "বাখার" নামক এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র চালনার সময়ে জমির ঘাস কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিকে উপর উপর আল্‌গা করিয়া দেয়। হাতে ছিটাইয়া বীজ-বপনের পূর্ব্বে জমিতে একটু 'ভাসা' চাষ করিয়া লইতে হয়। "বাখার" যন্ত্র দ্বারা ঐ কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। ইহার গঠন-প্রণালী অতি সহজ। দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা অল্পব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করান যাইতে পারে। জমি ২।৩ বার চাষ ও মই দেওয়ার পরে এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঢেলা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়।

বিঁদে, মই প্রভৃতি চালনা দ্বারা জমি প্রস্তুত হইয়া গেলে যদি উহা আল্‌গা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ জমির উপরে চাপ দিয়া উহাকে সংহত করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এই কার্য্যের জন্য পাঁচ হাত লম্বা আধ হাত প্রশস্ত ও আট অঙ্গুলি উচ্চ ভারি কাঠের ফালি ব্যবহৃত হয়। উহাকে "ডল্‌না" বলে। ডল্‌নার দুই প্রান্তে দড়ি দ্বারা বলদ জুতিয়া দিতে হয়। চালক ডল্‌নার উপর দাঁড়াইয়া চৌকি চালাইবার মত ইহাও চালাইয়া যায়। এইরূপে ডল্‌না ও তদুপরিস্থিত চালকের ভারে শিথিল জমি সংহত হইয়া পড়ে। ডল্‌নার চাপে কঠিন ঢেলাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জমির উপরিভাগ মসৃণ হইয়া বীজবপনের পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠে। পৃষ্ঠস্তরের শিথিল মৃত্তিকা সংহত করিয়া দিলে অন্তস্তরের সহিত বায়ুর কৌশিক-সম্বন্ধ (Capillary connection) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ আর্দ্রতা বীজের নিকটে উপনীত হয় এবং তজ্জন্য বীজ সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে।

এদেশে জমি প্রস্তুত হইয়া গেলে উহার উপর 'ভাসা' চাষ দিয়া হাতে ছিটাইয়া বীজ বপন করা হয়। ইয়োরোপে এবং আমেরিকাতে ঐ সকল কার্য্যের জন্য নানা প্রকার অশ্বচালিত যন্ত্রের ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষের

বিহার, মান্দ্রাজ এবং গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও দেশী বপনযন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি বলদ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

হস্ত দ্বারা ছিটাইয়া বীজ বপন করিলে ঐ বীজ ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পতিত হয় না সুতরাং উৎপন্ন শস্যের মধ্যস্থ ফাঁকা জমি উস্কাইয়া আল্‌গা করিয়া এবং আগাছা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া বিশেষ শ্রমসাধ্য হইয়া পড়ে। হস্ত দ্বারা উপ্ত বীজ ক্ষেত্রের কোন স্থানে ঘন এবং কোন স্থানে বিরল ভাবে পতিত হয়। সুতরাং ঐ সকল ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে উৎপন্ন বহুসংখ্যক উদ্ভিদ্ অল্প পরিসর স্থান হইতে অপ্রচুর খাদ্য গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে সূর্য্যোত্তাপ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া কোন ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হয় না; পক্ষান্তরে বিরল ভাবে বীজ উপ্ত হওয়ার দরুণ ক্ষেত্রের অনেক স্থান শস্যশূন্য অবস্থায় থাকিয়া যায়। সুতরাং উভয় দিক্ দিয়াই কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

হস্ত দ্বারা উপ্ত বীজ বিশৃঙ্খলভাবে ক্ষেত্রে পতিত হওয়ার দরুন উহা সমান ভাবে ঢাকিয়া দেওয়ার সুবিধা হয় না। কোথাও বা বীজগুলি জমির উপরিভাগে থাকিয়া যায়, আবার কোথাও বা অধিক মাটির নীচে চলিয়া যায়। যে সকল বীজ অনাবৃত অবস্থায় জমির উপরে থাকে ঐগুলি সূর্য্যোত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়, এবং কাক, শালিক প্রভৃতি পক্ষী দ্বারা ভক্ষিত হয়; আর যেগুলি মাটির অধিক নিম্নে চলিয়া যায় সেগুলি অঙ্কুরিত হইতে পারে না। একখণ্ড জমিতে হস্ত দ্বারা ছিটাইয়া বীজ বপন করিলে যে পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়, যন্ত্র দ্বারা বপন করিলে তদপেক্ষা অনেক অল্প বীজ ব্যয় হইয়া থাকে।

বিদেশী বপনযন্ত্র (Seed Drill) গুলির কার্য্যকারিতা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। ঐ যন্ত্রগুলি চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজগুলি সমান্তরাল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি হইতে আর একটি সমান দূরে এবং সমান গভীরতায় পতিত হয় সুতরাং ঐ প্রণালীতে উপ্ত শস্যের পরিচর্য্যা করাও সহজসাধ্য হইয়া উঠে। দেশী বপনযন্ত্রের কার্য্য ঐরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ঐগুলির কার্য্যকারিতা সাধারণতঃ চালকের অভিজ্ঞতা এবং

ক্ষিপ্রকারিতার উপর নির্ভর করে। ঐ যন্ত্র দ্বারা বীজগুলি মোটামুটি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপ্ত হইতে পারে, কিন্তু এক বীজ হইতে অন্য বীজের দুরত্বের সমতা সুচারুরূপে রক্ষিত হয় না। তথাপি ঐ সকল বপন-যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করিলে ঐ শস্যের জন্য যে পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা দরকার হয় তাহা বহু পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া উঠে। ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাণপ্রণালী বিশেষ পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য নহে। দেশীয় মিস্ত্রীরা উহা অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারে। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত "পাভার" নামক একটি বপন-যন্ত্রের প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চারিখানা পুরাতন দেশী লাঙ্গল একখানা পুরু কাঠের ফালির গায়ে সমপরিমাণ দূরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক লাঙ্গলের ফালের উপরিভাগের কাঠের গায়ে এক একটি ছিদ্র করিয়া লইতে হইবে; তৎপরে ঐ ছিদ্রগুলির মধ্যে এক একটি তিন ফুট লম্বা বাঁশের 'চোঙা' বসাইয়া উহাদের সকলগুলির মাথা এক সঙ্গে জড় করিয়া উহা একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রের তলায় এমন ভাবে জুড়িয়া দিতে হইবে যেন ঐ পাত্রের ভিতর বীজ রাখিলে উহা ঐ চারিটি চোঙার ছিদ্রপথে যাইয়া মাটিতে পড়িতে পারে। উল্লিখিত কাষ্ঠফলকে লাঙ্গলগুলির সঙ্গে ইস্ এবং হাতল সংলগ্ন থাকিবে। এই যন্ত্রে লাঙ্গলের ন্যায় গরু জুতিয়া চালাইতে হয়। চালকের কোমরে একটি বীজপূর্ণ থলি বাঁধা থাকে। যন্ত্র চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে চালক ঐ থলি হইতে বীজ লইয়া পাত্রটি পূর্ণ করিয়া দেয়। বীজগুলি চোঙ্গার ভিতর দিয়া যাইয়া প্রত্যেক লাঙ্গলের কর্ষিত জুলির মধ্যে পতিত হয়। এই যন্ত্র দ্বারা সুচারুরূপে বীজ বপন করা চালকের তৎপরতার উপর নির্ভর করে।

বীজবপনের পরে বীজগুলি মাটি দিয়া আবৃত করিয়া দিতে হয়। বিলাতী কোন কোন বপন-যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই বীজ ঢাকিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। এদেশে বীজবপনের পরে একখানা মই চালাইয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইহাতে সমস্ত বীজ ঢাকা পড়ে না। কোন কোন স্থানে একখানা কাষ্ঠফলকের সাহায্যে এই কার্য্য সাধিত

হইয়া থাকে। বীজের উপর মৃত্তিকার আবরণ সর্ব্বত্র সমান হওয়া প্রয়োজন, নতুবা সমস্ত বীজ এক সঙ্গে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। শস্যভেদে দুই হইতে ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়।

বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর চারাগুলি একটু বড় হইলেই ক্ষেত্রের মাটি উস্কাইয়া দিতে হয়; এই কার্য্যের জন্য এদেশে জমিতে হাল্‌কা বিঁদে বা আচ্‌ড়া ব্যবহার করা হয়। বীজবপনের পরে বৃষ্টি হইয়া গেলে জমির আবরণ জমাট হইয়া 'আচট্' বাঁধিয়া যায়। ঐ অবস্থায় জমিতে আচ্‌ড়া চালাইলে ঐ আচট্ ভাঙ্গিয়া আল্‌গা হইয়া যায় এবং আচ্‌ড়ার দাঁতের সঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট চারাগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি উপড়াইয়া গিয়া ক্ষেত্রে শস্যের সমতা রক্ষা করে। আচ্‌ড়ার আকৃতি ঠিক বিঁদের ন্যায় তবে উহা ওজনে কিছু হাল্‌কা এবং দাঁতগুলি সন্নিবিষ্ট। বিঁদে গভীরভাবে চালাইতে হয়, কিন্তু আচ্‌ড়া খুব অপেক্ষাকৃত ঘন 'ভাসা'ভাবে চালাইতে হয়।

সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে কৃষিক্ষেত্রের জমি উস্কাইয়া এবং আগাছা নিড়াইয়া দিতে হয়। এদেশে ঐ কার্য্যের জন্য খুড়পী, নিড়ানী, কাস্তে এবং হাত-কোদাল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নরক্রস গার্ডেন কাল্‌টিভেটর (Norcross Garden Cultivator) নামক এক প্রকার যন্ত্র এই কার্য্যের পক্ষে সকল দিক্ দিয়া বিশেষ উপযোগী। এই যন্ত্রের মূল্যও অল্প (ইহা Lemaye Brothers, Calcutta—এই ঠিকানায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়)। এই যন্ত্র ব্যতীত প্লেনেট জুনিয়র হ্যারো (Planet Junior Harrow) এই কার্য্যের জন্য উল্লেখযোগ্য।

যে সকল স্থানে বপনযন্ত্র দ্বারা শ্রেণীবদ্ধভাবে শস্য উৎপাদন করা হয় সে সকল স্থানে ঐ শ্রেণীবদ্ধ শস্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান উস্কাইবার ও নিড়াইবার জন্য "হো" (Hoe) নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ঐ যন্ত্র বলদ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মান্দ্রাজ ও গুজরাট প্রদেশে ইহার প্রচলন আছে। এই যন্ত্রের প্রস্তুতপ্রণালী অতিশয় সহজ ও স্বল্প-ব্যয়সাধ্য। আমাদের দেশে আলু, ইক্ষু, তামাক

প্রভৃতি হস্তরোপিত শ্রেণীবদ্ধ শস্যের ফাঁকের জমি উস্কাইয়া আগাছা পরিষ্কার করিবার পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। এই যন্ত্র ক্ষেত্রে পরিচালন করিতে হইলে শস্যের দুই শ্রেণীর মধ্যস্থ ফাঁক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হওয়া দরকার। এতদ্ব্যতীত বহু উন্নত প্রণালীর "হো" এবং "হ্যারো" বাজারে বিক্রীত হইতেছে। ফসলের শ্রেণীর দূরত্ব অনুসারে উহাদের দাঁতগুলি সরাইয়া বসাইবার বন্দোবস্ত আছে। ঐ-সকল যন্ত্র জমির উপরের "চট" ভাঙ্গিয়া জমির "জো" রক্ষার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জল-সেচন

সংস্কৃত ভাষায় জলের অন্য নাম জীবন ; প্রাণিগণের জীবনধারণ-পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়াই জলকে জীবন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উদ্ভিদেরও প্রাণীর ন্যায় জীবন আছে এবং উহাদের জীবনধারণের জন্যও জলের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। উদ্ভিদ্-দেহ বিশ্লেষণ করিলে তন্মধ্যে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় জলীয় পদার্থের পরিমাণ অত্যধিক পরিলক্ষিত হয়। প্রাণিগণ চলচ্ছক্তি-সম্পন্ন বলিয়া ভূপৃষ্ঠস্থ নদী, নির্ঝর, কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদির জল পান করিয়া জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু উদ্ভিদ্‌গণ চলচ্ছক্তিবিহীন বলিয়া মূলের সন্নিকটে জল প্রাপ্ত না হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। আকাশগামী মেঘসমূহ উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য জল সরবরাহ করিয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টির একান্ত অভাব হইলে জলাশয় হইতে শস্যক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা আবশ্যক, কিন্তু স্বাভাবিক বৃষ্টিবারির দ্বারা উদ্ভিদ্ যেমন পরিপুষ্ট হয়, কৃত্রিম উপায়ে নদী ও কূপাদির জলসেচন দ্বারা উদ্ভিদ্ তাদৃশ পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

আর্য্যগণ শস্যোৎপাদনের দিক্ দিয়া যাবতীয় দেশকে দেবমাতৃক ও নদীমাতৃক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল দেশের শস্যোৎপাদন বৃষ্টিবারির উপর নির্ভর করে তাহাদিগকে দেবমাতৃক দেশ এবং যে সকল দেশের শস্যোৎপাদনের জন্য নদী কিংবা অন্য কোন জলাশয় হইতে জলসেচন করিবার প্রয়োজন হয়, ঐ সকল দেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে। অতি প্রাচীন কালে সমস্ত ভারতবর্ষ দেবমাতৃক দেশ ছিল, এই জন্যই ভারতীয় কৃষকবর্গ সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টিবারির উপর

নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই দেবমাতৃকতা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে। তথাপি ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় কৃষকগণ তাহাদের বংশ-পরম্পরানুগত সংস্কার অনুসারে বৃষ্টিবারির অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা কৃষিকার্য্যের মঙ্গলের জন্য যেমন আকাশে বৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তেমন মৃত্তিকার নিম্নেও জল সঞ্চিত রাখিয়াছেন। আকাশের জল সর্ব্বদাই অনিশ্চিত, কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলের উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করা যায়। সুতরাং মানুষের পক্ষে নিশ্চিত পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের আশায় অলসভাবে বসিয়া থাকা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ বৃষ্টিবারির উপর কৃষিকার্য্য নির্ভর করিত বলিয়া প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধবিষয়ক বহু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরাশরমুনিকৃত "কৃষি-পরাশর" বা "কৃষি-সংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত কৃষিসম্বন্ধীয় প্রাচীন বচনসমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতীতের বহু দূরবর্ত্তী কাল হইতেই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দেবমাতৃকতার বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতেই শস্যক্ষেত্রে নদী, কূপাদি হইতে জলসেচনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সুবিখ্যাত কবি ভারবি-কৃত "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রাজা দুর্য্যোধন বহু দেবমাতৃক দেশের দেবমাতৃকতা লোপ হওয়ার দরুন কূপ, পুষ্করিণী, খাল ইত্যাদি খনন-দ্বারা ঐগুলিকে নদীমাতৃকে পরিণত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও দেশস্থ রাজন্যবর্গ-দ্বারা কৃষিকার্য্যের রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক জলাশয় খনন করা হইয়াছিল। অদ্যাপি বঙ্গদেশের বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি অনেক নদীহীন অঞ্চলে তাহার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য প্রাচীন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জেলায় প্রাচীন জলাশয়ের বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া জনৈক

সুরসিক ইংরাজ ঐ জেলাকে "পুষ্করিণী মৌচাক" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। জলাভাবজনিত শস্যহানি হইলে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা না হইলে কিছুতেই ঐ দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে না। ফলে, দেশের অধিবাসিবৃন্দ অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় দেশ জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হয়। সেই জন্যই যুগে যুগে রাজশক্তির দ্বারা দেশের শস্যরক্ষার জন্য শস্যক্ষেত্রে জলসেচনোপযোগী জলাশয়াদি খাত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান রাজশক্তি অর্থাৎ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনোদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম পয়ঃপ্রণালীখননের সঙ্কল্প করেন। এক সময় মান্দ্রাজ এবং উড়িষ্যা প্রদেশে একটি কোম্পানী পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিত, কিন্তু ঐরূপে জল সরবরাহ করিয়া ঐ কোম্পানী যে মূল্য আদায় করিত তাহার হার অধিক ছিল বলিয়া নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইহার পর লর্ড লরেন্সের শাসনকাল হইতে গভর্নমেণ্ট স্বয়ং ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালের পূর্ব্বে ঐ কার্য্য রীতিমত সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয় নাই। ১৯০১ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত তাহা সম্যক্ রূপে অবগত হওয়ার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল। ঐ কমিশনের রিপোর্ট ভারত গভর্নমেণ্টের হস্তগত হওয়ার পর জলসেচন-কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ কমিশনের প্রস্তাবই বর্ত্তমান জলসেচন-পদ্ধতির (Irrigation Policy) মূল ভিত্তি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে লর্ড কার্জ্জনের বৈঠকে ঐ বিষয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তখন ভারত গভর্নমেণ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের অগণিত কৃষকদিগের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে দেশের অন্নসমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু এপর্য্যন্ত ঐ কার্য্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে।

ঐ কমিশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, চাষের জমির শতকরা ১৯½ ভাগ জমিতে জলসেচন করা হয় এবং ঐ ১৯½ ভাগের শতকরা ৪২ ভাগ গভর্নমেণ্ট এবং ৫৮ ভাগ কৃষকগণ স্বয়ং সম্পাদন করে। অধিকাংশ কৃষকই সেচনের জন্য কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় সমগ্র বঙ্গদেশ অদ্যাপি জলসেচনের জন্য গভর্নমেণ্ট হইতে বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই।

শস্যোৎপাদন-বিষয়ে জল তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। প্রথমতঃ—মৃত্তিকানিহিত উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলি জলের সাহায্যে দ্রবীভূত হইয়া উদ্ভিদ্‌শরীরে প্রবেশ করে; এমন কি মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদের আহার্য্য উপাদান বর্ত্তমান থাকিলেও একমাত্র জলের অভাব হইলে উদ্ভিদ্ তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ—জলের সাহায্যে উদ্ভিদের দেহস্থ কোষগুলি গঠিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে উদ্ভিদ্ বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়তঃ—জল-দ্বারা মৃত্তিকার তাপ নিয়ন্ত্রিত হয় সুতরাং শস্যোৎপাদনের জন্য মৃত্তিকা সরস থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

জলের সাহায্য ভিন্ন কেবল অন্যান্য আহার্য্য পদার্থের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদ্ কেন বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না, তাহা উদ্ভিদের জীবন-ধারণের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সহজে প্রতীয়মান হইবে। কয়েকটি শস্যের জন্য বীজবপন হইতে আরম্ভ করিয়া পরিপক্বতা লাভ করা পর্য্যন্ত কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শস্যের নাম।	একবিঘা জমিতে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ।	ঐ শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ।
১। যব	৪/	৬২৫০/
২। আলু	১৬/	৫২৮০/
৩। জই	২৷৷০/	৪৯৭০/

উদ্ভিদের পোষণোপযোগী যে সকল পদার্থের অভাবের জন্য শস্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে, উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাব তাহাদের মধ্যে প্রধানতম। এদেশে কোন কোন স্থানে রীতিমত জলসেচনের ব্যবস্থা থাকিলেও অধিকাংশ কৃষকই স্বভাবজাত বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে।

মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জলের তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়,

১। মুক্তজল (Free water)।

২। কৈশিক জল (Capillary water)।

৩। জড়ীয় জল (Hygroscopic water)।

১। মুক্ত জল (Free water)—ইহা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বিষয়ীভূত হইয়া মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে অল্পাধিক নিম্নে অবস্থান করে। কূপ খনন করিলে যে জল বাহির হয় এবং প্রস্রবণ-দ্বারা যে জল ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হয় তাহাই মুক্ত জল নামে খ্যাত। ঐ জল মৃত্তিকার নিম্নস্তরে থাকে বলিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে না, কিন্তু কোনক্রমে ভূপৃষ্ঠে সম্ভবমত দূরে সঞ্চিত থাকিলে কৈশিকাকর্ষণ-দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদের কল্যাণ সাধন করে। মুক্ত জল মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার গভীর স্তরে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ সকল স্থানে ভূপৃষ্ঠ হইতে উহা সমান নিম্নে অবস্থিত নহে; সচরাচর উহা প্রস্রবণরূপে ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়। এই জল বৃষ্টিপাত হইতে সমুদ্ভূত। বৃষ্টিবারি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া কতকাংশ পয়ঃপ্রণালীযোগে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া যায়, এবং কতকাংশ মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করে এবং উহাই ক্রমে মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

২। কৈশিক জল (Capillary water)—এই জল মৃত্তিকার আণবিক অন্তরের মধ্যে অবস্থান করে, অর্থাৎ মৃত্তিকার সূক্ষ্ম অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই জল মাধ্যাকর্ষণের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু মৃত্তিকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হইয়া মৃত্তিকার শৈত্যের সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

এই জলই অতি সতর্কতার সহিত উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

৩। জড়ীয় জল (Hygroscopic water)—উত্তাপ-দ্বারা মৃত্তিকাকে শুষ্ক অর্থাৎ রসশূন্য করা যাইতে পারে, কিন্তু এই শুষ্ক উত্তপ্ত মৃত্তিকা শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অণুসকল পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলস্থ জলীয় বাষ্পের সম্পর্কে আসার ফলে উহাদের গায়ে অতি পাতলা এবং দৃঢ় একটি জলীয় আবরণের সৃষ্ট হয়। ঐ জলীয় ভাগের পরিমাণ এত সামান্য যে উহা থাকা সত্ত্বেও ঐ মৃত্তিকা নিতান্ত শুষ্ক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রাস্তার নিতান্ত শুষ্ক ধূলিকণাগুলিও ঐরূপ জলীয় আবরণের মধ্যে সংবদ্ধ থাকে। মৃত্তিকাসংশ্লিষ্ট এই জলীয় ভাগকেই জড়ীয় জল (Hygroscopic water) বলে।

দৃঢ়তা এবং অল্পতাহেতু এই জল-দ্বারা সাধারণ উদ্ভিদ্‌জীবনের বিশেষ কিছু সহায়তা হইতে পারে না, কিন্তু কতকগুলি পরজীবী উদ্ভিদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহে কিছু সাহায্য করে।

ভূমির আর্দ্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তজ্জাত শস্যসকল পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। স্বভাবজাত বৃষ্টিবারি-দ্বারা ঐ আর্দ্রতারক্ষার সুযোগ উপস্থিত না হইলে অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টিপাত না হইলে, শস্যের হিতের জন্য ক্ষেত্রে জলসেচন করার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর শস্যের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়; সেচনের সময় জল যাহাতে জমিতে সর্ব্বত্র সমভাবে প্রবাহিত হইয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। জলসেচনের পূর্ব্বে জমিকে এমন ভাবে ঢালু করিয়া লইতে হইবে যেন জমির কোন স্থানে জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে।

সাধারণতঃ কৃষকগণ সুবিধা অনুসারে আপন আপন ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতেই ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ক্ষেত্রের নিকটে জলাশয় বর্ত্তমান না থাকিলে দূরবর্ত্তী নদী, খাল, ঝিল, বিল, পুষ্করিণী কিংবা ডোবা হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচনের

ব্যবস্থা করিয়া লয়, তদভাবে ক্ষেত্রের নিকটে কূপ খনন করিয়া ঐ কূপের জল ক্ষেত্রে সেচন করিয়া থাকে। স্বভাবদত্ত বৃষ্টিবারি-দ্বারা উদ্ভিদ্ যেমন সহজে ও সুন্দররূপে পুষ্টিলাভ করিয়া সুফল প্রদান করে, অন্য কোন প্রকার জলসেচন-দ্বারা উদ্ভিদের ঐরূপ পুষ্টিলাভ হইতে পারে না। বৃষ্টিবারিতে উদ্ভিদের পরিপোষক অক্সিজেন, কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান পরিমিতভাবে বর্ত্তমান থাকাতে উহা উদ্ভিদের পক্ষে সমধিক কল্যাণকর; কিন্তু কূপ, ডোবা, পুষ্করিণী, ঝিল, বিল প্রভৃতি আবদ্ধ জলাশয়ে ঐ সকল উপাদান এবং উদ্ভিদের পরিপোষক ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফেট, ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেট প্রভৃতি কতকগুলি লাবণিক উপাদান অত্যধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকাতে ঐ সকল জলাশয়ের জলসেচন-দ্বারা উদ্ভিদ্ তেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। কারণ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিলে মানুষের যেমন স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে, অত্যধিক সারবান্ পদার্থ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিলে উদ্ভিদ্‌ও সেই দশা প্রাপ্ত হয়। স্বল্পতোয় এবং স্বল্পপরিসর জলাশয়ে ঐ সকল লাবণিক পদার্থের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, গভীর ও প্রশস্ত জলাশয়ে তদপেক্ষা অল্প এবং স্রোতের জলে সর্ব্বাপেক্ষা কম দৃষ্ট হয়। সুতরাং কৃষকগণ আপন আপন ক্ষেত্রে পরিশ্রমসাধ্য হইলেও স্রোতের বারি-দ্বারা সেচনের ব্যবস্থা করিবে, তদভাবে গভীর ও প্রশস্ত জলাশয়ের জল সেচন করিবে; সামর্থ্য থাকিতে অপ্রশস্ত ও অগভীর জলাশয়ের জল সেচন করিবে না।

শস্য ও জমিভেদে দুই হইতে চারিবার পর্য্যন্ত জলসেচনের আবশ্যকতা হয়। সেচনের জল চলাচলের জন্য ক্ষেত্রমধ্যে উপযুক্তভাবে নালা কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক, অন্যথা জল একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে তদ্দ্বারা শস্যের অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। একবারের সেচনের জল উত্তমরূপে শুকাইয়া গেলে মাটির আচট ভাঙ্গিয়া দিয়া আবশ্যকতা বোধ করিলে পুনরায় জল সেচন করা উচিত। এইরূপে প্রতিবার জল সেচনের পরেই মাটির আচট ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। জলসেচনের জন্য আজকাল বহুপ্রকার

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে জলসেচন করা বিশেষ সুবিধাজনক, কিন্তু এদেশে তেমন বিস্তীর্ণ ভূমি লইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত কৃষকের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ কৃষকই ১০।১৫ বিঘা ভূমি লইয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে; সেই অল্প পরিমাণ ভূমিও একস্থানে একসঙ্গে থাকে না, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চাষ আবাদ করিতে হয়। কাজেই ঐ সকল বহু-ব্যয়সাধ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-দ্বারা জলসেচন করা এদেশের সাধারণ কৃষকগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উহাদের পক্ষে জলসেচনের জন্য যে সকল দেশীয় যন্ত্রের প্রচলন আছে তাহাই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল এবং যাহারা বিস্তীর্ণ ভূমি লইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে জল সেচনের জন্য ঐ সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ক্রয় করাই সুবিধাজনক। যৌথভাবে কাজ করিলে সাধারণের পক্ষেও উহা সুলভ হইতে পারে। কয়েকটি জলসেচন-যন্ত্রের ব্যবহার-বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। **ঢেঁকি বা লাঠা**—অগভীর কূপ বা জলাশয় হইতে এই যন্ত্র-দ্বারা জল উত্তোলন করা হয়। এই যন্ত্র-দ্বারা জল উত্তোলন করিবার জন্য যন্ত্র জলে নামাইবার সময়ে কেবল মানবশক্তির প্রয়োজন হয়, পাত্র জলপূর্ণ হওয়ার পর ছাড়িয়া দিলেই আপনা আপনি উপরে উঠিয়া যায়। এই যন্ত্র-দ্বারা প্রতি মিনিটে আধমণ হইতে একমণ জল উত্তোলিত হইতে পারে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অল্পায়তন সবজীবাগে ইহার সাহায্যে জলসেচন করা হয়। জলাশয় অধিক গভীর না হইলে এবং যে স্থানে অল্প জলের প্রয়োজন, তথায় এই যন্ত্র-দ্বারা জলসেচন করা সহজ এবং অল্প ব্যয়সাধ্য।

২। **দোন**—অনুচ্চ-পাড়বিশিষ্ট জলাশয় হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন-পক্ষে "দোন" সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। তালগাছের গুড়ির দিকের কাণ্ড অথবা অন্য কোন প্রকার কাষ্ঠ-দ্বারা অনেকটা নৌকার আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজকাল লৌহ-নির্ম্মিত দোনও

১০।১২৲ টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়। একটী মাত্র লোক দ্বারাই এই যন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে। রীতিমত চালিত হইলে এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০০/ মণ জল উত্তোলিত হইতে পারে।

৩। **বলদেও বালতী** (Baldeo Balti)—কানপুর সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ মিঃ বলদেও এক সঙ্গে দুইটী দোন দ্বারা জল উত্তোলনের জন্য বলদ-পরিচালিত একপ্রকার সেচনযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ যন্ত্রের নাম রাখা হইয়াছে "বলদেও বালতী"। দুইটী দোন একসঙ্গে করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত, নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বলদটীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটীর পরে একটী দোন নামিতে উঠিতে থাকে।

৪। **সিউনী বা সিঁচ্‌নী**—নৌকার জলসেচনের জন্য যে সেউতি ব্যবহৃত হয়, ইহার আকৃতি অনেকটা তদনুরূপ। ইহা বাঁশ অথবা বেতের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দোনের ন্যায় ইহা দ্বারাও ৩।৪ হস্ত নিম্ন হইতে জল উত্তলোন করা যায়। সিঁচ্‌নীর দুই পাশে দড়ি বাঁধা থাকে এবং দুই পাশে দুইজন লোক দাড়াইয়া ঐ দড়ি ধরিয়া জলসেচন করে। অনবরত জলসেচন করিতে হইলে অতিরিক্ত একজন লোক রাখিতে হয়।

৫। **পারশিয়ান হুইল** (Persian Wheel)—ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্ন হইতে জল উত্তোলন করিবার উপযোগী যন্ত্র, পাঞ্জাব অঞ্চলে ইহার যথেষ্ট প্রচলন আছে। ১৫।১৬ হাত নিম্ন হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য এই যন্ত্র অনায়াসে পরিচালিত হইতে পারে। একটী বৃহৎ 'নাটাই'র আকৃতিবিশিষ্ট চক্রের উপর দিয়া মালার আকারে গ্রথিত কতকগুলি হাঁড়ি জল পর্য্যন্ত ঝুলানো থাকে; চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িগুলি জলপূর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চক্রের গা বাহিয়া উপরে চলিয়া আসে এবং ক্রমে চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে নিম্নমুখী হইয়া জল ঢালিয়া দিয়া পুনরায় জলের নীচে চলিয়া যায়। এই হাঁড়িগুলি মৃন্ময় না হইয়া লৌহনির্ম্মিত

হইলেই ভাল হয়। এই যন্ত্রও একজন লোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

৬। **পাইকোটা** (Paicota)—মান্দ্রাজ প্রদেশে ৭।৮ হাত নিম্ন হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য “পাইকোটা” নামক একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। জল-উত্তোলনকারী যন্ত্র সকলের মধ্যে এই যন্ত্রই ঐ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু এই যন্ত্রের ব্যবহারপ্রণালী অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই যন্ত্রের একটা সুবিধা এই যে, ইহা ভাঙ্গিয়া গেলে অতি সহজে মেরামত ও পুনরায় স্থাপন করা যায়।

৭। **মোট** (Mot)—কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র একজোড়া বলদ এবং একজন চালকের সাহায্যে চালিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ৩০।৪০ হাত বা তদধিক নীচে হইতে জল উত্তোলন করা যায়। সাধারণ একটা মোট'এ ৩০ গ্যালন জল ধরে এবং ২৬ ফিট্ নিম্ন হইতে একটা মোট জলপূর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিতে ১ মিনিট সময়ের আবশ্যক হয়। একটা মোট দৈনিক ৯ ঘণ্টা হিসাবে চালাইলে প্রতিদিন ৩০ × ৯ × ৬০ = ১৬,২০০ গ্যালন জল সেচন হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক ঐ পরিমাণ জল উত্তোলিত হয় না। মোটটা উঠিয়া আসিবার সময় কাঁপিয়া যাওয়ার দরুন কতক জল কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়।

একসঙ্গে দুইটা মোট জুড়িয়াও জল উত্তোলনের বন্দোবস্ত আছে। ঐরূপ মোটকে “ডবল মোট” (Double Mot) বলে। ডবল মোট দ্বারা জল উত্তোলন করিবার সময়ে একটি মোট জলপূর্ণ হইয়া উপরের দিকে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মোট জলশূন্য হইয়া উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়া যাইতে থাকে। এই মোট-ও দুইটা বলদ দ্বারা চালিত হয়। গঠনভেদে মোট দুই প্রকার। একপ্রকার মোট কূপ হইতে ভূ-পৃষ্ঠে উঠিয়া আসিলে আপনা হইতেই উহার

অভ্যন্তরস্থ জল বাহির হইয়া যায়, অন্য প্রকার মোটে আপনা হইতে জল বাহির হইয়া যাইবার বন্দোবস্ত থাকে না, সুতরাং ঐ প্রকার মোট হইতে জল নিকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত একটী লোকের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্র সাধারণতঃ চামড়ার দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তবে অধুনা লোহার দ্বারা প্রস্তুত মোটও ব্যবহৃত হইতেছে।

৮। ইজিপ্‌শিয়ান পার্শিয়ান হুইল (**Egyptian Persian Wheel**)—পাঞ্জাব প্রদেশে যে সকল পার্শিয়ান হুইল ব্যবহৃত হয় তাহা ঠিক ইজিপ্‌শিয়ান পার্শিয়ান হুইলের অনুরূপ, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ ও কার্য্যপ্রণালী বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকের পক্ষে নিতান্ত জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। এই যন্ত্র গরু দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

৯। তাবুত (**Taboot**)—ইহা ইজিপ্ট বা মিশর দেশে জল সেচনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকারিতা অনেকটা পার্শিয়ান হুইলের মতন; পার্শিয়ান হুইলে হাঁড়িগুলি সংলগ্ন থাকে কিন্তু ইহাতে হাঁড়িগুলি সংলগ্ন থাকে না। ইহার চাকাটা ফাঁপা এবং গ্রন্থিযুক্ত থাকে, প্রত্যেক দুই গ্রন্থির মধ্যের স্থান এক একটা স্বতন্ত্র পাত্রের ন্যায় এবং উহার উপরিভাগ খোলা থাকে। জলের ভিতর দিয়া ঐ চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে ঐ খোলা মুখগুলি দ্বারা ফাঁপা অংশগুলি জলপূর্ণ হয় এবং উপরে আসিয়া জল নিঃসরণ করে।

নলকূপ (Tube-well)

বাঁশের নলকূপ

মৃত্তিকাস্থিত মুক্তজল অতি অল্পব্যয়ে ঐ যন্ত্র দ্বারা উত্তোলন করা যায়। জাপান দেশে ইহার প্রচলন অধিক; অল্প আয়তনের সব্‌জী ক্ষেত্রের জন্য বা পানীয় জলের অভাব-দূরীকরণার্থ ইহার ব্যবহার হইতে পারে। বাংলা দেশে কোন কোন স্থানে ইহার পরীক্ষা দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। বিস্তারিতভাবে জলসেচনের পক্ষে ইহা অনুপযোগী।

ইহা হস্ত দ্বারা চালিত হয়। ইহার মূল্য প্রায় ফুট প্রতি গড়ে ৩৲ টাকা পড়ে।

উন্নত প্রণালীর নলকূপ

ইহার প্রতিকৃতি নিম্নে দেওয়া হইল। মেসার্স ডব্লিউ লেস্লি এণ্ড কোং (Messrs. W. Leslie & Co), মেসার্স চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
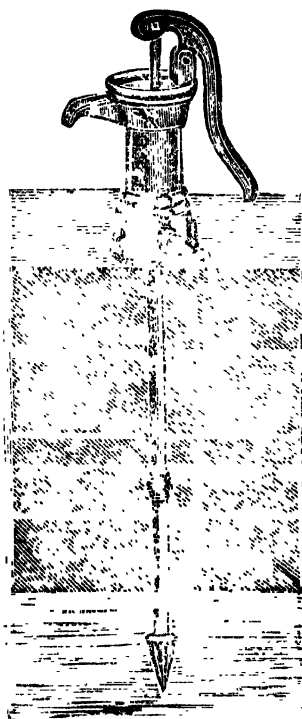
২৫ নং চিত্র—উন্নত প্রণালীর নলকূপ।

(Messrs. Chukravarty & Co.) এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল (Bengal Chemical & Pharmaceutical Works) প্রভৃতি কোম্পানী ইহা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম রাখেন ও বিক্রয় করেন। ১০০৲ টাকার

ভিতর একটা সাধারণ নলকূপ প্রস্তুত হইতে পারে, তবে এই জাতীয় কূপ যত গভীর হয় ততই ভাল। এই জাতীয় কূপ অনেক চা-বাগানে, নীল-কুঠীতে ও পানীয় জলের জন্য নানা গ্রামে ব্যবহৃত হইতেছে। এই নলকূপের তলায় জল ছাঁকিবার জন্য জাল থাকায় বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় ও পাথরের গুঁড়া বা ঢেলা নলে প্রবেশ করিয়া সহজে নল বন্ধ করিতে পারে না।

হাইড্রোহয়েষ্ট ওয়াটার এলিভেটর
(Hydrohoist Water Elevator)

এই যন্ত্র হস্ত দ্বারা বা গোমহিষাদি দ্বারা চালিত হইতে পারে। ক্রাউলি এগ্রিমোটর কোং (Crouly Agrimotor Co.) ইহার নির্ম্মাতা ও কলিকাতাস্থ মেসার্স মেকলাওড্ এণ্ড কোং (Messrs. McLeod & Co.) ইহার এজেণ্ট ও বিক্রেতা, ইহা সাধারণতঃ ইন্দারার উপরে বসান হয়। এই যন্ত্র বসাইতে বিশেষ কোনই হাঙ্গামা নাই, বিশেষতঃ পাইপ এবং ভাল্ভ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে চলে। প্রতিঘণ্টায় ১০০/ মণ হইতে ১৩০/ মণ পর্য্যন্ত জল ৬ হাত হইতে ৮০ হাত পর্য্যন্ত গভীর ইন্দারা হইতে উত্তোলন করা যায়। ইহার ক্ষমতা অনুসারে মূল্য ৪০৭৲ টাকা হইতে ১,১৮৮৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ডবল ব্যারেল পাম্প (Double Barrel Pump)

এইরূপ উন্নত প্রণালীর হস্তচালিত পাম্প অনেক প্রকারের আছে; তন্মধ্যে বার্ন কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান কাইট মোশন পাম্প (Indian Kite Motion Pump) উল্লেখযোগ্য। ইহা চালাইতে দুইটী মানুষের প্রয়োজন হয়। ইহার দ্বারা, জলের গভীরতা ও নলের আয়তন অনুসারে, প্রতিঘণ্টায় ৬০/ মণ হইতে ১৬০/ মণ জল উত্তোলিত হইয়া

থাকে। ছোট ছোট সব্‌জী-বাগান বা গোশালার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। এই জাতীয় পাম্প আয়তন অনুসারে ৩৭৫৲ হইতে ৪৫০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

লোটা পাম্প (Lota Pump)

এই যন্ত্র হস্তচালিত। ইহা ভাল্‌ব বা পাইপ-বিহীন। ক্যারুএল ব্যাণ্ড (Caruelle Band) নামক একপ্রকার ফিতার হাতল ঘুরাইলে তাহা জলের মধ্য দিয়া ঘুরিতে থাকে, এবং এই ফিতাই জল বহন করিয়া উপরে লইয়া যায়। ইহা চালাইতে জোর লাগে না। ইহা ছোট আয়তনের বাগান, পানীয় জল এবং গোশালার জন্য বিশেষ উপযোগী। প্রতি মিনিটে ইহাতে আধ মণ হিসাবে জল উঠে। ১৫ ফিট হইতে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর ইন্দারা হইতে জল তুলিবার কল ১২৬৲ টাকা হইতে ৩৩৮৲ টাকার মধ্যে কলিকাতাস্থিত মেসার্স হিট্‌লি এবং গ্রেসাম এণ্ড কোং লিঃ (Messrs. Heatly and Gresham & Co., Ltd.) এর নিকট পাওয়া যায়। এই কলের সহিত বুলক্‌ গিয়ার (Bullock Gear) সংযুক্ত করিয়া গরুর দ্বারাও চালিত করা যায়। বুলক্‌ গিয়ারের সহিত একটা কল ৭৩৫৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। গোচালিত এই যন্ত্রের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ৩৭৫/ মণ জল উত্তোলন করা যায়। এই যন্ত্র এঞ্জিন (Engine) দ্বারাও পরিচালিত হইতে পারে। উপরি-উক্ত বিক্রেতার নিকট এই যন্ত্র ৭৭৫৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বুল্‌টন ওয়াটার এলিভেটর (Boulton Water Elevator)

মেসার্স হিট্‌লে গ্রেসাম কোম্পানী লিমিটেড লোটা পাম্পের ন্যায় বুল্‌টন ওয়াটার এলিভেটর নামক আর একপ্রকার জল তুলিবার যন্ত্র বিক্রয় করেন। ইহা দ্বারা প্রায় ৫২ ফিট হইতে ২২৫ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে

প্রতিঘণ্টায় ১৫/ মণ হইতে ৯০/ মণ পর্য্যন্ত জল তোলা যায়। ইহা হস্ত, গরু বা এঞ্জিন দ্বারা চালিত হইতে পারে। একটী হস্তচালিত পাম্প আয়তন অনুসারে ২০০৲ হইতে ৪৫৫৲, গরু দ্বারা চালিত পাম্প ৬০০৲ ও এঞ্জিন দ্বারা চালিত পাম্প ২৭৮৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

মার্ভেলো লিকুইড্ এলিভেটর্স

(Marvello Liquid Elevators)

মেসার্স হিট্‌লি এবং গ্রেসাম এণ্ড কোং লিমিটেড এই জল তুলিবার যন্ত্র বিক্রয় করেন। ইহা পূর্ব্বোক্ত লোটা পাম্প (Lota Pump) বা বুল্‌টন ওয়াটার এলিভেটরের (Boulton Water Elevator) অনুরূপ। একটী হস্তচালিত কলের দ্বারা ঘণ্টায় ১২০ হইতে ৭২০ গ্যালন জল, গরুর দ্বারা চালিত কলে ঘণ্টায় ১৪০ হইতে ৩,৭০০ গ্যালন জল তোলা যায় এবং এঞ্জিন দ্বারা চালাইলে তদপেক্ষা অধিক জল প্রতি ঘণ্টায় তোলা যায়। আয়তন অনুসারে হস্তচালিত কল ১২৩৲ হইতে ২৫৩৲ টাকার মধ্যে, গরুর দ্বারা চালিত কল ৬৭৫৲ টাকায় ও এঞ্জিন-চালিত কল ৬৫০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়।

একোয়াটল এণ্ড্‌লেস চেন পাম্প

(Aquatole Endless Chain Pump)

মেসার্স জেসপ্ এণ্ড কোং লিমিটেডের নিকট এই জল তুলিবার যন্ত্র পাওয়া যায়। ইহা ফিট্ করিতে বা চালাইতে কোনই অসুবিধা নাই, এবং ইহা দ্বারা জল ছাড়া যে কোন প্রকার তরল বা অর্দ্ধ-তরল পদার্থ উত্তোলন করা যায়। ইহা কার্য্যতঃ উপরি-উক্ত লোটা অথবা মার্ভেলো পাম্পের অনুরূপ। ১॥ ইঞ্চি হইতে এক ফুট প্রস্থ চেন লাগাইয়া প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ হইতে ২০,০০০ গ্যালন পর্য্যন্ত জল তোলা যায়।

লেমায়ার বাকেট পাম্প
(Lemaire Bucket Pump)

এই যন্ত্র ফরাসীদেশে আবিষ্কৃত। কতকগুলি একসঙ্গে গাঁথা বাটি একটা হাতল ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের ভিতর দিয়া আবর্ত্তিত হয় এবং প্রত্যেক বাটি জলপূর্ণ হইয়া উপরে আসিয়া সেই জল ঢালিয়া দেয়। এইরূপ পাম্পের ব্যবহার এবং ফিট্ করা উভয়ই সহজসাধ্য।

স্কিন ওয়াটার লিফ্‌ট
(Skeen Water Lift)

বিহার, যুক্ত-প্রদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলে ইন্দারা হইতে জল উঠাইবার জন্য যেরূপ চর্ম্মনির্ম্মিত "মোট" ব্যবহৃত হয়, এই যন্ত্র ঠিক সেই জাতীয় এবং ঠিক সেইরূপেই ইহা দ্বারা জল উঠানো হয়। মোট এবং এই ওয়াটার লিফ্‌টের মধ্যে প্রভেদ শুধু এই যে, চামড়ার পরিবর্ত্তে ইহা Galvanised Iron Sheetএ নির্ম্মিত হয় এবং জল ঢালিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য অন্য লোকের প্রয়োজন হয় না, বালতিটা ইন্দারার উপরে উঠিলেই আপনা হইতে জল বাহির হইয়া যায়। এই বালতির তলায় একটা কল (valve) থাকে, বালতিটা ইন্দারার মুখে উঠিলেই দড়ির টানে সেই কলের মুখটা খুলিয়া যায় এবং তাহাতে বালতির জল আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

এঞ্জিন (Engine) চালিত পাম্পের (Pump) প্রচলন অধুনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এঞ্জিন-চালিত পাম্পের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—

পেটার ইরিগেসন এণ্ড ড্রেনেজ পাম্প
(Petter Irrigation & Drainage Pump)

এই পাম্প কেরোসিন দ্বারা চালিত হয়। ইহা দ্বারা প্রতিঘণ্টায় ৮৭৫ মণ জল ১৫´ হইতে ২২´ ফিট পর্য্যন্ত গভীর স্থান হইতে তুলিতে

পারা যায়। মেসার্স টি. ই. টম্‌সন এণ্ড কোং লিঃ (Messrs. T. E. Thomson & Co., Ltd.) ইহার বিক্রেতা। বহরমপুর সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে ইহা পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে ইহার কার্য্য-কারিতার সুফল সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এইরূপ যন্ত্র ১০০০৲ হইতে ১২০০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। এই পাম্পে বুলক্ গিয়ার সংযুক্ত করিয়া গরুর দ্বারা চালিত করা যায় এবং সেইজন্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করা বিশেষ সুবিধাজনক।

রান্‌সম্‌স পোর্টেবল পাম্পিং সেট্
(Ransome's Portable Pumping Set)

মেসার্স জেসপ এণ্ড কোং লিঃ এই যন্ত্রের বিক্রেতা। ইহা পেটার পাম্পেরই অনুরূপ।

এসেক্স পজিটিভ রোটারী পাম্প
(Essex Positive Rotary Pump)

ইহা এঞ্জিন দ্বারা বা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। "মেসার্স জব্‌সন এণ্ড বেকউইদ লিমিটেড—১০৪ নং হাই হলবর্ণ, লণ্ডন" (Messrs. Jobson & Beckwith, Ltd., 104 High Holborn, London) ঠিকানাতে এই যন্ত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ৬৬ হাত পর্য্যন্ত উচ্চে এই যন্ত্র দ্বারা জল উত্তোলন করা যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বীজপরীক্ষা ও বীজরক্ষা

বীজপরীক্ষা

ইউরোপ ও আমেরিকাতে বীজ সরবরাহের জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ফসল উৎপাদন করা হয়। ঐ সকল ফসল বিশেষ নিয়মে উৎপাদন করা হয় বলিয়া সাধারণতঃ ব্যয়বাহুল্য হইয়া থাকে; সুতরাং কৃষকগণকে অধিক মূল্যে বীজ ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু অধিক মূল্যে বীজ ক্রয় করিয়াও তাহারা সবিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। এদেশের কৃষকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রজাত শস্য হইতেই পরবর্ত্তী ফসলের বীজ রক্ষা করে অথবা অন্য কৃষকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ শস্য এবং বীজের মধ্যে বিশেষ কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না। এস্থলে বপনের পূর্ব্বে বীজগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া এবং শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বীজপরীক্ষার সময়ে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—বীজগুলি সমস্তই একজাতীয় কি না। উহার মধ্যে অন্যজাতীয় বীজ থাকিলে ঐগুলি বাছিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইবে। বীজের মধ্যে কোন প্রকার আগাছার বীজ এবং ধূলা, মাটি প্রভৃতি আবর্জ্জনা থাকিলে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া উহা পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ঐ বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলে শতকরা কতগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা। এই পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা যায়—

একখানা সমতল কাচ, চীনেমাটি অথবা মাটির ছোট পাত্রে * ঐ পাত্র হইতে আকারে সামান্য ছোট একখানা ব্লটিং কাগজ কাটিয়া লইয়া তাহা

* এই কার্য্যের জন্য প্রেট্রি ডিস (Petri Dish) নামক কাচপাত্র ব্যবহার করা হয়।

ঐ পাত্রের মধ্যে বসাইতে হইবে, তৎপরে ঐ পাত্রে জল ঢালিয়া ব্লটিংখানা উত্তমরূপে ভিজাইয়া এবং পরে জল ফেলিয়া দিয়া ব্লটিংখানা হস্তদ্বারা চাপিয়া পাত্রের সঙ্গে উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হইবে। ইহার পর নির্দ্দিষ্ট বীজ হইতে কোন প্রকার বাছাই না করিয়া ১০০ অথবা তদপেক্ষা কিছু বেশী বীজ ঐ ব্লটিংএর উপরে বিছাইয়া দিতে হইবে,--এমন ভাবে বিছাইতে হইবে যেন একটা বীজ অন্য একটার গায়ে না লাগে। এই কার্য্যের জন্য সোন্না (Forceps) ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐরূপে বীজ বিছাইয়া রাখিয়া উহার উপরিভাগ ঢাকিয়া দিতে হইবে। ১০।১২ ঘণ্টা পরে ঐ ঢাকনী তুলিলে দেখিতে পাইবে ব্লটিংখানা অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে, তখন পুনরায় জল দিয়া উহা ভিজাইয়া দিতে হইবে। ভিজাইবার সময়ে বীজগুলি একত্র হইয়া গেলে সোন্না দ্বারা পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। সকল শস্যের বীজ সমান সময়ে অঙ্কুরিত হয় না। ভিজা ব্লটিংএর উপরে ঐ ভাবে পাটের বীজ রাখিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। বীজ ভাল হইলে ঐ সময়ের মধ্যে সমস্তগুলিই অঙ্কুরিত হইবে; বীজ ভাল না হইলে ৪৮ ঘণ্টা হইতে ৬ দিবসের মধ্যেও অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতে পারে। ঐ অবস্থায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাটের যে বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তাহা বপন করিলে মোটেই অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ৯০টা বীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা উত্তম বীজ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপভাবে বীজ পরীক্ষা করিবার সময়ে প্রতিদিন যেগুলি অঙ্কুরিত হইবে, তাহা পাত্র হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং সংখ্যা লিখিয়া রাখিতে হইবে। পরে প্রতিদিনের অঙ্কুরিত বীজের মোট সংখ্যাকে ১০০ দিয়া পূরণ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাকে যতগুলি বীজ পাত্রের মধ্যে পরীক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল, সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল অঙ্কুরিত বীজের শতকরা হারের সমান হইবে।

উল্লিখিতরূপ পরীক্ষা করিয়া বীজ বপন না করিলে কৃষকগণকে সময়ে সময়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, কারণ রীতিমত পরিশ্রম ও

অর্থব্যয়ে জমি প্রস্তুত করিয়া বীজবপনের পর দেখা যায়, যে পরিমাণ বীজ বপন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অতি সামান্য পারমাণ অঙ্কুরিত হইয়াছে এবং পুনরায় জমি ভাঙ্গিয়া বীজবপনের উপযোগী করিবার "জো" অথবা সময় নাই। এইরূপ স্থলে কৃষকের একটী ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, কেবল পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ই সার হইয়া থাকে।

বীজরক্ষণ

উৎকৃষ্ট বীজ সুরক্ষিত অবস্থায় রক্ষা করিতে না পারিলে অধিকাংশ সময়েই উহা কীট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উৎপাদিকা-শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বাহির হইতে যে সকল কীট বীজের ভাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীজ নষ্ট করে উহাদের কবল হইতে সহজেই বীজ রক্ষা করা যাইতে পারে; ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহের সময়ে অল্পাধিক কীটের ডিম্ব বীজের পাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে, কালক্রমে উহা হইতে কীট উৎপন্ন হইয়া ভাণ্ডস্থ বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে, ঐ অবস্থায় চতুর্গুণ বীজ বপন করিয়াও রীতিমত ফসল উৎপাদন করা যায় না। ভুট্টা, গম, যব প্রভৃতির বীজ অধিকাংশ সময়ে এই ভাবে নষ্ট হইয়া থাকে।

কার্ব্বন বাইসাল্‌ফাইড (Carbon Bisulphide) নামক দ্রব্য ব্যবহার করিলে এই সকল কীটের কবল হইতে বীজ রক্ষা করা যাইতে পারে। ৪০/ মণ বীজ রক্ষার জন্য মাত্র এক সের পরিমাণ ঐ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এই দ্রব্য অতিশয় দাহ্যমান পদার্থ, সুতরাং কোন প্রকারে ইহা অগ্নির সংস্পর্শে আসিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বৃহদায়তন জালা কিংবা ঐ প্রকার কোন পাত্রে শুষ্ক বীজ ঢালিয়া উহার মধ্যে একটী কার্ব্বন বাইসাল্‌ফাইডের পাত্র মুখ-খোলা অবস্থায় রাখিয়া দিয়া জালার মুখে সরা চাপা দিয়া

গোবর-মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এক ঘণ্টা পরে ঐ জালা হইতে বীজ বাহির করিয়া লইয়া কিছুকাল উহা ছায়াযুক্ত স্থানে ছড়াইয়া রাখায় পরে উহা টিন অথবা মাটির পাত্রে কিংবা লবণযুক্ত কাপড়ের থলিয়াতে মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঐ সকল পাত্র কিংবা থলিয়ার মুখে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ গভীরভাবে শুষ্ক নিমের পাতা দিয়া রাখিলে বাহির হইতে কোন কীট প্রবেশ করিয়া বীজ নষ্ট করিতে পারে না।

পরিশিষ্ট

কৃষিকার্য্যে অর্থনীতি

সম্পদ্ ও মূল্য

যে সকল প্রচেষ্টা-দ্বারা মানবজাতি আদিম অনুন্নত অবস্থা হইতে দৈনন্দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কৃষিকার্য্যই তাহার মূল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান। বর্ত্তমান গ্রন্থের অবতরণিকা অধ্যায়ে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কৃষকগণ শস্যোৎপাদন করিয়া উহার কিয়দংশ আপনাদের ব্যবহারে নিয়োজিত করে এবং অবশিষ্টাংশ শিল্পী এবং অন্যান্য অ-কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। শিল্পি-সম্প্রদায় আপন আপন শিল্প সম্ভার-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ-দ্বারা কৃষকগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় শস্যাদি ক্রয় করিয়া লয়।

খাদ্যই জীবন-ধারণের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। এই খাদ্যের নিমিত্ত অ-কৃষক-মণ্ডলী চিরকালই কৃষকবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে; কারণ পল্লী ভিন্ন নগর কিংবা নগরোপকণ্ঠস্থিত জমিতে নগরবাসিগণের আহার্য্যের পরিমাণ শস্যোৎপাদন কিছুতেই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সুতরাং আহার্য্য সরবরাহের জন্য তাহাদিগের পর-প্রত্যাশী না হইয়া গত্যন্তর নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষক-সম্প্রদায় প্রতি বৎসর তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য কেন উৎপাদন করে? ইহার উত্তর এই যে, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য খাদ্য ব্যতীত এমন কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন হয়, যাহা তাহারা স্বয়ং প্রস্তুত করিতে অক্ষম। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মানবের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র, তৈজস, অস্ত্র এবং যন্ত্রাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য কৃষক-সম্প্রদায়কে শিল্পি-সম্প্রদায়ের উপর

নির্ভর করিতে হয়, এবং এই সকল বস্তু পাইবার জন্য তাহাদিগকে যে মূল্য দিতে হয়, উহা লাভ করিবার অভিপ্রায়েই কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানবমাত্রেরই এমন কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন, যাহা তাহারা স্বয়ং উৎপাদন বা নির্ম্মান করিতে অক্ষম। ঐ সকল প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদনের অক্ষমতাই কৃষক- বা অ-কৃষক-সম্প্রদায়কে পরস্পরের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে।

কৃষক- ও অ-কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লিখিত আদান-প্রদান-দ্বারা তাহাদের পরস্পরের অপরিহার্য্য অভাবগুলির নিবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু মানবের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মানব-জাতির পক্ষে স্বাভাবিক এবং সহজাত। যে সকল অ-কৃষক অর্থাৎ শিল্পী এবং ব্যবসায়িগণ নগরে বাস করে, তাহারা তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ-দ্বারা জীবন-যাত্রার জন্য অপরিহার্য্য প্রাথমিক অভাবগুলি পূরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ছাতা, জুতা, জামা প্রভৃতি পরিহার-যোগ্য বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ নিয়োজিত করিয়া থাকে। মোট-কথা, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের পরিমাণের উপরই তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি নির্ভর করে। যে কাজ পায়ে হাঁটিয়া করা যায়, উপার্জ্জন বাড়িলে তাহারা তাহা গাড়ী চড়িয়া সম্পন্ন করে; এবং ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্ত্তে শেষে মটর-গাড়ী কিনে। উল্লিখিত দুই-শ্রেণীর অ-কৃষক লোকের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ ব্যবসায়ি-শ্রেণীর লোকদিগকে ঐশ্বর্য্যশালী বলা যায়। যাহাদের প্রচুর সম্পদ্ আছে, তাহারাই ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া গণ্য। ঐশ্বর্য্যশালিগণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা-অনুসারে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হয় বলিয়া তাহাদিগকে ধনী আখ্যাও প্রদান করা যায়। এই নিমিত্তই বাঞ্ছনীয় পদার্থমাত্রকেই আমরা ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ্ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। সম্পদ্ শব্দের ইহা মোটামুটি ব্যাখ্যা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পদ্ শব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক। যে পদার্থ মানবের বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া মানবের সমস্ত অভিলষিত পদার্থই সম্পদ্ শব্দ বাচ্য

নহে। কুব্জের সোজা হইয়া হাঁটিবার ইচ্ছা এবং কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তের সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে পারে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই; কারণ স্বাস্থ্য অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারা যায় না। যে সকল বাঞ্ছনীয় পদার্থের বিনিময়ে অন্য-কোনো পদার্থ ক্রয় করিতে পারা যায়, তাহাকে সম্পদ্ বলিয়া গণ্য করা হয়। উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে সকল বস্তুকে সম্পদ্ বলা হইয়াছে, উহারা পার্থিব বা জড় পদার্থ। অপার্থিব কিছুই সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জগতের প্রায় যাবতীয় জড় পদার্থকেই সম্পদ্ বলা যাইতে পারে। রাস্তার ধূলি-কণাও ব্যক্তি-বিশেষের নিকট সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আবার সমস্ত অপার্থিব পদার্থই যে সম্পদ্ নহে, এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। কোন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী কিংবা চিকিৎসক ব্যবসায় হইতে অবসর-গ্রহণ-কালে তাহাদের ব্যবসায়ের সুনাম বা খ্যাতি (Goodwill) অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। ব্যবসায়ের খ্যাতি বা সুনাম অপার্থিব হইলেও উহা মানবের বাঞ্ছনীয় এবং হস্তান্তর-যোগ্য; সুতরাং ইহা প্রকারান্তরে সম্পদ্ বলিয়া গণ্য। উপরে সম্পদ্-বিষয়ে মোটামুটিভাবে বলা হইল; কিন্তু এতদপেক্ষা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নতুবা কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধীয় অর্থনীতির তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধ হইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত জড় পদার্থকে সম্পদ্ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে এবং পথের ধূলি-কণাও ব্যক্তি-বিশেষের নিকট সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হীরক এক প্রকার সম্পদ্; কারণ মানবের বাঞ্ছনীয় এবং হস্তান্তরযোগ্য। হীরক প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়; সুতরাং প্রস্তর খনি হইতে উত্তোলন করিয়া না ভাঙ্গিলে হীরক পাওয়া যায় না। কাজেই উহা সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির করিবামাত্রই হীরক সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হয় না। নানাপ্রকার প্রক্রিয়া-দ্বারা উহাকে মানবের বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিতে পারিলেই উহা সম্পদ্ শব্দ-বাচ্য হইতে পরে। প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাকে প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ বলা যাইতে পারে। এইরূপ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে

নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং অন্যান্য যে সকল উদ্ভিদের আহার্য্য-পদার্থ বিদ্যমান থাকে, উহাকেও প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ সকল গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ্‌গণ মানবের প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয় পদার্থ-সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে; এবং ঐসকল উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে কৃষকগণ অন্যান্য সামগ্রী লাভ করিতে পারে।

সম্পদ্ মানবের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী এবং মানবের এই আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত আগ্রহের প্রবলতার দ্বারাই সম্পদের গুরুত্বের তারতম্য এবং মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্রব্যের সহিত উহার মূল্যের সম্বন্ধ বাহ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহা-দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই পদার্থের মূল্যের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের আকাঙ্ক্ষার তারতম্যই এইরূপ মূল্যের ইতর-বিশেষের প্রধানতম কারণ। আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য থাকিলে মূল্য বৃদ্ধি এবং আকাঙ্ক্ষার অল্পতা হইতে মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মানবের আকাঙ্ক্ষারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। দুর্ভিক্ষের সময় চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যে-কোনো স্থানের অধিবাসিবর্গের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট থাকে, কারণ ক্ষুধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-শস্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হ্রাস হইয়া যায়। শস্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর সমান হয় না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং অন্য কোনও প্রকার প্রাকৃতিক কারণে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ এত কম হইতে পারে যে, স্থানীয় চাহিদা উহা-দ্বারা কিছুতেই সঙ্কুলান হইতে পারে না। এই অবস্থায় খাদ্য-শস্যের জন্য যাহাদের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারা ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য সাধারণ লোক অপেক্ষা অন্য প্রকারের বহু পরিমাণ সম্পদ্ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও একটি পদার্থের মূল্যে ঐ পদার্থ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যের পরিমাণ এবং ঐ পদার্থের আমদানির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই পরিমাণের তারতম্যের মূল বা ভিত্তি কি? কোন একটা জিনিষের মূল্য টাকাতে প্রচলিত আছে। যেমন কাপড়ের দর জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিবে একজোড়া কাপড়ের

মূল্য চারি টাকা। চাউলের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে এক টাকাতে পাঁচ সের অথবা এক মণ ৮৲ টাকায়। এইরূপ কোনো ব্যক্তির সম্পদের আভাস দিতে হইলে আমরা বলিয়া থাকি ঐ ব্যক্তির এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা আছে। কিন্তু এইরূপ টাকার দ্বারাই সম্পদের ধারণা করা যায় না। সম্পদের যথার্থ ধারণা করিতে হইলে প্রথমতঃ টাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হইবে। টাকা (সম্পদ্) হস্তান্তর করিবার একটি সুবিধাজনক অভিজ্ঞান বা নিদর্শন স্বরূপ। মনে করা যাক কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর চাউলের প্রয়োজন হইয়াছে। এখন যদি এমন কোনো চাউলের ব্যবসায়ী পাওয়া যায়, যাহার বস্ত্রের প্রয়োজন. তাহা হইলে অন্য-কোনও প্রকার নিদর্শন ব্যতীত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে চাউল পাওয়া যাইতে পারে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন টাকার পরিমাণের সহিত দ্রব্যের মূল্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় একটি দ্রব্যের মূল্য অপর একটি দ্রব্যে যাইয়া পর্য্যবসতি হয়।

হীরক-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, হীরক প্রস্তর-মধ্যে প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌রূপে থাকে বলিয়া, প্রচ্ছন্ন সম্পদকে কার্য্যকরী সম্পদে পরিণত করিতে দুইবার উহাকে অবস্থান্তরিত করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ দুইটি অবস্থা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এইরূপে প্রচ্ছন্ন বস্তুকে কার্য্যকরী অবস্থায় পরিবর্ত্তন করাকে উৎপাদন বলে এবং যাহারা উৎপাদন করে তাহাদিগকে উৎপাদক বলে। প্রত্যেক মনুষ্যই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উৎপাদক। এই উৎপাদন করিবার ক্ষমতাই মনুষ্যকে অন্যান্য প্রাণী হইতে প্রভেদ করিয়া প্রাণি-জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া আসিতেছে। ইতরপ্রাণিবর্গের মধ্যে পাখীরা নীড় নির্ম্মাণ করে ; কিন্তু ঐ নীড়-নির্ম্মাণ-কার্য্যকে উৎপাদ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না ; কারণ উহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং নির্ম্মাণপ্রণালী একপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয়। জীবন-ধারণের জন্য অহরহঃ যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হইতেছে, তাহা প্রকৃতিই উৎপাদন করিতেছে। চিরদিন প্রকৃতির দ্বারা এই উৎপাদন-কার্য্য চলিতে থাকিলে পৃথিবীতে সম্পদের

পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এই উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ক্রিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। উহার নাম ভোগ। সুতরাং উৎপাদন এবং ভোগ পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাত্মক। ভোগ চিরকালই উৎপন্ন সম্পদের ক্ষয় বা ধ্বংস করিয়া আসিতেছে। যদ্দারা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, তাহাই সম্পদ্ শব্দ-বাচ্য ; আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির জন্য সম্পদের অবস্থান্তরের নাম ভোগ। যেমন আমরা বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। এই বস্ত্র কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি উৎপাদকগণের কার্য্যের ফল। ইহা নূতন অবস্থায় আমাদের গাত্র-আচ্ছাদনের যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে, পুরাতন হইলে সেই আকাঙ্ক্ষা তদ্রূপ নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না। সেইজন্য দিন দিন উহার আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায় এবং অবশেষে আমরা উহাকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বর্জ্জন করি।

অর্থনীতি-সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা বলা হইল, উহার সহিত কৃষিকার্য্যের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। ধান্য উৎপাদন করিতে হইলে সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১০ সের বীজ বপন করিতে হয়। এই বীজ সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত ; কারণ ইহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিবার শক্তি আছে। নিজ পরিশ্রম-দ্বারা উপযুক্ত চাষ-আবাদ ও বীজ-বপন করিলে ঐ বীজ মাটি হইতে উপযুক্ত রূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া গাছের সৃষ্টি করে। আর ঐ গাছ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে উপযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ এবং পরিপাক করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করে। মনে করা যাক এইরূপে কৃষক দশ সের বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে ছয় মণ ধান্য উৎপাদন করিল সুতরাং তাঁতি, জোলা, দরজী এবং স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পী যেমন বস্ত্র ও অন্যান্য বেশভূষার উৎপাদক, কৃষকও তদনুরূপ ধান্যের উৎপাদক। কৃষক একাধারে যেমন উৎপাদক, তেমন ভোগীও বটে ; কারণ সে তাহার উৎপাদিত শস্যের কিয়দংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। অর্থনীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে জগতের অন্যান্য উৎপাদকের তুলনায় কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎপাদক ; কারণ সে মানবজাতির অত্যাবশ্যক বস্তু উৎপাদন করে।

ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন

কৃষকগণ অন্যান্য উৎপাদকের ন্যায় আপন পরিশ্রম-দ্বারা প্রচ্ছন্ন সম্পদকে অবস্থান্তরিত করিয়া প্রাপ্তব্য সম্পদে পরিণত করে। এই অবস্থান্তর করা ব্যাপারে কোন কোন বিষয় সবিশেষ প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

ইন্ধন বা জ্বালনী কাষ্ঠ মনুষ্যের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ; কারণ ইন্ধনের অভাবে রন্ধন অচল হইয়া পড়ে। যে সকল পল্লীর নিকট জঙ্গল আছে, ঐ সকল পল্লীর অধিবাসিগণ শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারাই উহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এ স্থলে ইন্ধন একটী প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ এবং পল্লীবাসিগণের অরণ্যে যাইয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহ ও আনয়ন-দ্বারাই এই সম্পদের অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, সম্পদ্ অল্প হইলেও কেবল পরিশ্রম-দ্বারাই তাহারা উহা উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে উহা সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, কারণ এই উৎপাদনের জন্য যে কাঁচা মালের (Raw materials) প্রয়োজন, তাহা সহজলভ্য নহে। বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, অথবা অনেক সময় বৃক্ষের তলদেশেও উহা পড়িয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষের অবস্থিতির জন্য ভূমির প্রয়োজন; সুতরাং দেখা যাইতেছে উহা উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম ব্যতীতও আর একটি দ্রব্যের প্রয়োজন হইতেছে। উহা মৃত্তিকা। পল্লীবাসিগণ নিত্য ব্যবহারের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করে; সুতরাং এখানে উৎপাদন এবং ভোগ তুল্য।

যথা, কোন এক নগরে ইন্ধনের যথেষ্ট চাহিদা আছে অথচ নগরের প্রত্যেক পরিবার হইতে এক এক ব্যক্তিকে কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রেরণ করাও সম্ভবপর নহে; এবং নগরের সন্নিকটে অরণ্য না থাকাও সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কাষ্ঠ-সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যাপার কোন একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায় হইয়া পড়িবে। ঐ সকল লোক যেখানে অধিক কাষ্ঠ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তথায় যাইয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহ-পূর্ব্বক নগরে আনিয়া বিক্রয় করিবে এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ-দ্বারা আপন আপন

আহার্য্যের সংস্থান করিবে। এখানেও ঐ কাষ্ঠ-ব্যবসায়িগণের প্রত্যেকেই যদি কাষ্ঠ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে উৎপাদন ও ভোগ তুল্যাতুল্য হইবে। এখন এই কাষ্ঠ-সংগ্রাহকগণের মধ্যে যদি এক ব্যক্তির একখানা কুঠার থাকে, তাহা হইলে সে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিবে; অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একখানা কুঠারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহ করিলে, তাহার সংগৃহীত কাষ্ঠের পরিমাণ এইরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে, কাষ্ঠ বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সম্পূর্ণরূপে তাহার খাদ্য-সংগ্রহের জন্য ব্যয় হইয়া যাইবে না; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানবের খাদ্যাকাঙ্ক্ষা নির্দ্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ। এখানে দুইটী লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে। প্রথম কুঠার এবং দ্বিতীয় উৎপাদন অপেক্ষা ভোগের অল্পতাহেতু সম্পদের সঞ্চয়। কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য কুঠারের প্রয়োজন, কারণ কুঠারের সাহায্যে ঐ কার্য্য সহজসাধ্য হয় এবং এই জন্যই কাঠুরিয়া কুঠার পাইতে ইচ্ছা করে। কুঠার পাইতে হইলে, যে শিল্পী কুঠার প্রস্তুত করে, তাহাকে উহার পরিবর্ত্তে এমন সম্পদ্ দান করিতে হইবে, যাহা তাহার কোন এক ইচ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে কুঠারও এক প্রকার সম্পদ্। এই প্রকার সম্পদ্‌কে মূলধন কহে। এখন মনে রাখিতে হইবে, উৎপাদনের জন্য তিনটী বস্তুর প্রয়োজন—(১) ভূমি, (২) পরিশ্রম, এবং (৩) মূলধন। অর্থনীতিতে ভূমি শব্দ ব্যাপক ভাবেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে ভূমি প্রাকৃতিক (Gifts of nature) সকল সম্পদ্ বুঝায়। খনিজ সম্পদ্, সমুদ্র, নদী ও বিলে মৎস্য-সম্পদ্ও ভূমি-সম্পদের ন্যায় প্রকৃতির দান।

কৃষকগণের পক্ষে ভূমি যে অতি প্রয়োজনীয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সকল প্রকার উৎপাদনের জন্যই ভূমির প্রয়োজন হয়। বৃহৎ বৃহৎ কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়েও ভূমির প্রয়োজন। মনুষ্যের কার্য্যকারিতার ফলেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। মানুষের দাঁড়াইবার জন্যও মাটির প্রয়োজন হয়। অর্থনীতি-অনুসারে জমি কি এবং উহার

বিশেষত্ব কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়, সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভূমি মৌলিক পদার্থ (Material), এবং মানবের পক্ষে ইহা বাঞ্ছনীয়। এতদ্ভিন্ন ইহা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া সম্পদ্-মধ্যে পরিগণিত। এই শ্রেণীর সম্পদের বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্থাবর এবং ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই ইহার মূল্য আয়তন অপেক্ষা সংস্থানের উপর অধিক নির্ভর করে। কৃষিকার্য্যের জন্য যে জমির প্রয়োজন তাহার মূল্য ঐ জমির গুণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যে ভূমি সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছন্ন, অথবা জলপ্লাবিত সে ভূমি কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সহর অথবা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে অধিক দূরবর্ত্তী স্থান কারখানার জন্য উপযোগী নহে। কারণ কারখানা চালাইতে হইলে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল এবং বহু-সংখ্যক জন-মজুরের প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমির মূল্য ভূমির গুণের উপর নির্ভর করে। যে ভূমি চাষের পক্ষে উপযোগী এবং যাহাতে উত্তম ফসল উৎপন্ন হয়, সেই জমিই কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত। মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডলস্থিত জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলি স্বতন্ত্রভাবে গুণহীন হইলেও উহাদের বিবিধ প্রকার সংমিশ্রণ শস্যোৎপাদনের সহায়তা করে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন সম্পদের অর্থাৎ উল্লিখিত জৈব ও অজৈব পদার্থগুলির সহজ-প্রাপ্য অবস্থাই মাটির গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যদি মৃত্তিকামধ্যে ঐ সকল প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব হয়, অথবা উহারা সহজ প্রাপ্য অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে ঐ মৃত্তিকার গুণের ব্যত্যয় ঘটে। উৎপাদন কার্য্যের দ্বিতীয় সহায়তাকারী পরিশ্রম। ছুতার কোনো একটি গাছের গুঁড়ি অথবা স্থূল শাখা হইতে লাঙলের গাদা এবং লোহার মিস্ত্রি একখণ্ড লৌহ হইতে ফলা প্রস্তুত করে। এই দুই-শ্রেণীর পরিশ্রমের ফলে লাঙল উৎপন্ন হয়। ইহা একটি সহজ উৎপাদনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি বিশেষ উৎপাদনের বিষয় চিন্তা করিলে পরিশ্রমের পরিণাম সহজ বলিয়া মনে হইবে না। এ স্থলে বিবিধ প্রকার পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানাতে বহুসংখ্যক লোক শারীরিক পরিশ্রম আর কতকগুলি লোক মানসিক পরিশ্রম-দ্বারা উৎপাদন-কার্য্যের সহায়তা

করে। উৎপাদন-কার্য্যের প্রত্যেক অবস্থা বা স্তর যাহাতে সমভাবে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে কাঁচামাল ক্রয় এবং উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের সর্ব্বদা সুবন্দোবস্ত থাকে, এইরূপভাবে কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। শারীরিক এবং মানসিক দুইপ্রকার পরিশ্রমের বিভিন্নতা এইখানে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সুব্যবস্থামূলক উৎপাদন-কার্য্যেই যে কেবল এই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, সহজ উৎপাদন কার্য্যও একই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম-দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূত্রধর লোহার মিস্ত্রির কার্য্যে অপারগ বলিলে এ কথা বুঝা যায় না যে, সূত্রধর লৌহকারের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। আসল কথা, লৌহের কার্য্যে যে মানসিক পরিশ্রমের আবশ্যক তাহা সূত্রধরের আয়ত্তে নাই।

উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহার বিশেষত্ব কি, এবং কেনই বা মনুষ্য ঐ পরিশ্রম স্বীকার করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—প্রত্যেক মনুষ্যেরই আকাঙ্ক্ষা আছে এবং এই আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির জন্য তাহার সম্পদের প্রয়োজন। কারণ সম্পদের বিনিময় ব্যতীত কোন আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ লাভ করা যায় না। আবার পরিশ্রম ব্যতীতও সম্পদ্ লাভ হয় না বলিয়া মানবমাত্রকেই পরিশ্রম করিতে হয়। এখন দেখা গেল যে, কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে হইলেই পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। অতঃপর আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কোথায় এবং কি ভাবে পরিশ্রম নিয়োজিত করিতে হইবে। পরিশ্রম বিবিধ প্রকারের, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোকের আবশ্যক হয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ লাভ করিবার জন্য যেমন পরিশ্রম করিতে হয়, তেমনি তাহাকে এমন স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যে স্থানে পরিশ্রম-দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু উৎপাদন করিলে অনায়াসে তাহা বিক্রীত হইতে পারে। ভূমির ন্যায় পরিশ্রম নিশ্চল বা স্থাবর নহে, কিন্তু পরিশ্রমের বিশেষত্ব এই যে ইহার গতিক্ষমতা অসম্পূর্ণ। জনসাধারণেরই কোন একটা বিশেষ স্থানের প্রতি একটা ভালবাসার আকর্ষণ আছে। ঐ স্থানকে বসত-বাটী বলে। ঐ

বসত-বাটীতে বাস করিয়া পরিশ্রম-দ্বারা আশানুরূপ সম্পদ্ না পাইলেও, অর্থাৎ ঐ পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ্-দ্বারা তাহার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হইলেও এবং বিদেশে যাইয়া পরিশ্রম-দ্বারা অধিক সম্পদ্ লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও আপন বসত-বাটী ছাড়িয়া তাহারা তথায় যাইতে চাহে না।

শারীরিক ও মানসিক ভেদে পরিশ্রম দ্বিবিধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মানব-জাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আকাঙ্ক্ষাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। এবং এই সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য সম্পদ্ও পরিমাণে অধিক এবং বিবিধ প্রকার হইয়াছে। যে সকল কার্য্যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, সেইদিকেই মনুষ্যের অধিক আকর্ষণ; কারণ এইরূপ কার্য্যে অধিক পরিমাণ সম্পদ লাভ হয়। লৌহকার বুদ্ধিমান্ ও উন্নতিশীল হইলে ক্রমে সাধারণ দোকান ছাড়িয়া ছোট কারখানা খুলিতে পারে এবং ঐ কারখানাতে কলের সাহায্যে যাবতীয় কার্য্য-সম্পাদন করিতে পারে। ইহার ফলে সে শারীরিক পরিশ্রম লাঘব করিয়াও অধিক সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হয়। কায়িক পরিশ্রমের লাঘব করিবার জন্য কলের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করাই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব। শ্রম ও শ্রমিক-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই বিষয়টার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে এই প্রশ্ন এখন পর্য্যন্তও জটিল হয় নাই, সুতরাং এখানে ইহার কেবলমাত্র উল্লেখ করা গেল।

উৎপাদনের নিমিত্ত আর একটা পদার্থ অতি প্রয়োজনীয়, উহাকে মূলধন বলে। ইতঃপূর্ব্বে কাঠুরিয়ার প্রসঙ্গে তাহার কুঠারকে মূলধন বলা হইয়াছে; কারণ কুঠারের সাহায্যে সে সম্পদ্ অর্জ্জন করে। কুঠার কাঠুরিয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং ইহা ক্রয় করিতে তাহাকে সম্পদ্ ব্যয় করিতে হইয়াছিল এবং এই সম্পদ্ সঞ্চয় করিতে তাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাহার ভোগের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক সম্পদ্ অর্জ্জন করিয়া তাহাকে তাহা সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। কুঠার ক্রয় করিবার পরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাহার সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহার

খাদ্যের জন্য যে সম্পদ্ ব্যয় করার প্রয়োজন তদতিরিক্ত সম্পদ্-দ্বারা এখন সে ভোগের জন্য অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ।

কুঠার মূলধন বলিয়া সম্পদ্-মধ্যে গণ্য, কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ-সংগ্রহের নিমিত্ত কুঠার ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ ইহা সম্পদ্-উপার্জ্জনের সহায়তা করে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, যে সম্পদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ সম্পদ্ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অতএব মূলধনমাত্রই সম্পদ্; কিন্তু সম্পদ্মাত্রই মূলধন নহে। কৃষক কৃষিকার্য্য-দ্বারা অধিক ধান্য উৎপাদন করিলে, এ ধান্য তাহার সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হয়। এই ধান্যের যে অংশ তাহার আহার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়, তাহাকে মূলধন বলা যায়; কিন্তু উহা প্রত্যক্ষভাবে মূলধন নহে, পরোক্ষভাবে মূলধন; কারণ আহারের অভাব হইলে কৃষক কৃষিকার্য্য করিতে অক্ষম হইত, সুতরাং সম্পদ্ উৎপাদন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। এই উৎপাদিত ধান্যের যে অংশ বিক্রয় করিয়া কৃষক তৈজস এবং অলঙ্কার ইত্যাদি ক্রয় করিল, ঐ তৈজস এবং অলঙ্কারাদিও সম্পদ্; কিন্তু উহা মূলধন নহে; কারণ ঐ সকল ক্রয় করিতে যে পরিমাণ সম্পদ্ ব্যয় হইয়াছে, উহা বিক্রয় করিলে তদতিরিক্ত সম্পদ্ লাভ করা যাইবে না। কিন্তু ঐ উৎপাদিত ধান্যের অবশিষ্ট যে অংশ বীজের জন্য রক্ষিত হইয়াছে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ ঐ বীজ-ধান্য বপন করিয়া, পরবর্ত্তী বৎসর যে ধান্য উৎপাদিত হইবে তদ্দ্বারা ঐ কৃষকের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যের জন্যও ভূমি, পরিশ্রম এবং মূলধন এই তিনটী পদার্থ অতিপ্রয়োজনীয়।

আমদানী, চাহিদা ও বাজার

ইতঃপূর্ব্বে আমরা প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ বাস্তব সম্পদে রূপান্তরিত করাকে উৎপাদন (Production) আখ্যা প্রদান করিয়াছি এবং যাহা কিছু মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে তাহাকেই সম্পদ্ নামে অভিহিত

করিয়াছি। উৎপাদন-ক্রিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি পদার্থের সংবিন্যাস বা রচনা করিবার শিল্প নহে। এই সংবিন্যাস দ্বারা এমন একটী পদার্থ গঠিত হওয়া প্রয়োজন, যদ্দ্বারা মানবের কোন না কোন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে এবং উৎপাদন-কার্য্য এমন স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, যে স্থানের অধিবাসিবর্গের আকাঙ্ক্ষা এই উৎপন্ন পদার্থ দ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে। বাংলা দেশে পশমী পোষাক প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু বাংলা শীত-প্রধান দেশ নহে বলিয়া তথায় উহার অধিক প্রচলন নাই। যদি এই সকল পোষাক, যে স্থানে পশমী পোষাকের অভাব এবং আকাঙ্ক্ষা আছে, তথায় চালান দিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত না করা যায়, তাহা হইলে উহা উৎপাদন বলিয়া গণ্য হইবে না। যে স্থানের অধিবাসিবর্গ ইংরাজী ভাষাতে অনভিজ্ঞ, সে স্থানে ইংরাজী ভাষাতে পুস্তক মুদ্রণ করা উৎপাদন নহে, বরঞ্চ অপচয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কারণ যে কাগজ এই ইংরাজী পুস্তক-মুদ্রণে ব্যয় হইল, সেই কাগজে স্থানীয় ভাষাতে পুস্তক মুদ্রিত হইলে প্রকৃত উৎপাদন বলিয়া গণ্য হইত। উৎপন্ন পদার্থের জন্য জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা থাকা এবং যে স্থানে ঐ পদার্থের অভাব রহিয়াছে, সেই স্থানে, সেই পদার্থ সরবরাহ করার উপর উৎপাদন-কার্য্য নির্ভর করে।

কেবলমাত্র নিজের অভাব-মোচনের জন্য যে উৎপাদন, তাহা সহজ বা সরল উৎপাদনের উদাহরণ, যেমন ইতঃপূর্ব্বে আপন আপন ইন্ধনের উপযোগী কাষ্ঠ-সংগ্রহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কৃষি সম্বন্ধেও অতি প্রাচীনকালে এইরূপ উৎপাদনের প্রথাই প্রচলিত ছিল; কিন্তু ঐ প্রকার সরল উৎপাদনের অবস্থা বহুকাল যাবৎ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক উৎপাদকই প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজ পরিশ্রমের ফল দ্বারা কেবল নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিয়া, অন্যের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি-উদ্দেশ্যে উৎপাদন-কার্য্যে রত হয়। এই নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত পদার্থটী সহজসাধ্য করিয়া তুলিতে হয়। কোন্ স্থানে, কোন্ পদার্থের চাহিদা আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ স্থানে ঐ পদার্থের আমদানীর ব্যবস্থা করিলেই কার্য্য শেষ হইল না। দেখিতে হইবে, যাহারা ঐ

পদার্থ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের উহা লাভ করিবার জন্য যে পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন, তাহা উৎপাদনের ক্ষমতা তাহাদের আছে কি না। মনে করা যাক, একজন কৃষক একখানা লোহার লাঙ্গল ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল, কারণ সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, উহা দ্বারা কর্ষণের কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালিত হয়। ঐ স্থানেই আর এক ব্যক্তির লোহার লাঙ্গলের ব্যবসায় আছে। যদি ঐ কৃষকের লোহার লাঙ্গল ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ না থাকে, তবে তাহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর লাঙ্গল ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ থাকিলেও উহা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে সে অবশ্যই চিন্তা করিয়া দেখিবে— যে অর্থ তাহার সঞ্চিত আছে, উহা হইতে লাঙ্গল ক্রয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তাহার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করা চলিবে কি না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই লাঙ্গল ক্রয় করা না করা তাহার অন্যান্য কতকগুলি ইচ্ছা পূরণ করা না করার উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ একদিকে লাঙ্গল ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা—এই উভয় আকাঙ্ক্ষার বলবত্তার উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়া আর একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। যদি উপরি-উক্ত কৃষকের ন্যায় অপর একজন কৃষকেরও একটী লোহার লাঙ্গল ক্রয় করিবার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, এবং তথাকার লাঙ্গল-ব্যবসায়ীর নিকট কেবলমাত্র একটী লাঙ্গলই মজুত থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝিয়া ঐ লাঙ্গলটীর মূল্য এত বৰ্দ্ধিত করিয়া চাহিতে পারে যে, পরস্পর প্রতিযোগী ক্রেতাদ্বয়ের মধ্যে একজনকে তাহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব দেখা যায়, দ্রব্যের মূল্য কেবল চাহিদার উপর নির্ভর করে না, চাহিদা ও আমদানী এই দুয়েরই উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে একজন সরবরাহকারী ও দুইজন ক্রেতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য কি প্রকারে নিরূপিত হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। যে স্থানে বহু সরবরাহকারী এবং বহু ক্রেতা বর্ত্তমান, সে

স্থানে মূল্য-নিরূপণ-প্রণালী মূলতঃ পূর্ব্বের ন্যায় হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় সহজবোধ্য হয় না। পূর্ব্ব-বর্ণিত ব্যাপারে বিক্রেতার সংখ্যা এক এবং ক্রেতার সংখ্যা দুই, কিন্তু এ স্থলে ক্রেতাদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা বলবতী নহে, তাহাদের ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপর মূল্য-নিরূপণ নির্ভর করে। সেইরূপ যেখানে দুইজন বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতা বর্ত্তমান, সেখানে বিক্রেতাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা বলবতী নহে, তাহার বিক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের উপর মূল্য-নিরূপণ নির্ভর করে। এখানে বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের নিরূপিত মূল্য অপেক্ষা কম হইবে। আর যেখানে একই দ্রব্যের বহু বিক্রেতা এবং বহু ক্রেতা বর্ত্তমান, সেখানে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা একে অপরের বিরোধী হইয়া মূল্য-নিরূপণ-ব্যাপারকে একটী সমস্যায় পরিণত করিয়া তুলে। কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধেই ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মনে করা যাক, একজন কৃষকের বিক্রয় করিবার জন্য কিছু ধান্য মজুত আছে। এই ধান্য-বিক্রয়ের জন্য প্রতিদিনই তাহাকে বাজারে যাইয়া দর ও ক্রেতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়, কারণ তাহার ইহা জানা আছে যে, তাহার ন্যায় এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের বিক্রয়ের জন্য ধান্য মজুত আছে এবং তাহারা উহা বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ইহা ছাড়া, তাহার আরও জানা আছে যে—যদি কোন প্রকারে ধান্য বিক্রয় করিবার কোন একটী সুযোগ তাহাকে হারাইতে হয়, তবে তাহার সমব্যবসায়ীর মধ্যে যাহার বিক্রয়ের আকাঙ্ক্ষা অপরাপরের অপেক্ষা প্রবল, সে ব্যক্তি ঐ সুযোগ আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ এই সুযোগে সে ধান্য বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। এখানে যে সকল অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা হাট বা বাজারের পক্ষে প্রযোজ্য। একদিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের বিক্রয়ের ইচ্ছা বা দ্রব্যের আমদানী এবং অপরদিকে ঐ দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়ের ইচ্ছা, অর্থাৎ চাহিদা বর্ত্তমান। ঐ আমদানী ও চাহিদার অনুপাতের উপরেই মূল্য বা বাজার-দর নির্ভর করে। আমদানী ও চাহিদা কতকগুলি বিশেষ

ইচ্ছার সহিত জড়িত এবং উহা ঐ সকল ইচ্ছার প্রভাবের তারতম্য-অনুসারে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। কোন দ্রব্যের মূল্য বাজার অপেক্ষাও অধিক হইতে পারে; কিন্তু এই প্রকার মূল্যের আধিক্য ক্রেতার ইচ্ছার বলবত্তার উপর নির্ভর করে; যথা, যখন চাউলের দর টাকায় /৮ সের, এক ব্যক্তির তখন নিজ পারিবারিক খাদ্যের জন্য দৈনিক /৪ সের চাউলের প্রয়োজন। যদি চাউল মহার্ঘ্য হইয়া টাকায় /৬ সেরে পরিণত হয়, তাহা হইলে হয় তাহাকে ঐ /৪ সের চাউলের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হইবে, অথবা তাহাকে /৪ সের অপেক্ষা কম চাউল ক্রয় করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইলেও এই বিরুদ্ধতার মীমাংসা আপোষেই হইয়া থাকে। তাহাকে চাউলও অল্প ক্রয় করিতে হয়, অথচ অর্থও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়। বাজার-দর বৃদ্ধি পাইলে সাধারণতঃ চাহিদার হ্রাস হয়। মূল্য-বৃদ্ধির কারণ ইহাতে বুঝা যায় না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত চাহিদার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রত্যেক হাট এবং বাজারেই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা আছে; এবং সেই চাহিদা সঙ্কুলানের জন্য আমদানীরও একটা নির্দ্দিষ্টতা আছে। যে পর্য্যন্ত আমদানী ও চাহিদা স্থির থাকে, সে পর্য্যন্ত দ্রব্য-হস্তান্তরে মূল্যও নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু বাজারে আমদানীর পরিমাণ অথবা চাহিদা-পূরণের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্যের আবশ্যক, তাহার পরিবর্ত্তন হইলে, সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বিশদভাবে বুঝান যাক; যথা, কোন হাটে সমগ্র বৎসরব্যাপী যে ধান্য বিক্রয় হয়, তাহা ঐ হাটের চতুষ্পার্শস্থ গ্রামসমূহ হইতে আমদানী হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক হাটের দিবস নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য আনীত হইয়া থাকে। যদি কোন বৎসর ঐ সকল গ্রামের ধান্যের ফসল দৈবাৎ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি হাটে ধান্যের আমদানী স্বভাবতঃই হ্রাস হইয়া যাইবে, কিন্তু চাহিদা পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া যাইবে—সুতরাং ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। পুনরায় কোন ব্যবসায়ী বহুপরিমাণ ধান্য

দূরদেশে চালান দেওয়ার জন্য চুক্তি গ্রহণ করিল, ঐ অবস্থায় ঐ ব্যবসায়ের চাহিদা স্বভাবতঃই বাজারের নির্দ্দিষ্ট চাহিদা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। সুতরাং এই এক ব্যক্তির চাহিদার আধিক্যের জন্যও ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদার পরিমাণ-বৃদ্ধি এবং আমদানীর হ্রাস হইলে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ চাহিদার হ্রাস ও আমদানীর বৃদ্ধি হইলে মূল্যের হ্রাস হওয়া সুনিশ্চিত।

এখন হাট বা বাজার বলিলে কি বুঝায়, তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যেখানে বিবিধপ্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহাকেই আমরা হাট বা বাজার বলিয়া থাকি; কিন্তু অর্থনীতির দিক্ দিয়া তাহাকে বাজার বলা চলে না। অর্থনীতি হিসাবে বাজার বলিতে যেখানে কেবল একজাতীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাকেই বুঝায়। ধান্যের হাট বা বাজার অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বাজার হইতে স্বতন্ত্র। বিবিধপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের বাজার বিবিধপ্রকার ইচ্ছার উপরে, অর্থাৎ বিবিধপ্রকার দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। এই ইচ্ছাসমূহের পরস্পরের ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয়। কোন দ্রব্য বা সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের স্থানকেও হাট বা বাজার বলা যায় না। অবশ্য এখানে ক্রয় করিবার ইচ্ছা বহু, কিন্তু বিক্রয়ের ইচ্ছা কেবল একটা, আর এ স্থানে চাহিদার বৃদ্ধির সহিত আমদানীর মোটেই বৃদ্ধি নাই। সুতরাং হাট এবং বাজার বলিতে এমন ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকে বুঝিতে হইবে, যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের সম্পদ্ এইরূপ অবস্থাতে হস্তান্তরিত হয় যে, চাহিদা এবং আমদানীর বহুবিধ স্বতন্ত্র ইচ্ছা একে অন্যের উপর সহজভাবে ক্রিয়া করিতে পারে।

প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে আমদানী ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার পরিশ্রম-লব্ধ দ্রব্যবিশেষের বাজারে চাহিদা আছে কি না তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাকে আরও দেখিতে এবং শিক্ষা করিতে হইবে যে—কোন্ বাজারে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। অর্থনীতি-হিসাবে বলিতে গেলে উৎপাদনকারী যে সম্পদ্ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা

সে এমন স্থানে বিক্রয় করিবে, যে স্থানে ঐ প্রকার সম্পদ্ লইবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সম্পদ্-উৎপাদনের নিমিত্ত ভূমি ও মূলধনের আবশ্যক। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত বস্তুটী স্থাবর এবং উহা কেহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, এবং শেষোক্তটী অস্থাবর এবং উহা উৎপাদন-সাপেক্ষ। এই উভয়েরই বাজার-দর আছে। মূলধনের বাজারও অন্যান্য বাজারের ন্যায় আমদানী ও চাহিদা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। কিন্তু জমির বাজার সম্বন্ধে এ বিষয় প্রযোজ্য হইতে পারে না; কারণ উহার চাহিদা সর্ব্বদা সমান নহে; অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমদানী নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং জমির মূল্য সর্ব্বদাই অনিশ্চিত এবং উহা জমির সংস্থান ও সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ীর পক্ষে বাজারের মধ্যে দোকান স্থাপন করাই সুবিধাজনক; নতুবা তাহার দোকান জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু কৃষকের পক্ষে ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

জমির মূল্য একপ্রকার সম্পদ্ এবং ইহা এমন কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। কোন একখণ্ড জমির সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু মূলধনের বাজারের অবস্থা অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুরূপ। ধান্যের মূল্যের ন্যায় মূলধনের মূল্যও সঠিক এবং উহা সহজে নির্দ্ধারণ করা যায়। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহার মূল্যও আমদানী এবং চাহিদার নিয়মের বিষয়ীভূত।

ধান্য-বিক্রয়ের মূল্য পাকাপাকিরূপে স্থির করিবার সময়, যাহাতে কিছু লাভ থাকে, কারবারে এইরূপ ভাবেই বন্দোবস্ত করা হয়; এবং ঐ মূল্য টাকাতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে; অর্থাৎ দশ সের ধান্য ক্রয় করিয়া ১৲ টাকা দিলাম। ইহাতে ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্রেতার কারবার সিদ্ধ হইল। মূলধন বিষয়েও মূল্য এইরূপ টাকাতেই নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু এইপ্রকার কারবারের ধর্ম্ম এই যে, দাবীমাত্রেই পাওনা চুকাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয় না। আবশ্যক-অনুযায়ী নগদ টাকা হাতে থাকিলে, ধার

করিবার প্রয়োজন হয় না; নতুবা সম্পদ্ ধার দেওয়ার সময়, ঋণ-গ্রহীতা যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সম্পদ্ রাখিবে, ততদিন মাসিক বা বাৎসরিক হারে ঋণ-দাতাকে কতক টাকা দিবে। এইপ্রকার টাকার অঙ্ক সাধারণতঃ বাৎসরিক শতকরা হিসাবে ধরা হয়। বাৎসরিক শতকরা ১০৲ টাকার অর্থ এই যে, ঋণ-গ্রহীতা ঋণ-দাতাকে প্রত্যেক একশত টাকার মূল্য বাবদ প্রতিবৎসর দশ টাকা দিবে। ইহাকেই চলিত কথায় সুদ বলে। এই সুদ মূল ঋণের টাকা হইতে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ কেবল সুদ দিলেই মূল ঋণের টাকা দেওয়া হইবে না। দেনা-পাওনার কারবার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, মূলধনও একপ্রকার সম্পদ্, এবং ইহার মূল্য আমদানী ও চাহিদার অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনীয়। মূলধন যোগাইবার সুবিধা অধিকাংশ সহরেই আছে—এবং এইগুলিকেই ব্যাঙ্ক (Bank) বলা হয়। অল্প সুদে টাকা গচ্ছিত রাখা এবং এই গচ্ছিত সম্পদ্‌কে মূলধনরূপে ঋণপ্রার্থিগণের নিকট উচ্চহারের সুদে ধার দেওয়াই ঐ সকল ব্যাঙ্কের কার্য্য। কতকগুলি ঋণদাতার সমবায়ে এই সকল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। ইহারা গচ্ছিত সম্পদ্ ঋণগ্রহণেচ্ছুগণের নিকট ধার দেওয়ার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে এবং ইহার জন্য এক ব্যাঙ্কের সহিত অপর ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতার ফলে কোন ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতাদিগের নিকট হইতে কি হারে সুদ গ্রহণ করিবে তাহা ধার্য্য হয়। অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় এই সুদের হারও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

উৎপাদনের অন্যতম উপাদান পরিশ্রম। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই উৎপাদনকারী আপন সাহায্যের জন্য অন্য লোক লইতে চেষ্টা করে। মজুরী দিতে স্বীকৃত হইলে মজুর পাওয়া যায় কিন্তু মজুর বিষয়েও আমদানী এবং চাহিদা একে অন্যের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ইহাদের প্রত্যেকের ভিত্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মজুরের অবস্থা এবং বাজারের অবস্থা একই প্রকার এবং মজুরও এক প্রকার সামগ্রী (Commodity)। তবে অন্যান্য সামগ্রীর সহিত ইহার বিভিন্নতা এই

যে ইহার নিজের একটা ইচ্ছা আছে। মজুরের মজুরী কিংবা বেতনের অঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি উহার আমদানী এবং চাহিদার উপর নির্ভর করে।

ভূমির স্বত্বাধিকার

অর্থনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কৃষক একজন উৎপাদনকারী এবং তাহার উৎপাদন-কার্য্যের জন্য ভূমি, পরিশ্রম এবং মূলধন, এই তিনটা বিষয়ের প্রয়োজন হয়। এই তিনটী বিষয়ের বিশেষত্ব কি, তাহাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এখন কৃষকের সহিত ঐ তিনটী বিষয় কি ভাবে সংশ্লিষ্ট, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রত্যেক দেশেই, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, ভূমির স্বত্ব কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের বা সমিতির অধিকারভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কোন ব্যক্তির কোন কার্য্যের জন্য ভূমির প্রয়োজন হইলে, হয় তাহাকে উহা ক্রয় করিতে হইবে, কিংবা উহার স্বত্বের পত্তনি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সে যে একজন পূর্ব্ববর্ত্তী মালিকের দখলী স্বত্ব স্বীকার করিতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। জমি ক্রয় করিবার কালে ক্রেতা, এই স্বত্বের অধিকার পুত্র-পৌত্রাদি কিংবা তাহার স্থলবর্ত্তি-ক্রমে ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া, ইহার বিনিময়ের অন্য প্রকার সম্পদ্ প্রদান করে। কিন্তু জমি ইজারা পত্তনি গ্রহণ করিলে সে উহার স্বত্বের অধিকার কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে মাত্র। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে জমি আর তাহার অধিকারে থাকে না,—উহা পূর্ব্ববর্ত্তী মালিকের অধিকারে চলিয়া যায়। এই ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকার-প্রাপ্তির জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, ক্রয় করা জমির মূল্যের অনুপাতে তাহার পরিমাণ কম হয়; এবং ভোগের সময়ের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে ঐ টাকার পরিমাণেরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিরকালের জন্য জমি ক্রয় করে, তাহাকে জমিদার বা ভূম্যধিকারী বলা হয় এবং

যাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল ভোগের জন্য খাজনা দেয়, তাহাদের রায়ত বা প্রজা বলা হয়। ভূম্যধিকারী স্বয়ং তাহার অধিকারের জমি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে চাষ-আবাদ করিতে পারে; অথবা যে অংশ স্বয়ং চাষ-আবাদ করে না তাহা প্রজার নিকট পত্তনি দিতে পারে; সুতরাং ভূম্যধিকারী এবং রায়ত উভয়েই কৃষক বা চাষা হইতে পারে। ভূম্যধিকারীর স্বয়ং জমি চাষ করা অথবা প্রজার নিকট পত্তনি দেওয়া নানা অবস্থা ও বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এ পর্য্যন্ত আমরা জমির উপর স্থায়ী এবং অস্থায়ী এই দুই প্রকার স্বত্বাধিকারের বিষয় অবগত হইতেছি। ইহা ছাড়া অন্য একপ্রকার স্বত্বাধিকার আছে, উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষে পর্য্যবসিত নহে। উহাকে রাজকীয় অধিকার বলে। কোনও একটী বস্তু-বিশেষের একাধিক অধিকার বর্ত্তমান থাকিলে, ঐ অধিকারসমূহের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, এবং সচরাচর হইয়াও থাকে। জমির স্বত্ব সম্বন্ধেও ইহার ব্যত্যয় হয় না। প্রজার স্বার্থ সহজবোধ্য। সে জমি চাষ-আবাদ করিয়া সম্পদ্ উৎপাদনের নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করে এবং ঐ অনুমতি-প্রদানের পরিবর্ত্তে সে ভূম্যধিকারীকে কিছু টাকা দেয়। প্রজা ভূম্যধিকারীকে কি জন্য টাকা দেয় এবং ঐ টাকার পরিমাণ কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় বিবেচনা-সাপেক্ষ।

যে কোন প্রকার সম্পত্তি বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কি না, এ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে; কারণ প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ বা বাস্তব সম্পদের উৎপত্তিস্থান কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; ইহা প্রকৃতির দান। অবশ্য এই প্রচ্ছন্ন সম্পদের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে প্রাথমিক যে উদ্যোগের প্রয়োজন, তাহা ব্যক্তিগত। এই উদ্যোগের জন্য ব্যক্তিগত পুরস্কার বা লাভের আশা না থাকিলে উহা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনে করা যাক, কোনও এক ব্যক্তি একটী জেলার সমগ্র

ভূমি ক্রয় করিয়া যদি অন্য কোনও ব্যক্তিকে ঐ ভূমিতে চাষ-আবাদ বা ভোগ-দখলে স্বত্ব না দেয়, এবং স্বয়ং উহাতে বাগ-বাগিচা ইত্যাদি প্রস্তুত করে, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এখানে আমরা ভূমির স্বত্বাধিকারীর প্রথম অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তি দেখিতে পাই। এই কঠোর নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিলে জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার লোপ পাইবে; এবং এই স্বত্ব রাজকীয় স্বত্বে অর্থাৎ রাজাধিকারে পর্য্যবসিত হইবে। সকল দেশেই নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ শাসন-পদ্ধতির বিকাশ ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ ও অশান্তির কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। ঐ অবস্থাতে ভূম্যধিকারীর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। তখন তাহাকে শক্তি-সংগ্রহ-পূর্ব্বক শত্রুগণের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করিতে হইত। ভূম্যধিকারী শত্রুগণের অত্যাচার হইতে প্রজা-রক্ষা করিয়াছে এবং ভূমিও রক্ষিত হইয়াছে—এই অজুহাতেই ভূম্যধিকারী জমির উপর একটী দাবী করিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষা করিতে যাহারা বিশেষভাবে কার্য্য অথবা সহায়তা করিয়াছে, রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে সরকারের খাস দখলীর ভূমি দান করা হইয়াছে। আবার যে সকল দেশে লোক-সংখ্যা অল্প, সে সকল দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজসরকার হইতে ভূমিদান করিয়া অন্য দেশ হইতে লোক আকৃষ্ট করিয়া আনা হয়। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য অর্থনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে এই পন্থা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু এইভাবে যে স্বত্বের উদ্ভব হইয়া রাজসরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার বিলোপ করা অসম্ভব।

জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় সকল অবস্থাতেই একটী বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত হইয়া আছে। রাজসরকারের সাহায্যের জন্য যাহাদিগকে জমি দান করা হইত, সেই সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লওয়া হইত, পরে ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থার উন্নতি ও শাসন-পদ্ধতির নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হ্রাস হইয়া যায়; কিন্তু জমির অধিকার অটুট

থাকিয়া যায়। রাজসরকার ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার এইরূপ নিয়ম মানিয়া লয়েন যে ভূম্যধিকারীর জমির উপরে যে স্বত্ব আছে, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না এবং তাহার আপন স্বত্ব সে অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। তবে রাজসরকারের জমির সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে তজ্জন্য ভূম্যধিকারীকে রাজসরকারে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজস্ব বা খাজনা জমা দিতে হইবে। ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্ব ক্রমিক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে; এবং প্রত্যেক জাতির রাজত্বকালেই ভূমির বন্দোবস্তের ব্যবস্থার বিশেষত্ব বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজগণ, হিন্দু ও মুসলমান আমলের ব্যবস্থার অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিলেও, মূল ব্যবস্থা ঠিক রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভূমির স্বত্বাধিকারের নিয়ম বিভিন্ন প্রকার। ইংরেজগণের আমলে তাঁহারাও তাঁহাদের দেশের আইন এ দেশে প্রচলন করিয়াছেন। এই সকল কারণেই আইনের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

আইনের ঈদৃশ বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটী বিষয়ের সত্তা সকল প্রকার স্বত্বেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা রাজসরকারকে সমগ্র ভূমির আংশিক স্বত্বাধিকারী বলিয়া মান্য করা এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ রাজসরকারে রাজস্ব প্রদান করা।

মোগল শাসন-কালে ভূমির রাজস্ব-নির্দ্দেশ ও রাজস্ব-সংগ্রহের ভার কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের উপর ন্যস্ত ছিল। তাহারা আপন আপন পারিশ্রমিক বাবদে সংগৃহীত রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত এবং এই সকল রাজস্ব-ঘটিত কার্য্যের ভার বংশানুক্রমে তাহাদিগকে প্রদান করা হইত। এই সকল করসংগ্রাহক বা তহশীলদার-গণ মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে প্রত্যেকেই আপনাদিগকে স্বাধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। ঐ সময়ের গোলযোগ ও রাজস্ব স্থাপিত হওয়ায় পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অনেক দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর ঐ সকল দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় ইংরাজগণ, মোগল আমলের

প্রকৃত করদাতা ভূম্যধিকারী, এবং করসংগ্রাহক বা তহশীলদার শ্রেণী এতদুভয়ের পার্থক্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই ইংরাজ-শাসনের প্রাক্কালে ভূম্যধিকারী বিষয়ে দুই প্রকার ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় শ্রেণীই জমিতে আপন আপন স্বত্ব স্বীকার করে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী রাজ-সরকারকে আপনাদের অংশীদার বিবেচনায় লাভের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজসরকারে জমা দেয়, এবং অপর শ্রেণী রাজসরকারের প্রতিনিধি-রূপে করসংগ্রহের নিমিত্ত বেতন-স্বরূপ ন্যায্য প্রাপ্য গ্রহণ করে। ভূমির উন্নতি-জনিত রাজস্ব বৃদ্ধি হইলে লাভের অংশ তাহাদের প্রাপ্য নহে।

শাসন-পদ্ধতি-পরিচালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত ছিল, তাহারা ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণের স্বত্বের মর্ম্ম অবগত ছিল। সেই জন্য তাহারা বলিত রাজসরকার জমির উপস্বত্বের কোন অংশ দাবী করিতে পারে না। তথাপি তাহারা দেশীয় পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়া বিবেচনা করিয়াছিল—রাজসরকারের দাবী টাকার অঙ্ক স্থায়িভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, ভূমির উন্নতিজনিত লাভ রাজ-সরকারে না বর্ত্তিয়া, ভূমির মালিকেই পর্য্যবসিত হইবে, এবং ইহার ফলে ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী প্রজাগণের ন্যায় এক শ্রেণীর লোকের স্বত্ব গণ্য করা হইবে।

জমির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ঈদৃশ বিবিধ ধারণা পোষণ করাতে এবং দাবী বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত না হওয়ার ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে জমির বন্দোবস্ত-কার্য্য সংসাধিত হইত। অদ্যাপি ঐরূপ ধারণা-সম্ভূত বন্দোবস্তের আভাস পাওয়া যায়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে রাজকর্ম্মচারি-বর্গের মনে ইংলণ্ডের জমি সংক্রান্ত স্বত্ব ধারণা বলবৎ ছিল। রাজসরকারের পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে আর কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা হয় না।

ভূমির উপরে তিন প্রকারের স্বত্ব বর্ত্তমান আছে, যথা—রাজসরকার সংক্রান্ত, ভূম্যধিকারী সংক্রান্ত ও প্রজা সংক্রান্ত। ব্যবসায় মাত্রেই

অংশীদারগণের স্বার্থ পরস্পর জড়িত থাকে। ব্যবসায়ের লাভের অংশ অংশীদারগণের মধ্যে তুল্য অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া প্রত্যেক অংশীদারই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। এই প্রথার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ সকল অংশীদার লাভের অঙ্ক তুল্যানুপাতে না পাইলে, যে অংশীদার কম লভ্যাংশ পাইবে, সে তাহার পরিশ্রমের ভাগ হ্রাস করিয়া দিবে, ফলে লাভের মাত্রা কমিয়া যাইবে। ইহাই মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ভূমির স্বত্বাধিকার বিষয়ে যদি ব্যবসায়ের অংশীদারগণের নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে রাজসরকার, জমিদার ও প্রজা—ইহারা প্রত্যেকে জমির উন্নতির জন্য যে কার্য্য করে, তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্তরূপ পুরস্কার পাইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজসরকার, ভূম্যধিকারী ও প্রজা

ভূমিতে উৎপন্ন সম্পদের কতকাংশ যে রাজসরকারের প্রাপ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজসরকার ভূমির বাবদ যে রাজস্ব গ্রহণ করেন, তাহার পরিবর্ত্তে বহিঃশত্রু-দমন এবং দেশের শান্তিরক্ষা করেন। এই আশ্বাস থাকায় ভূম্যধিকারী ভূমির উন্নতি এবং কৃষক চাষ-আবাদ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রাজসরকার জমিজমা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি প্রস্তুত এবং রক্ষা করিয়া থাকেন। জমিজমা সংক্রান্ত বাদবিসংবাদের মীমাংসা করিবার জন্য রাজসরকার কর্ত্তৃক আদালতও স্থাপিত হইয়াছে। এইভাবে রাজসরকার হইতে যে সকল সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, ভূম্যধিকারী এবং প্রজা উভয়ই তাহার ফলভোগী, সুতরাং অংশীদার। এ ক্ষেত্রে রাজসরকারের কর্ত্তব্য-কার্য্য বিষয়ে আলোচনা করা হইল; এখন অন্যান্য অংশীদারগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রজার কর্ত্তব্য বিষয়েই আলোচনা করা যাক। কৃষকের শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলেই ভূমিতে শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে; ইহা ছাড়া শস্যোৎপাদনের

অন্য কোন প্রকার পন্থা উন্মুক্ত নাই। কিন্তু ভূম্যধিকারী ভূমির অংশীদাররূপে উৎপাদনের জন্য কি সুবিধা প্রদান করে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উৎপাদন সম্বন্ধে কোন প্রকার আনুকূল্যই যদি ভূম্যধিকারী না করে, তাহা হইলে উৎপাদনের অংশ সে কেমন করিয়া দাবী করিতে পারে? সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীকে যে অবস্থায় ভূমির স্বত্বাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অপলাপ হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীর ভূমির জন্য যে দায়িত্ব ছিল, এখন তাহা রাজসরকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব বিষয়ে কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। উৎপাদন কার্য্যে ভূম্যধিকারী কোন প্রকার সহায়তা করে না বলিয়া যদিও ন্যায়তঃ আপন অংশের দাবী করিতে পারে না, তথাপি আইনতঃ তাহার দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না; কারণ রাজসরকার পূর্ব্ব হইতেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার মানিয়া লইয়াছে। উন্নতিকামী ভূম্যধিকারিগণ কূপ, পুষ্করিণী, এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি খনন দ্বারা কৃষিকার্য্যের উৎপাদন বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। পূর্ব্বে রাজসরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে কৃষক কৃষিকার্য্যে বিরত থাকিবে; কারণ, রাজসরকার প্রজার স্বত্ব-রক্ষণ ও শান্তি-রক্ষার কার্য্যে অবহেলা করিলে তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া ফসল উৎপাদন করার আশা করিতে পারে না। কাজেই দেশের সমগ্র ভূমি পতিত থাকিয়া যায়। এইরূপে অংশীদারগণের কর্ত্তব্যপালনের অবহেলায় উৎপাদন বিষয়ে সবিশেষ ক্ষতির কারণ হয়।

কৃষি-কার্য্যোপযোগী ভূমি হইতে যৌথভাবে যে শস্য উৎপাদিত হয়, তাহাতে তিন প্রকার স্বার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তিন প্রকার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই উৎপাদনের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই উৎপাদনের অংশ অংশীদারগণের কর্ত্তব্য-কার্য্যের গুরুত্বের অনুপাতে বিভক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কার্য্যতঃ ঐরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না; কারণ, অবস্থার পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যকার্য্য-সমূহের পারস্পরিক সার্থকতা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যদিও কতকগুলি কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিবার পরিবর্ত্তেই সর্ব্ব প্রথম ভূমির স্বত্বাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে এ সকল কর্ত্তব্য যথারীতি প্রতিপালিত না হওয়া স্বত্বেও, আইনতঃ ঐ কর্ত্তব্যবিমুখ স্বত্বাধিকারিগণকে স্বত্বচ্যুত করা যায় না; কারণ, উহা প্রতিষ্ঠিত স্বত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজশক্তি রাজপ্রতিনিধিবর্গের করতলগত হইয়াছিল; শাসন-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে স্বভাবতঃই দেশে দারিদ্র্য ও লোকক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই সময়েও দেশের অবস্থা ঐরূপই হইয়াছিল। অরাজকতার ভয়ে কৃষকগণ কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করিত। ভূমিতে শস্যোৎপাদন করিয়া তাহার ফলভোগী হইতে পারিবে না, এই ভয়েও অনেক কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইহার উপরে বর্গীদের অত্যাচারে দেশবাসী নিতান্তই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ বিবিধ অশান্তি দ্বারা তদানিন্তন দেশবাসীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পর সুশৃঙ্খলশাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কৃষিকার্য্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। ভূম্যধিকারিবর্গের মধ্যে প্রত্যেকেই তখন বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্বত্বাধিকার পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা রাজসরকারে যে রাজস্ব প্রদান করিতেন, তাহা আপন আপন অধিকারের সমগ্র ভূমির উপর ধার্য্য ছিল। ভূমিতে চাষ-আবাদ দ্বারা শস্যোৎপাদন ভিন্ন রাজস্ব-প্রদানের অন্য কোন উপায় বর্ত্তমান ছিল না। তখন কৃষিকার্য্য-সম্পাদনোপযোগী শ্রমজীবীর সংখ্যাও অতি সামান্য ছিল। অর্থনীতির দিক্ দিয়া বলিতে গেলে ঐ সময়ে ভূম্যধিকারিবর্গের সহিত প্রতিযোগিতায় ঐ শ্রমজীবিগণই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ তাহাদের মনোনীত না হইলে তাহারা তখনই কার্য্য পরিত্যাগ করিত; কারণ, তখন অন্যত্র কার্য্যের যোগাড় করা সহজসাধ্য ছিল। কাজেই ভূম্যধিকারিগণ সর্ব্বদাই

উহাদের মনস্তুষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকিত। আবার শ্রমিক যাহাতে অন্যায়রূপে লাভবান্ না হইতে পারে, তৎপ্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল; নতুবা ভূম্যধিকারিবর্গের ক্ষমতার হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা ছিল। পক্ষান্তরে শ্রমিকগণও বিপদে-আপদে রক্ষা পাইবার আশায় ভূম্যধিকারিবর্গের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইত। এইরূপে বিবিধ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ার দরুন কালক্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের বিভাগ যথোপযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়।

ভূম্যধিকারী উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ গ্রহণ করিত, তাহাকে খাজনা বলা যাইতে পারে, এবং এই খাজনাকে ভূম্যধিকারীর পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযোগ্য বিভাগ বলা যায়। পূর্ব্বে এই প্রকার পাওনা সাধারণতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারাই দেওয়া হইত। এই প্রথা-অবলম্বনে খাজনা পরিশোধ করা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহাতে উৎপাদনের লাভ ও ক্ষতি ভূম্যধিকারী ও কৃষক তুল্যাংশে ভোগ করিয়া থাকে। এই নিয়মে খাজনা আদান-প্রদানের সময় শস্য মাড়াই করিবার স্থানে ভূম্যধিকারীর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া তাহার অংশ বিভাগ করিয়া লইত; কিন্তু নানা কারণে এই প্রণালী বিরক্তিকর এবং অসুবিধা-জনক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্যই ইহার পরবর্ত্তী সময়ে এই নিয়ম যথাযথ-ভাবে প্রতিপালিত হইত না।

তূলা চাষের বিষয় আলোচনা করিলে, এই প্রথার অসুবিধার বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। গাছের সম্পূর্ণ তূলা একেবারে চয়নোপযোগী হয় না, কয়েকমাস ব্যাপিয়া তূলার চয়নকার্য্য চলিতে থাকে। পূর্ব্ব নিয়মে প্রতি বার চয়নের পরেই ভূম্যধিকারী তাহার অংশ বিভাগ করিয়া লইত। কিন্তু একটী কালের জন্য পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাগ-বণ্টন নিতান্ত অসুবিধা ও বিরক্তিজনক মনে করিয়া ভূম্যধিকারী ফসলের অবস্থানুসারে অনুমানে মোটের উপর তাহার অংশ সাব্যস্ত করিয়া লইত। কিন্তু এই প্রকার বণ্টন স্পষ্টতঃ যথাযথরূপে হইতে পারে না। ইহার কিছুকাল পরে এইভাবে খাজনার আদান-প্রদান উঠিয়া গিয়া, ফসলের মূল্য-নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক উহার অংশ ভূম্যধিকারিবর্গ লইতে

আরম্ভ করে। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান প্রথা-অনুযায়ী খাজনা আদান-প্রদানের প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে।

ইংরাজ আমলে শাসনপ্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল প্রকার অবস্থাই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। ভূম্যধিকারীকে এখন প্রজা-রক্ষার ভার লইতে হয় না; ইহা রাজসরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আর ভূম্যধিকারিগণকে প্রজার মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে হয় না; কারণ, তাহাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর প্রজার সহায়তা-গ্রহণের প্রয়োজন নাই। বিবাদ-বিসংবাদের শান্তি হওয়াতে দেশের অধিবাসিবর্গ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে এবং লোকসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জমিতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়াতে, ভূম্যধিকারীর পক্ষে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের সুবিধা হইয়াছে। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু জমির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার ফলে কোন প্রজা খাজনা-প্রদানে অস্বীকৃত হইলে, তাহাকে উৎখাত করিয়া তৎস্থলে অন্য প্রজা পত্তন করা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। প্রজার স্বত্ব-রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ভূম্যধিকারীর কোন প্রকার ক্ষতি বা ক্ষমতার হ্রাস হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে প্রজার স্বত্ব-রক্ষার জন্য নূতন আইনের প্রচলন হওয়া আবশ্যক। কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ ভোগ করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে কৃষকগণের কার্য্য করিবার উৎসাহের সহিত কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা অপ্রতিহত-ভাবে চলিতে থাকিবে। অন্যথা, উন্নতি দূরে থাকুক, কৃষিকার্য্য ক্রমেই অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে। কার্য্য করিয়া যদি আশানুরূপ ফলভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কদাচ সে কার্য্যে উৎসাহ থাকিতে পারে না।

উৎপাদনের দ্বিতীয় উপায় পরিশ্রম। এ দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য শারীরিক পরিশ্রম প্রচলিত আছে। শারীরিক পরিশ্রম দুই প্রকার:

এক প্রকার, পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রমলব্ধ ফল নিজে ভোগ করা, এবং অন্য প্রকার, পরিশ্রমলব্ধ ফলাফলের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়া পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট মজুরী গ্রহণ করা। কৃষিজীবী শ্রমিকগণ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিক ফসল লাভ করা যায় এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং সেই জন্যই তাহারা পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যে সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত।

ভূমি একপ্রকার বস্তু। ইহার মূল্যও "আমদানী এবং চাহিদা" নিয়মের বিষয়ীভূত; অর্থাৎ চাহিদার বৃদ্ধির সহিত ইহার মূল্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য পণ্যের সহিত ভূমির পার্থক্য এই যে, ইহার আমদানী নির্দ্দিষ্ট সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না; অর্থাৎ ইহা স্থানান্তর হইতে সরবরাহ করিবার উপায় নাই। এ দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমির আমদানী চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। কাজেই প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গ সঙ্গে চাহিদার প্রতিযোগিতা কঠোরতর হওয়াতে ভূমির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভূমির উৎপন্ন সম্পূর্ণ ফসল বিক্রয় দ্বারাও উহার মূল্যের সংকুলান হয় না। কৃষক অধিক পরিশ্রম দ্বারা ভূমিতে অধিক শস্য উৎপাদন করিতে পারে সত্য কিন্তু শস্যের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। প্রজা ঐ বর্দ্ধিত খাজনা-প্রদানে অস্বীকৃত হইলে তাহার উৎখাতের সম্ভাবনা আছে। এই উৎখাতের ব্যবস্থা থাকাতে প্রজা-সাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রম-হিসাবে যদিও সে নিজে লাভের জন্য কার্য্য করিতেছে, তথাপি তাহার অবস্থা দৈনিক মজুরের অনুরূপ; কারণ, অধিক পরিশ্রম ও যত্নলব্ধ ফল সে স্বয়ং ভোগ করিতে পারে না। এ জন্য সে পরিশ্রম-বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য শ্রেণীর শ্রমিক অর্থাৎ দৈনিক মজুরগণের পক্ষে, আপন পরিশ্রমের জন্য একমাত্র মজুরী ভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্বার্থের আশা নাই বলিয়া, তাহাদের অধিক পরিশ্রম করিবার জন্য প্রলোভন জন্মে না। স্থলবিশেষে, প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই হউক, কিংবা অন্য কোন

কারণেই হোক, কোন কোন মজুর আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু ঐরূপ দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকগণ পরিশ্রম করা সত্ত্বেও যখন তাহাদের কোন প্রকারে কেবল "পেটে-ভাতে" থাকিবার মত অবস্থা হয়, তখন তাহারা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় আরম্ভ করে না কেন, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উপস্থিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, কৃষকেরা অন্যান্য ব্যবসায় করিতে অসমর্থ। এই অক্ষমতার কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে। তন্মধ্যে আপন গৃহ ছাড়িয়া বিদেশে বিঘোরে চলিয়া যাওয়াব অনিচ্ছা—এবং তথায় নানাপ্রকার বিপদ্-আপদের আশঙ্কা অন্যতম। এই কারণেই কৃষিকার্য্যের মজুরী অন্যান্য কার্য্যের মজুরী অপেক্ষা কম এবং কৃষি-শ্রমিকের বাজার কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হয় না।

উৎপাদনের তৃতীয় উপায় মূলধন। এখন মূলধনের সহিত কৃষি-কার্য্যের সম্বন্ধ-বিষয়ে আলোচনা করা যাক। যে কোন প্রকার উৎপাদনের জন্যই অল্প-বিস্তর মূলধনের প্রয়োজন। কাষ্ঠ-বিক্রেতার কুঠার, করাত ও দাঁড়িপাল্লা ভিন্ন ব্যবসায় চলে না। সামান্য ঘাস-বিক্রেতারও একখানা খুরপীর প্রয়োজন। এখানে কাষ্ঠ-বিক্রেতার মূলধনের পরিমাণ কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে—এই কুঠার, করাত, দাঁড়িপাল্লা, খুরপী, এইগুলি মূলধনের মধ্যে গণ্য। এই সকল মূলধন ক্রয় করিবার নিমিত্ত কিছু সম্পদ্ ব্যয় করা আবশ্যক হয়। এই সকল মূলধন কাষ্ঠ-বিক্রেতার পক্ষে অরণ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌কে বাস্তব সম্পদে এবং ঘাস-বিক্রেতার পক্ষে পতিত ভূমিস্থ প্রচ্ছন্ন সম্পদ্‌কে বাস্তব সম্পদে পরিণত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। পক্ষান্তরে, বৃহৎ বৃহৎ কারখানার উৎপাদন-ব্যাপারে নানা প্রকার কলকব্জা এবং দালান-কোঠার প্রয়োজন হয়। সকল কল-কারখানার কার্য্য অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের জন্য অল্প মূলধনের প্রয়োজন হইলেও, উহা অতি প্রয়োজনীয়। কৃষি-কার্য্য-সম্বন্ধীয় মূলধন তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। চাষের জন্য কোদাল, খুরপী এবং কাস্তের প্রয়োজন। জমির পরিমাণ অল্প হইলে এই কয়টীর সাহায্যেই কায়িক পরিশ্রম-দ্বারা চাষের কার্য্য চলিতে

পারে। প্রকৃতপক্ষে জমির পরিমাণ এত অল্প নহে বলিয়া কেবল কায়িক পরিশ্রমে চাষের কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং কৃষিকার্য্যের জন্য লাঙ্গল, মই ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়। ঐ সকল যন্ত্র-পরিচালনের জন্য বলদের প্রয়োজন হয়। এই সকল দ্রব্যও একশ্রেণীর মূলধন; কারণ, এইগুলি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই বাঞ্ছনীয়। কৃষকের এই সকল সম্পত্তি অস্থাবর এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত মূলধন-মধ্যে গণ্য। এইগুলি হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা কৃষকের আপন বিবেচনা এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আর এক প্রকার সম্পত্তি আছে তাহাও মূলধন, কিন্তু তাহা হস্তান্তরের অযোগ্য। কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে স্থানীয় আবহাওয়ার আনুকূল্য ও প্রতিকূলতায় শস্যের পরিমাণ ও গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। শস্যোৎপাদন জমির স্বাভাবিক সরসতা ও আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে বলিয়া, যে বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়, সে বৎসর ভাল ফসল পাওয়া যায় না; কিন্তু কিছু অর্থব্যয়ে কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিয়া জল-সেচনের ব্যবস্থা করিলে, অল্প বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির বৎসরেও ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পুষ্করিণী-খননের জন্য যে সম্পদ্ ব্যয়িত হয়, তাহাও মূলধন; কারণ, এই সম্পদ্ অধিকতর সম্পদ্-উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য বা এই ব্যয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে যে সম্পদ্ হস্তান্তরিত হয়, তাহা জমিতে জলসেচন করিয়া এবং জলসেচন না করিয়া যে অধিক ও অল্প ফসল পাওয়া যায়, তাহাব অন্তর (difference) ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভূমির সহিত অন্যান্য সম্পদের পার্থক্যের ন্যায় এই শ্রেণীর মূলধন পূর্ব্বোক্ত মূলধন হইতে স্বতন্ত্র। পুষ্করিণী বা কূপ স্থাবর সম্পত্তি। পুষ্করিণী ভূমিতে খাত হয় বলিয়া ভূমির কার্য্যকারিতার ন্যায় পুষ্করিণীর কার্য্যকারিতাও উহার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তির ভোগস্বত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া বর্ত্তমান থাকে, সে এই শ্রেণীর মূলধন আবশ্যক-অনুসারে ব্যয় করিতে পারে। এই প্রকার ব্যয় সাধারণ প্রজার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, যে কোন সময়ে ভূমি হইতে উৎখাত হইলে কূপ অথবা পুষ্করিণী সে লইয়া যাইতে পারে না। অথব

এই ব্যয়ের দরুন ক্ষতি-পূরণও সে দাবী করিতে পারে না। উচ্চনীচ ভূমি কাটিয়া, ভরিয়া সমতল করা এবং ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করাও ঐ শ্রেণীর ব্যয়েরই অনুরূপ। এই সকল কার্য্য ভূম্যধিকারীই করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী। সুতরাং এই সকল কার্য্যে ব্যয়ের দরুন ভবিষ্যতে যে লাভ হইবে, তাহার একজন প্রজা উৎখাত হইলে অন্য কোন প্রজা তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

কৃষিজাত দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার সুবিধার জন্য খাল খনন কি রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয়, উহাও পূর্ব্ব শ্রেণীর ব্যয়ের অনুরূপ। এইভাবে জলপথে এবং স্থলপথে কৃষি-জাত দ্রব্য চালান দেওয়ার সুবিধা হইলে, যে স্থানে ঐ সকল কৃষিজাত দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে, তথায় চালান দিয়া লাভবান্ হওয়া যায়। ভূম্যধিকারীর ভূমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকিলেও, এই সকল কার্য্যের জন্য যে মূলধন-ব্যয়ের আবশ্যক হয়, তাহা ব্যয় করা কৃষকগণের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এই সকল উন্নতির জন্য রাজসরকারের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

এখন তৃতীয় শ্রেণীর মূলধনের বিষয় আলোচনা করা যাক। ইহার সহিত কৃষকগণের সুখ-সমৃদ্ধি বিশেষভাবে জড়িত; ব্যাধি, অজন্মা, অথবা বিবাহ ইত্যাদির দরুন অযথা ব্যয়ের মধ্যে ভূমির খাজনা পরিশোধ করিবার পর যদি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ এইরূপ হ্রাস হইয়া যায় যে, উহাতে কৃষক ও তাহার পরিবারবর্গের পরবর্ত্তী ফসল কাটিবার কাল পর্য্যন্ত খোরাকীর অকুলান হয়, তাহা হইলে তাহাকে খাদ্যদ্রব্য কর্জ্জ করিতে হইবে; কারণ, তাহা হইলে অনাহারে বা অল্পাহারে উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহা সে করিতে সমর্থ হইবে না। এতদ্ভিন্ন অনাহারে জীবন ধারণ করাও অসম্ভব। এই প্রকারে কৃষকের যে মূলধন ধার করিতে হয়, তাহা অন্য প্রকার মূলধন হইতে স্বতন্ত্র; কারণ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এ অবস্থায় প্রয়োজন হইলে সে তাহার হালের বলদ ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি বিক্রয় করিতে পারে। এই সকল জিনিস কৃষিকার্য্যের পক্ষে

অতি প্রয়োজনীয়; তথাপি পেটের দায়ে সে ঐগুলি বিক্রয় করিয়া শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দিন-মজুরের ন্যায় শস্যোৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। এই সকল কারণে কৃষকের কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকে না; কারণ, যে ব্যক্তির খাদ্যদ্রব্যের উপর অধিকার বা প্রভাব আছে, তাহার সহিত কৃষক লাভে ব্যবসায় করিতে পারে না। খাদ্য সরবরাহের জন্য কৃষককে তাহার চুক্তি বা সর্ত্ত মানিয়া লইতে হয়; নতুবা, তাহাকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। এই সকল অবস্থাতে বাজারের আমদানী ও চাহিদার ন্যায় একের অন্যের উপর ক্রিয়া সহজ-ভাবে হইতে পারে না। আমদানী ও চাহিদার একের অন্যের উপর ক্রিয়া সহজ ভাবে থাকিলে মূল্য একটা গণ্ডীর বাহির হইলেই চাহিদা একেবারে কমিয়া যায়। যেখানে প্রাণ রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, সেখানে খাদ্য পাইবার ইচ্ছা অসীম। এই স্থলে ক্রেতার মূল্য-নিরূপণ করিবার কোন শক্তিই থাকে না, মহাজন আপন ইচ্ছানুসারে উহা ধার্য্য করিতে পারে ও করে। তখন ঋণের বা ধারের মূল্যও অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সকল প্রকার সুযোগই মহাজন পায়; এবং সর্ব্বদাই অতিরিক্ত সুদের হার সে দাবী করে। প্রতিবেশীর দুরবস্থার সুযোগ পাইয়া তাহার নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জনের লালসা নিতান্ত অন্যায়। এইরূপ নীচ প্রবৃত্তি দমন করা নৈতিক বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এই নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানব, এমন কি আদালত পর্য্যন্ত, অনুমোদন করে না।

কৃষিকার্য্য এবং কৃষিকার্য্যের সহিত যাহাদের স্বার্থ জড়িত—এতদুভয়েরই যে মূলধনের প্রয়োজন, ইহা এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। রাজসরকারের বড় কার্য্যের জন্য, ভূম্যধিকারীর তদপেক্ষা ছোট কার্য্যের জন্য এবং কৃষকগণের চাষের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। রাজসরকারের ও ভূম্যধিকারীর ঋণ-গ্রহণ-বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। সুদের হার অধিক হইলে তাহারা ঋণ-গ্রহণে বিরত থাকিবে। এখানে মূলধন সম্বন্ধে বাজারের আমদানী ও চাহিদার অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে; অর্থাৎ আমদানী ও চাহিদা পরস্পর পরস্পরের উপর সহজ-

ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু কৃষকগণের পক্ষে সেই সুবিধা নাই। পূর্ব্বলিখিত আলোচনা দ্বারা চাহিদার কারণ ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু আমদানী-সম্পর্কেও কিছু অবগত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সহরে মূলধনের বাজার আছে; কিন্তু গ্রামবাসী কৃষকের পক্ষে সহরে যাইয়া মূলধন ধার করিয়া আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার: তাহাদের যে সামান্য ঋণ দরকার হয়, তাহা তাহারা সত্বর ও সহজে পাইতে চেষ্টা করে। গ্রামের মহাজনই গ্রামে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা সরবরাহ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে গ্রামের মহাজনগণ গ্রামের জন্য একটী বিশেষ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কৃষকগণের বলদ মরিয়া গেলে কি অন্যান্য বিপদ্-আপদে টাকার প্রয়োজন হইলে এই মহাজনই উহা ধার দেয়; এবং ধার-পরিশোধ-বিষয়ে কৃষকের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে। অবশ্য সকল সময়ে এবং সকল ক্ষেত্রে মহাজনগণের এরূপ সহৃদয়তা দৃষ্ট হয় না,—কোন কোন নীচ প্রবৃত্তির মহাজন খাতকের রক্ত শোষণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে ত্রুটি করে না। এখানে কৃষিকার্য্যের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট চতুর্থ এক ব্যক্তির অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি-সম্বন্ধীয় অর্থনীতি-বিষয়ে গ্রাম্য মহাজনও একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সে ইচ্ছা করিলে তাহার ক্ষমতার অপলাপ করিতে পারে এবং বর্ত্তমান সময়ে বহু স্থানে মহাজনগণের এইরূপ ক্ষমতার অপব্যবহারে কৃষকগণ হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। কুশীদ-গ্রহণ-প্রথা বহুকাল যাবৎ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জমির মূল্য ও জমির খাজনার বৃদ্ধি-বিষয়ের প্রতিযোগিতাতে পার্থিব অবস্থার উন্নতির সঙ্গে কুশীদ-গ্রহণ-প্রথা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বর্ত্তমান কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধীয় ব্যপারে চারি প্রকার স্বার্থ-বিশিষ্ট লোক (রাজসরকার, ভূম্যধিকারী, কৃষক ও মহাজন) জড়িত রহিয়াছে এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি দ্বারা প্রত্যেক স্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লাভবান্ হইবে। কৃষিক্ষেত্র হইতে অধিক-পরিমাণ শস্যোৎপাদন করা এই উন্নতির মূল ভিত্তি। ভূমি-কর্ষণকারী কৃষকের উপরেই

এই উন্নতি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে কৃষক তাহার কার্য্যলব্ধ ফলের লভ্যাংশ এত অল্প পায় যে, তদ্দ্বারা তাহার কার্য্য করিবার আগ্রহ এবং আসক্তি হ্রাস হইয়া যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে কৃষিকার্য্য-সম্পাদন-বিষয়ে-কৃষকগণের আগ্রহ ও আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ দেশে প্রায় শতকরা ৮০জন ব্যক্তি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি কোন কালেই সম্ভব হইবে না। অন্ন-সমস্যা প্রতিদিন যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কৃষির উন্নতিকল্পে দেশবাসী সকলেরই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, নতুবা দেশের দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

শব্দসূচী

অ

আ

ই

উ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ড

ফ

ব

ভ

ম